(ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের জন্য একুশ দিনের একটি বিশেষ কোর্স)

মুক্তির ২১ সবক

কোর্সের বৈশিষ্ট সমূহ

১- কোর্সটিকে মোট ৭টি সেমিষ্টারে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি ৩দিনে ১টি সেমিষ্টার হবে এবং প্রতি ৩দিন পরপর এ সেমিষ্টারের রিভিশন ও পরীক্ষা নেওয়া হবে। যাতে করে শিক্ষার্থীরা বিষয়গুলো মনে রাখতে পারে এবং ভুলে না যায়।

২- ইসলামের যেহেতু দুটি দিক রয়েছেঃ

- নৈতিক ও আদর্শিক দিক তথা ঈমান
- বাস্তব জীবনে মেনে চলার দিক তথা আ'মাল

ঈমানে সমস্যা হলে মানুষ মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায় আর আ'মালে সমস্যা হলে মানুষ ফাসিক হয়ে যায় এবং তখন তার আখিরাত অনিশ্চিত হয়ে যায়। সুতরাং আশা করি বুঝতেই পারছেন যে ইসলামে নৈতিক ও আদর্শিক বিষয় তথা ঈমানের গুরুত্ব অপরিসীম। আর এজন্যই আমাদের এ কোর্সের প্রতিটি সেমিষ্টারে ২দিন ইসলামের নৈতিক ও আদর্শিক বিষয় তথা ঈমান ও আক্বিদাহ আর ১দিন ইসলামী বিধিবিধান তথা ফিক্বহ বিষয়ে পাঠদান করা হবে। তবে বিশেষ বিবেচনায় শেষ সেমিষ্টারে ফিতরাহ সম্পর্কিত বিধিবিধান যুক্ত করার কারনে তাতে নৈতিক বিষয় রয়েছে ১টি আর বিধানগত বিষয় হয়েছে ২টি।

৩- প্রতিদিন ৪ ঘন্টা করে ক্লাস হবে। এরমাঝে ১ম আড়াই ঘন্টা এ কোর্সের ক্লাস, পরে আধা ঘন্টা বিরতি আর তারপর ১ ঘন্টা নামায শিক্ষা ও কুরআন শিক্ষা। তবে সেমিষ্টারের দিন নামায শিক্ষা ও কুরআন শিক্ষা হবে না বরং ওই দেড় ঘন্টা রিভিশন ও পরীক্ষা হবে।

৪- কোর্স শেষে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে এবং পরীক্ষায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীকে যথাক্রমে ১৫০০, ১২০০ ও ৮০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

কোর্সটি যাদের জন্যঃ যেসব ছাত্র/ছাত্রী, যুবক/যুবতী এবং মুসলিম পুরুষ ও নারী আখেরাতের মুক্তির জন্য সঠিক পথে চলতে চায় এ কোর্সটি তাদের জন্য

এ কোর্সে কারা ভর্তি হতে পারবে

- যেসব ছাত্র/ছাত্রী কওমী মাদরাসায় জালালাইন, মিশকাত বা দাওরা ক্লাসে অধ্যয়নরত
- যেসব ছাত্র/ছাত্রী আলিয়া মাদরাসায় আলিম, ফাজিল বা কামিল ক্লাসে অধ্যয়নরত আছে
- যেসব ছাত্র/ছাত্রী কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত আছে
- যেসব পুরুষ বা নারী কওমী বা আলিয়া মাদরাসাহ অথবা স্কুল থেকে এস এস সি সমমানের পড়ালেখা সমাপ্ত করেছেন কেবল তারাই এ কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন।

কোর্সটির ডিজাইন ও পরিচালনায়
মুফতী শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ
মুফতী, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, লেখক, গবেষক

কোর্সটি অধ্যয়ন করে যেসব বিষয় শিখা যাবে

সেমিষ্টার	দিন	মূল বিষয়	পাঠের বিষয়	মন্তব্য
১ম	১ম	নৈতিক ও আদর্শিক	জীবন ও জীবনের লক্ষ্য	
	২য়	নৈতিক ও আদর্শিক	ইসলাম ও মুসলিম	
	৩য়	আইন ও বিধান	সাওম ও সিয়াম	রিভিশন ও সেমিষ্টার
২য়	৪র্থ	নৈতিক ও আদর্শিক	ঈমান ও আমল	
	৫ম	নৈতিক ও আদর্শিক	পাপ ও পাপের পরিনতি	
	৬ষ্ঠ	আইন ও বিধান	তাহারাত বা পবিত্রতা	রিভিশন ও সেমিষ্টার
৩য়	৭ম	নৈতিক ও আদর্শিক	কুফর ও কুফরের পরিনতি	
	৮ম	নৈতিক ও আদর্শিক	শিরক ও শিরকের পরিনতি	
	৯ম	আইন ও বিধান	হিজাব	রিভিশন ও সেমিষ্টার
৪র্থ	১০ম	নৈতিক ও আদর্শিক	মুনাফিক ও মুনাফিকী	
	১১শ	নৈতিক ও আদর্শিক	আত্মীয়তা ও আম্বাবিয়্যাহ	
	১২শ	আইন ও বিধান	ওয়াদা, কসম ও কাফফারাহ	রিভিশন ও সেমিষ্টার
৫ম	১৩শ	নৈতিক ও আদর্শিক	সকালে মুঅমিন, বিকালে কাফির	
	১৪শ	নৈতিক ও আদর্শিক	ন্যায়, সাম্য, অধিকার ও ইনসাফ	
	১৫শ	আইন ও বিধান	বিবাহ ও তালাক	রিভিশন ও সেমিষ্টার
৬ষ্ঠ	১৬শ	নৈতিক ও আদর্শিক	তাক্বওয়া ও মুত্তাক্বী	
	১৭শ	নৈতিক ও আদর্শিক	তাওবাহ, ইস্তিগফার ও তাযকিয়্যাহ	
	১৮শ	আইন ও বিধান	যাকাত ও সূদ	রিভিশন ও সেমিষ্টার
৭ম	১৯তম	নৈতিক ও আদর্শিক	আনুগত্য ও অনুকরন	
	২০তম	আইন ও বিধান	ইদ্দত	
	২১তম	আইন ও বিধান	ফিতরাহ	পরীক্ষা

১ম সেমিষ্টার **১ম দিন**

জীবন ও জীবনের লক্ষ্য

আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়টাকে আমরা জীবন বলে থাকি। জন্মের মাধ্যমে আমাদের জীবন শুরু হয় আর মৃত্যুর মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটে। আমাদের জীবন ও মৃত্যু নির্ধারিত এবং সীমিত সময়ের জন্য। আমাদের এ জীবনের একটি নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। মহান আল্লাহ তায়া'লা এক বিশেষ উদ্দেশ্যে আমাদেরকে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন এবং আমাদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারন করে দিয়েছেন। তাই জীবন ও জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে জানা নিতান্তই আবশ্যক বিষয়। আর এর গুরুত্ব অনুধাবন করেই আমরা এ বিষয়টিকে ৩টি পাঠে বিন্যস্ত করেছি।

১ম পাঠঃ মানুষের জীবন প্রক্রিয়া

প্রারম্ভিক কথাঃ আমরা মানুষ, আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা এবং আমরা তাঁর সৃষ্টি। মহান আল্লাহ যখন যেদিন আমাদের সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে শুরু হয়েছে আমাদের জীবন, আমাদের পথ চলা। মানব জীবনের এ সফর চারটি ধাপে সমাপ্ত হয়ে চূড়ান্ত গন্তব্যে (জান্নাতে বা জাহান্নামে) গিয়ে সমাপ্ত হবে। জীবনের এ চারটি ধাপের দুইটি অপেক্ষার এবং একটি উপার্জনের। এ চারটি ধাপের মাঝে তিনটি সীমিত সময়ের জন্য আর একটি চিরস্থায়ী। মানব জীবনের চূড়ান্ত ধাপটি চিরস্থায়ী এবং এটা সম্পূর্নরূপে বিলাসিতার জন্য। আমাদের জীবন প্রক্রিয়ার চারটি ধাপ নিম্নরূপ..

১ম ধাপঃ আমাদের জীবন প্রক্রিয়ার চারটি ধাপের ১মটির হল "আ'লম আরওয়াহ" বা রুহ জগত। আল্লাহ আমাদের সকলের রুহ এক সাথে সৃষ্টি করেছেন। যে জগতে এ রুহদের বাস এটাকে বলা হয় রুহ জগত। রুপ জগত একটি অপেক্ষার জগত। সকল রুহ সেখানে অপেক্ষা করছে দুনিয়ায় আসার জন্য। যখন যার পালা আসছে তখনই তাকে দুনিয়ায় পাঠানো হচ্ছে। রুহ জগত শুধুমাত্র রুহদের জন্য। সেখানে দেহ থাকে না।

২য় ধাপঃ আমাদের জীবন প্রক্রিয়ার চারটি ধাপের ২য়টি হচ্ছে "দুনিয়ার জীবন"। এ জীবন রুহ ও দেহের সমন্বয়ে গঠিত এবং পরিচালিত। এ জীবন উপার্জনের জন্য। দুনিয়ার এ জীবনে মানুষ যা উপার্জন করবে তার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা হবে তার চিরস্থায়ী জীবনের, আরামের বা আযাবের, জান্নাতের বা জাহান্নামের।
দুনিয়ার জগতে আসার জন্য মানুষের দেহ গঠন হয় মায়ের জরায়ুতে। দেহের আকৃতি তৈরির পর রুহ জগত থেকে একটি রুহ পাঠানো হয়। ফিরিস্তা এ রুহটি নিয়ে এসে দেহের সাথে যুক্ত করে দেন। মায়ের জরায়ুতেই পথ চলা শুরু হয় রুহ ও দেহের সমন্বিত জীবনের। তারপর ভূমিষ্ঠ হওয়া, আস্তে আস্তে বেড়ে উঠা এবং দুনিয়ার জীবন ও পরিবেশের সাথে পরিচিত হওয়া।
বালিগ হবার পর শুরু হয় জীবনের লক্ষ্য অর্জনের তথা উপার্জনের কাজ। এই উপার্জন পুণ্য বা নেকী তথা সৎকাজ। যে যত সৎকাজ করবে তার চিরস্থায়ী জীবন ততই সুখময় হবে। আর যে যত পাপ করবে তার চিরস্থায়ী জীবন ততই ভয়াবহ হবে।
দুনিয়ার এ জীবন নির্ধারিত সময়ের জন্য। সময় শেষ হয়ে গেলে ফিরিস্তা এসে রুহকে দেহ থেকে বের করে নিয়ে যায়। এভাবেই সমাপ্তি ঘটে রুহ ও দেহের সমন্বিত পথ চলার। আমরা ইহাকে বলি মৃত্যু বা মরে যাওয়া।

৩য় ধাপঃ আমাদের জীবন প্রক্রিয়ার চারটি ধাপের ৩য় টির নাম "আ'লম বারযাখ" বা কবরের জগত। এজগত অপেক্ষার জগত। এজগত সীমিত সময়ের জন্য। এই জগত শুধুই রুহের জগত।
মৃত্যর দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিস্তা আমাদের রুহকে আল্লাহর আদেশ মত অন্য ফিরিস্তাদের হাওয়ালা করে দেন। তাদের নাম "মুনকার নাকীর"। তারা তিনটি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নের উত্তর সঠিক হলে তারা এই রুহকে এক জাগায় নিয়ে গিয়ে সেখানকার দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিস্তাদের হাওয়ালা করে দেন। ওই স্থানের নাম ই'ল্লীন। ই'ল্লীনে ওই রুহকে জান্নাতী সুখ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়। যে ঘুম ভাঙ্গবে ইসরাফীনের ২য় ফুঁৎকারে, পুনরোত্থানের সময়ে।
আর উত্তর সঠিক না হলে ওই রুহকে অন্যত্র রাখা হয়, যার নাম সিজ্জীন। সেখানে তাকে নানা প্রকার আযাব দেয়া হয়। যা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। ইসরাফীনের ১ম ফুঁৎকারের সময়ে তথা মহা প্রলয় কালে এই আযাব বন্ধ করে দিয়ে সমস্ত রুহকে ঘুম পাড়ানো হবে, যা ভাঙ্গবে ইসরাফীলের ২য় ফুঁৎকারে, পুনরোত্থানের সময়ে।তবে নবী এবং শহীদগণের রুহ এব্যাপারে স্বতন্ত্র। উনাদের দেহ মাটিতে সংরক্ষিত থাকে এবং রুহ গুলো বিশেষ পদ্ধতিতে জান্নাতে গিয়ে বিচরণ করে।

৪র্থ ধাপঃ আমাদের জীবন প্রক্রিয়ার চারটি ধাপের ৪র্থটি হল "আখেরাত" বা পরকাল। ইসরাফীল আঃ ২য় বার শিঙ্গা ফুঁকলে দেহ গুলোকে পুনরগঠন করে উঠানো হবে। তখন রুহ এসে দেহের সাথে যুক্ত হবে। আবার শুরু হবে দেহ এবং রুহের সমন্বয়ে চিরস্থায়ী জীবনের পথ চলা। হাশর হবে, বিচার হবে। দুনিয়ার জীবনে যে যা করেছে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনে এর ফল ভোগ করবে।
দুনিয়ায় যারা খাঁটি ঈমান এবং ভেজালমুক্ত আমলের অধিকারী ছিল তারা হবে চিরস্থায়ী জান্নাতের উন্মুক্ত জগতে বিলাসী জীবনের অধিকারী। আর যারা দুনিয়ার জীবনকে হেলায় খেলায় ও রং তামাশায় নষ্ট করে কুফর শিরক ও পাপাচার করেছে তারা জাহান্নামে সাজা ভোগ করবে।

শারীয়া'হঃ উক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল আখেরাতে চিরস্থায়ী জীবনে জান্নাতের অধিকারী হতে হলে দুনিয়ার জীবনে পুণ্য অর্জন করতে হবে। আর দুনিয়ার জীবনে পূন্য অর্জনের একমাত্র উপায় আল্লাহর হুকুম আর নবী সাঃর তরীকাহ তথা ইসলামী শারীয়া'হ মত জীবনযাপন করা। পক্ষান্তরে বাস্তব জীবনের কোনো ক্ষেত্রে বা কোনো বিষয়ে শারীয়া'হ নির্ধারিত সীমানার বাইরে যাওয়াই পাপ। সুতরাং আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনে জান্নাত পেতে হলে দুনিয়ার জীবনে শারীয়া'হ মেনে চলতে হবে তথা আমল ও ইবাদাত করতে হবে আর এটাই সৃষ্টির মূল লক্ষ্য। মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ "আমি জিন্ন আর ইনসান সৃষ্টি করেছি শুধুই আমার ইবাদাতের জন্য"। (সূরাহ যারিয়াতঃ ৫৬)

২য় পাঠঃ জীবন ও জীবনের লক্ষ্য

আমাদের মাঝে কে কত সুন্দর করে আল্লাহর ইবাদাত করতে পারি এটা পরীক্ষা করার জন্য আমাদেরকে এ দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ তিনি (আল্লাহ) জীবন ও মৃত্যু (দুনিয়ার জীবন) সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাঝে কে কত সুন্দর করে আমল করে এটা পরীক্ষা করার জন্য। (সূরাহ মুলকঃ ২)

উল্লেখ্য আ'মাল অর্থ কাজ বা কর্ম। সেমতে আল্লাহর ইবাদাত করতে যেসব কাজ করা হয় বা যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয় এগুলোকে আ'মাল বলা হয়।

ইবাদাতঃ পরিচিতি ও পদ্ধতিঃ ইবাদাত অর্থ দাসত্ব ও উপাসনা। আমরা আল্লাহর দাস তাই দাসত্ব ও ইবাদাত করব শুধুই আল্লাহর। আল্লাহর ইবাদাত করতে হলে প্রথমে আল্লাহর মনোনিত আদর্শ গ্রহন করতে, হয়, আল্লাহর দেওয়া আইন বিধান ও নীতিমালা মেনে চলতে হয় অতঃপর একটি নর্ধারিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি মেনে দাসত্ব ও ইবাদাত করতে হয়। আর তা হল..

- এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করতে হয়, আল-কুরআনে যাকে বলা হয়েছে ত্বাগূত বর্জন। ত্বাগূত বর্জন ঈমানের পূর্বশর্ত আর ঈমান আমল কবুলের পূর্বশর্ত।
- নিজের উপর মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে হয়, ইসলামে একে বলা হয় আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি দেওয়া, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করা ও ইসলাম গ্রহন করা তথা আল্লাহর মনোনিত আদর্শ গ্রহন করা।
- আল্লাহ প্রদত্ব যাবতীয় বিষয়ে পরিপূর্ন আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয়, ইসলামে একে বলা হয় তাসদীক বি-ল-জিনান বা অন্তরের বিশ্বাস।
- আল্লাহ প্রদত্ব ও রাসূল কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হকে নৈতিক ও আদর্শিক ভবে মেনে নিতে হয়।
- বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধিবিধান তথা ইসলামী শারীয়া'হ মেনে চলতে হয়।
- বাস্তব জীবনে শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীন তথা আল্লাহর মনোনিত জীবন আদর্শ মেনে চলতে হয়। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা বা বিধিবিধানকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে না ফেলা কুফর তথা ঈমান বিনষ্টকারী মহা পাপ। আল-কুরআনে এ পদ্ধতিকে বলা হয়েছে একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন বা হানীফ পদ্ধতি।
- নিজের ঈমান, আমল ও নিয়তকে সকল প্রকার ভেজাল থেকে মুক্ত রাখতে হয়, আল-কুরআনে একে বলা হয় ইখলাস্ব আর যে বা যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয়েছে মুখলিস্ব।
- উল্লেখিত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি মেনে জীবন পরিচালনা করলে এটা আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে গন্য হয়। নতুবা এসব কাজ বেহুদা ও বাজে কাজে রূপান্তরিত হয়।

আল্লাহর ইবাদাত আর অন্যের ইবাদাত আবার সমান নয়। যেমন--

- আল্লাহর ইবাদাত করতে হয় আল্লাহর শিখানো নীতি আদর্শ ও দর্শন মেনে রাসূলের বাতানো পদ্ধতিতে আর আল্লাহ ছাড়া অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর ইবাদাত হয় মানুষের মনগড়া নিয়মনীতি মেনে মানুষের বানানো পদ্ধতিতে।
- আল্লাহর ইবাদাত হয় সার্বক্ষনিক আর আল্লাহ ছাড়া অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর ইবাদাত হয় মৌসুমী।
- আল্লাহর ইবাদাত হয় বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে আর আল্লাহ ছাড়া অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর ইবাদাতবা পূজা হয় ট্রাডিশনালভাবে আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব।

তাই মহান আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রেখে, নিজেদের জীবন ও সত্বার উপর এক আল্লাহর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে তথা পরিপূর্ন ঈমানের সহিত বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে মহান আল্লাহর বিধিবিধান মেনে নেওয়া ও মেনে চলার নাম আল্লাহর ইবাদাত করা।

৩য় পাঠঃ ইবাদাত নিয়ে বিভ্রান্তি

ইবাদাত নিয়ে বিভ্রান্তি মানব সমাজের অতি প্রাচিনতম বিষয়। যুগযুগ ধরেই মানব সমাজে ইবাদাত বা পূজার নামে মনগড়া ও বানানো নানা পন্থা, পথ ও পদ্ধতি প্রচলিত আছে। নিম্নে এর কিছু উদাহরন পেশ করা হল। যেমনঃ

উদাহরনঃ ১- অবস্থানঃ নির্ধারিত দিনে, নির্ধারিত সময়ে, নির্ধারিত স্থানে বা নির্ধারিত স্থাপনার সামনে অবস্থান করা ইবাদাত বা পূজার একটি সনাতন পদ্ধতি। যেমন ইরশাদ হচ্ছে

ইবরাহীম যখন তার পিতা ও জাতিকে বললঃ এসব তামাছীল (মূর্তী, প্রতিমা, আকৃতি) গুলো আসলে কী? যেগুলোর (প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর) জন্য তোমরা (এর কাছে) অবস্থান কর। (সূরাহ আম্বিয়াঃ ৫২)

ইবাদাতের এ পদ্ধতিটি ইসলামেও চালু রাখা হয়েছে। যেমনঃ হাজ্জ করতে গিয়ে যুল-হিজ্জাহ মাসের ৯ তারিখের দিনে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে আর সূর্যাস্তের পর থেকে রাতে মুজদালিফায় এবং এরপর ২/৩দিন মিনায় অবস্থান করতে হয়।

সুতরাং আল্লাহর অনুমোদিত স্থান বা স্থাপনা ছাড়া নির্ধারিত দিনতারিখে নির্ধারিত কোনো ব্যক্তি, মূর্তী, স্থান, বা স্থাপনার প্রতি শদ্ধা জানাতে সেখানে অবস্থান নেওয়া বা অবস্থান করা ইবাদাতের শামিল এবং এমন করলে শিরক হবে।

উদাহরনঃ ২- দাড়িয়ে থাকাঃ বিশেষ কোনো বস্তু বা ব্যক্তির সম্মানার্থে তার সামনে বিশেষ পদ্ধতিতে দাড়িয়ে থাকা ইবাদাতের একটি সনাতন পদ্ধতি। যেমন যারা সূর্য পূজা করে তারা সূর্যের দিকে মূখ করে বিশেষ পদ্ধতিতে দাড়িয়ে থাকে।

ইবাদাতের এ পদ্ধতিটি ইসলামেও চালু আছে। যেমনঃ আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন "তোমরা (সালাতে) আল্লাহর সম্মানার্থে (বিশেষ পদ্ধতিতে) চুপচাপ/অনুগত হয়ে দাড়িয়ে থাকবে। (বাক্বারাহঃ ২৩৮)

সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা স্থাপনার জন্য এমন কিছু করলে এটা শিরক হিসেবে গন্য হবে।

উদাহরনঃ ৩- ভোগ বা ভেটঃ ভোগ বা ভেট দেওয়া ইবাদাতের আরো একটি সনাতন পদ্ধতি। আমাদের সমাজের হিন্দু লোকেরা তাদের দেব/দেবীর তরে ফুল/ফল/খাদ্যদ্রব্যসহ নানানকিছু ভোগ বা ভেট দিয়ে থাকে।

ইবাদাতের এ পদ্ধতিটি ইসলামেও চালু রয়েছে। ইসমালী পরিভাষায় এটা সাদাক্বাহ নামে পরিচিত। আমরা আমাদের নানা বস্তু আল্লাহর নামে সাদাক্বাহ করি এবং গরীব ও অসহায়দের মাঝে বিতরন করে থাকি। সুতরাং আল্লাহর বিধান ও নবী সাঃর তরিকার বাইরে গিয়ে নিয়ম করে আল্লাহ ছাড়া অন্যকিছুর তরে এমন করলে এটা শিরক হিসেবে গন্য হবে।

উদাহরনঃ ৪- পশু জবেহঃ আনুষ্ঠানিকভাবে পশু জবেহ ইবাদাতের একটি সনাতন পদ্ধতি। যুগযুগ ধরেই মানুষ তাদের ইশ্বরের নামে আনুষ্ঠানিকভাবে পশু জবেহ করে আসছে।

ইবাদাতের এ পদ্ধতিটি ইসলামেও চালু রয়েছে। ইসলামী পরিভাষায় এরনাম কুরবানী বা উদ্বহিয়্যাহ। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত বিদ্যমান রয়েছে।

সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নামে অথবা নির্ধারিত কোন স্থাপনাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে তাতে পশু জিবেহ করা অবশ্যই শিরক হিসেবে গন্য হবে।

যেমনঃ কোনো মূর্তী, কোনো পীর বা কোনো মহানব্যক্তির নামে পশু জবেহ করা অথবা কোন মাজার, কোনো গাছ, কোনো বিশেষ স্থান বা স্থাপনাকে মহান ও পবিত্র মনে করে সেখানে গিয়ে পশু জবেহ করা।

উদাহরনঃ ৫- বর্জনঃ কারো সন্তুষ্টির জন্য কোনকিছু বর্জন করা ইবাদাতের একটি সনাতন পদ্ধতি। সনাতন ধর্মের নামে এখনো অনেক মানুষের মাঝে এসব পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে।

ইবাদাতের এ পদ্ধতিটি ইসলামেও চালু রয়েছে। যেমনঃ

- হাজ্জ, উমরাহ ও সালাতরত অবস্থায় আমরা অনেক হালালও বিষয় বর্জন করে থাকি তাইতো হাজ্জ ও উমরাহর সুচনাকে বলা হয় "ইহ'রাম" আর সালাতের সূচনাকে বলা হয় "তাহ'রীমাহ" আর এ উভয়টির অর্থই হারাম বানানো।
- সাওম বা রোজাতেও আমরা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত সময়ে খাদ্য, পানীয় ও যৌনাচার বিসর্জন দিয়ে থাকি।

সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য এমনকিছু করা অবশ্যই শিরক হিসেবে গন্য হবে।

উদাহরনঃ ৬- রুকু বা সিজদাহ করাঃ রুকু, সিজদাহ ইবাদাতের একটি সনাতন পদ্ধতি। বিশেষ কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান বা স্থাপনার সামনে মাথা নত করে রুকু করা বা সম্পূর্ন নত হয়ে সিজদাহ করার রীতি এখোনো প্রচলিত আছে।

ইবাদাতের এ পদ্ধতিটি ইসলামেও গুরুত্বপূর্ন। মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ "ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা রুকু কর, সিজদাহ কর, তোমাদের রাব্বের ইবাদাত কর আর কল্যানকর কাজ কর, এতে তোমরা সফল হতে পারবে"। (হাজ্জঃ ৭৭)

সুতরাং উপরের উদাহরনসমূহ থেকে আনরা বুঝতে পারলামঃ আল্লাহর ইবাদাত করতে যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করলে এটা ইবাদাত হিসেবে গন্য হবে এবং শিরক হবে।

ইবাদাত করতে হবে শুধুই আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া অন্যকারো বা অন্যকিছুর ইবাদাত করা যাবে না। আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে আল্লাহর মনোনিত দ্বীন ও আদর্শ মেনে।

১ম সেমিষ্টার ২য় দিন

ইসলাম ও মুসলিম

ইসলাম ও মুসলিম আমাদের আসল শিকড়। এটা আমাদের অস্তিত্বের বিষয় এবং জাতীয় পরিচয় বহনকারী নৈতিক ও আদর্শিক শব্দ। তাই ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে জানা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। আর এর গুরুত্ব অনুধাবন করেই আমরা এ বিষয়টিকে ৩টি পাঠে বিন্যস্ত করেছি।

১ম পাঠঃ ইবাদাতের আদর্শ /দ্বীন ইসলাম

দ্বীন পরিচিতিঃ দ্বীন শব্দের শাব্দিক অর্থ প্রতিফল ও প্রতিদান। উত্তম প্রতিদান ও প্রতিফলের জন্য যেসব নীতিমালা, দর্শন ও আদর্শ মেনে মানুষ তাদের বাস্তবজীবন পরিচালনা করে এটাই তার দ্বীন হিসেবে বিবেচিত হয়।

মহান আল্লাহর ইবাদাতের জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ও মনোনিত যে আদর্শ, দর্শন ও নীতিমালা আমাদের জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে এটাই আমাদের কাছে আল্লাহর দ্বীন হিসেবে পরিচিত। আমাদের জন্য মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনিত একমাত্র দ্বীনের নাম ইসলাম।

ইসলাম পরিচিতিঃ ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পন করা। মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে মহান আল্লাহর দেওয়া বিধিবিধান মেনে চলাকে নিজের উপর অবধারিত করে নেওয়ার নাম ইসলাম গ্রহন করা আর যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহন করল তাকে বলা হয় মুসলিম।

ইসলাম তথাকথিত শুধু ধর্ম নয়। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ। বাস্তব জীবনের সকল বিষয়েই মূলনীতি ও বিধান ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম। ইসলামে যেমন ধর্ম এবং ধর্মীয় বিষয়াদি রয়েছে। তেমনি রয়েছে সমাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বানিজ্য ও ব্যাংকিং নীতিমালা, শিক্ষানীতি, প্রতিরক্ষানীতি, যুদ্ধনীতি বা সমরনীতি, দেশ জাতি ও সমাজ গঠন এবং পরিচালনার নীতিমালা, আইন বিচার ও শাসন, চুক্তি ও শপথ করা এবং রক্ষা করার নীতিমালা, শ্রমনীতি, প্রবাসনীতি, এসাইলেম বা শরণার্থীনীতি, ইত্যাদি সবকিছু।

সুতরাং বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে ইসলামী বিধিবিধান ও রিতিনীতি মেনে নেওয়া ও মেনে চলাকে নিজের উপর অবধারিত করার নাম ইসলাম গ্রহন করা আর বাস্তব জীবনে এসকলকিছু মেনে চলার নামই ইসলাম মেনে চলা।
যে ব্যক্তি ইসলামকে শুধু ধর্ম মনে করে এবং শুধুমাত্র ধর্ম হিসেবেই মানে তথা শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে ইসলাম আর অন্য ব্যাপারে অন্য নীতি, আদর্শ, দর্শন বা মতবাদ মেনে চলে সে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়।
আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করাই ইসলামের মূলবিষয়। নিজের আত্মসম্মান, চিন্তা চেতনা, ইবাদাত আরাধনাসহ সবকিছু আল্লাহর কাছে সপে দিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে এক আল্লাহর দাসত্ব করাই আত্মসমর্পনের মূল কথা এবং এটা-ই একজন মুসলমানের আসল কাজ।
নবী সাঃর হাদীছ থেকে জানা যায়ঃ ৫টি মূলনীতি মেনে ইসলাম গ্রহন করতে হয় তথা ইসলামের মূলনীতি বা মূল বিষয় ৫টি। যথাঃ

নীতিঃ ১- শাহাদাহঃ শাহাদাহ অর্থ সাক্ষ্য দেওয়া। শাহাদাহ ইসলামের প্রবেশ দ্বার। দুটি সাক্ষ্য দিয়েই আনুষ্ঠানিক ভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে হয়। আর এ সাক্ষ্য দুটি হচ্ছে..

- আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই
- মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল

নীতিঃ ২- সালাত কায়েম করাঃ ইসলামের সালাত আমাদের সমাজে নামায হিসেবে পরিচিত। আর কায়েম অর্থ প্রতিষ্ঠিত করা। সালাত কায়েম করতে হয় দুই ভাবে। যথা ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে।

ব্যক্তি জীবনে সালাত কায়েমকরাঃ নিয়মিত ও সময়মত সালাত আদায় করার নাম ব্যক্তি জীবনে সালাম কায়েম করা। নিয়মিত সালাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে পবিত্র কুরআনে সূরাহ মায়া'রিজের ২৩ তম আয়াতে আর সময়মত সালাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে সূরাহ নিসার ১০৩ তম আয়াতে।

সমাজ জীবনে সালাত কায়েম করাঃ মসসজিদ বানিয়ে নিয়মিত জামায়াতের সহিত সালাত আদায় করা এবং নিয়মিত সালাত হচ্ছে কি না আর সবাই সালাত আদায় করছে কি না এ ব্যাপারে যথাযথ তদারকি করার নাম সমাজে সালাত কায়েম করা। যে কথার প্রতি পবিত্র কুরআনে বারবার ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং যে কথার বাস্তব নমুনা রাসূল সাঃ ও খুলাফা রাশিদীনের বাস্তব অনুশীলন থেকে আমরা জানতে পেরেছি।

নীতিঃ ৩ - যাকাত আদায় করাঃ ইসলামী পরিভাষায় যাকাত একটি অর্থ ব্যবস্থার নাম। ইসলামী সরকার ধনী মুসলিমদের থেকে হিসাব করে তাদের সঞ্চয় ও ব্যবসার পন্য থেকে বাতসরিক ২.৫% করে উসুল করে নির্ধারিত খাতে খরচ করবে। এটাই যাকাতের মূল কথা। তবে ইসলামী সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত না থাকলে বা সরকার যাকাত আদায় না করলে মুসমিম জনতা তাদের নিজ উদ্যগে যাকাত দিতে হবে বলে ফাক্বীহগন সর্বসম্মত মতামত দিয়েছেন।

নীতিঃ ৪- সাওম পালন বা সিয়াম সাধনঃ ইসলামের সাওমকে আমাদের সমাজে বলা হয় "রোজা" আর সিয়ামসাধনকে বলা হয় "রোজা রাখা"। আরবী রামাদ্বান মাসে পুরা মাস সাওম পাকন করা মুসলিমদের ফরজ দায়িত্ব। এটা ইসলামের ৪র্থ মূল বিষয়। উল্লেখ্য আরবী মাস ২৯ দিনেও হতে পারে আবার ৩০ দিনেও হতে পারে।

নীতিঃ ৫- আল্লাহর ঘরে হাজ্ব সম্পাদন করাঃ ইসলামের ৫ম মূল বিষয় হচ্ছে আল্লাহর ঘরে হাজ্ব সম্পাদন করা। সরকার প্রতি বছর যু-ল-হিজ্জাহ মাসে হাজ্বের ব্যবস্থা করবে এবং যাদের হাজ্ব করার সাধ্য ও সামর্থ আছে এমন মুসলিম জনতা এ মাসের ৮-১৩ তারিখ পর্যন্ত হাজ্বের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবে।

২য় পাঠঃ মুসলিম পরিচিতি

মুসলিম পরিচিতিঃ মুসলিম অর্থ আত্মসমর্পনকারী। মহান আল্লাহর কাক্সহে আত্মসমর্পন করে সকল প্রকার ত্বাগূত্বকে বর্জন করে আল্লাহর একত্ববাদ এবং মুহাম্মাদ সাঃর রিসালতের সাক্ষ্য দিয়ে তথা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুসলিম হতে হয়। মুসলিম হবার পর জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে হয়, নিজের ঈমানকে মজবুত করতে হয় এবং আল্লাহর বিধান মেনে, রাসূলের আদর্শ মত জীবন পরিচালনা করতে হয়। আর এসব করতে গিয়ে মুসলিমগণ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। যথাঃ মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক।

ক- মুঅমিনঃ যে মুসলিম--

- ঈমানের মৌলিক বিষয় সমূহের উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখল,
- সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করল এবং
- বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে ইসলামী বিধিবিধান মেনে নিল ও মেনে চলল সে-ই মুঅমিন।

/অন্য কথায় যে মুসলিম সকল প্রকার কুফর, শিরক ও কবীরাহ গোনাহ থেকে বিরত থাকবে সে-ই মুঅমিন।
প্রতিটি মুঅমিনই আল্লাহর ওয়ালী, মুঅমিন নিশ্চিত জান্নাতী। মুঅমিনগণ পরকালে ফাসিকদের জন্য শাফায়া'ত করতে পারবে যদি আল্লাহ তাকে শাফায়া'তের অনুমতি দেন।

খ- ফাসিকঃ যে মুসলিম—

- ঈমানের মৌলিক বিষয় সমূহের উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখল,

- সকল প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করল
- বাস্তব জীবনে ইসলামের যাবতীয়বিধান নীতিগতভাবে মেনেও নিল তবে সঠিকভাবে মেনে চলতে পারল না সে ফাসিক বলা হয়। /অন্যকথায় যে মুসলিম কোনো প্রকার কবীরাহ গোনায় জড়িয়ে পড়বে সে-ই ফাসিক।

ফাসিক পরকালে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হবে। আল্লাহ ইচ্ছা হলে ফাসিককে মাফ করে দেবেন আর ইচ্ছা হলে জাহান্নামে সাজা দেবেন। তবে ফাসিক জাহান্নামে গেলেও চির জাহান্নামী হবে না। সাজা ভোগের পর তাদেরকে মুক্ত করা হবে। সকল ফাসিককে আবার জাহান্নামে যেতে হবে না। নেক লোকদের শাফায়া'তে (সুপারিশে) অনেক ফাসিকই মাফ পেয়ে যাবে। মুঅমিনগণ পরকালে ফাসিকদের জন্য শাফায়া'ত করতে পারবে যদি আল্লাহ তার জন্য শাফায়া'তের অনুমতি দেন।

গ- মুনাফিকঃ যে মুসলিম ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহের উপর বিশ্বাসে অবিচল নয় অথবা ত্বাগূতকে বর্জন করেনি সে মুনাফিক হয়ে যায়।

অন্যকথায় যে মুসলিম নিজেকে কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে ফেলে অথবা যে মুসলিম ইসলামের কোনো নীতি বা বিধানকে অপছন্দ করে সে-ই মুনাফি (চাই আমল যতই করুক)

মুনাফিক মানব সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। পরকালে মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাজা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ ৯ তাওবাহঃ ৮৪)

৩য় পাঠঃ দ্বীন পালনের পদ্ধতি ও ইবাদাতের পন্থা

আমাদের দ্বীন তথা জীবন আদর্শ যেমন আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ঠিক তেমনিভাবে দ্বীন পালনের পদ্ধতিও আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো তরিকা বা পদ্ধতিতে দ্বীন পালন করা হলে এটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

আল্লাহর দ্বীন পালনের সঠিক পদ্ধতির নাম "হানীফ পদ্ধতি"। তাই আমাদের উপর অন্যতম আরো একটি ফরজ হচ্ছে বাস্তব জীবনে আল্লাহর দ্বীন পালন করতে গিয়ে "হানীফ পদ্ধতি" অবলম্বন করা। আর এটা-ই আমাদের প্রতি আল্লাহর আদেশ। মহান আল্লাহ তদীয় নবী মুহাম্মাদ সা.কে আদেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন..

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123)

(হে নবী!) অতঃপর আমি তোমার কাছে ওহী পাঠিয়েছি (এবং এ ওহীর মাধ্যমে অন্যান্য নবীদের মত তোমাকেও আদেশ দিচ্ছি) তুমিও "হানীফ পদ্ধতিতে" ইবরাহীমের আদর্শ অনুকরণ করবে আর (শোনো!) সে মুশরিকদের দলভুক্ত ছিল না। (১৬ নাহ'লঃ ১২৩)

অন্যত্র বলা হচ্ছে

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125)

তার চেয়ে উত্তম দ্বীনদার আর কে হতে পারবে? যে ব্যক্তি..

- আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করল,
- ইহসান (তথা নিজের ঈমান, ইসলাম, ইবাদাত, কাজকর্ম, আচার-ব্যবহার এবং কথা-বার্তাকে সুন্দর) করল
- আর হানীফ পদ্ধতিতে ইবরাহীমী আদর্শের অনুকরণ করল? (কারণ ইবরাহীম আঃ ছিলেন উত্তম আদর্শের অধিকারী। তাই) আল্লাহ ইবরাহীমকে খালীল বানিয়েছেন। (৪ নিসাঃ ১২৫)

হানীফ পদ্ধতি পরিচিতিঃ আল্লাহর দ্বীনই হলো মানব জাতির জন্য একমাত্র সঠিক দ্বীন তথা সঠিক জীবন আদর্শ। আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য সকল দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা ও বিধানকে বিসর্জন দিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে শুধুমাত্র ইসলামী রীতিনীতি ও বিধান মেনে চলার নাম হানীফ পদ্ধতিতে দ্বীন পালন করা। আর এটাই আমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে।

সুতরাং যে বা যারা ইসলামের সাথে অন্যকোনো দর্শন, আদর্শ, মতবাদ, নীতিমালা ও বিধানকে সংযুক্ত করে মিশ্রিত জীবন যাপন করল, যারা ইসলাম ও কুফরের সমন্বয়ে জীবনের নতুন পথ বানিয়ে নিল তারা অবশ্যই বিভ্রান্ত হয়ে গেল। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151)

যারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করল (তথা অবাধ্য হয়ে গেল,)

- যারা আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করল (তথা রাসূলের হাদীছকে আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে দাঁড় করাল অথবা কুরআন মানল তবে হাদীছ মানল না)
- যারা বলল (ইসলামী আইনের) কিছু মানি আর কিছু মানি না
- যারা ঈমান ও কুফরের সমন্বয়ে নতুন পথ বানিয়ে নিল,

এরাই হল আসল কাফির। এসব কাফিরদের তরে তৈরি করেছি (জাহান্নামে) যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৪ নিসাঃ ১৫০-১৫১)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুঅমিন হতে হলে পরিপূর্ণভাবে ইসলাম মেনে চলতে হয়। জীবনের কিছু ক্ষেত্রে ইসলাম আর কিছু ক্ষেত্রে অন্যথা করলে মুঅমিন হওয়া যায় না। ইসলামের সাথে অন্যকিছু মিশ্রিত করে জীবনের নতুন পথ তৈরী করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে যায়। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিক জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে পতিত হবে। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪) মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

আল্লাহর ইবাদাতের জন্য যেমন নির্ধারিত পদ্ধতি রয়েছে যার না হানীফ পদ্ধতি, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর ইবাদাতের পন্থাও ঠিক করে দিয়েছেন মহান রাব্ব। আল্লাহর ইবাদাতের জন্য নির্ধারিত পন্থার নাম ইখলাস্ব তথা ভেজালমুক্ত পন্থা।

ইখলাস্ব পরিচিতিঃ ইখলাস্ব অর্থ ভেজালমুক্ত। আল্লাহ কেবল ভেজালমুক্ত আমল ও ইবাদাতই গ্রহন করে থাকেন। ভেজাল যুক্ত কোন কাজ আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য হয় না। আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ সুতরাং তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে শুধুই তার জন্য ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে। (গাফিরঃ ১৪)

ভেজালমুক্ত আমল ও ইবাদাত মানে হচ্ছে আল্লাহর কিতাবে বর্নিত আমল ও ইবাদাত। ইরশাদ হচ্ছে..
(হে নবী!) আমি তোমার প্রতি কিতাবটি নাযিল করেছি যথাযথভাবেই। সুতরাং তুমি আল্লাহর ইবাদাত করবে শুধুই তার জন্য ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে। (যুমারঃ ২)

আল্লাহর কথা মেনে রাসূল সাঃও ভেজালমুক্ত থেকেই আমল ও ইবাদাত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে..
বলে দাও! আমি শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদাত করি শুধুই তার জন্য ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে। (যুমারঃ ১৪)

এক হাদীছে বর্নিত হয়েছে, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ তুমি তোমার দ্বীনকে (তথা নিয়ত, কর্ম ও আদর্শকে) ভেজালমুক্ত রাখবে এতে কলে অল্প আমলই তোমার (নাজাতের) জন্য যথেষ্ট হবে। (হাদীছটি সাহীহ এবং কয়েকটি কিতাবে বর্নিত হয়েছে)
আমল ও ইবাদাত এবং দ্বীনকে ভেজালমুক্ত রাখতে হলে আমাদেরকে ৩টি কাজ করতে হবে। যথা ..

- আমাদের নিয়তকে ভেজালমুক্ত রাখতে হবে। একে বলা হয় সাহীহ নিয়ত বা ভেজালমুক্ত নিয়ত।
- আমাদের কর্মকে ভেজালমুক্ত রাখতে হবে তথা কোনো প্রকার সংযোজন বা বিযোজন করা যাবে না।
- নিজের জীবনের নীতিআদর্শকে ভেজালমুক্ত রাখতে হবে আর এটাই বলা হল ভেজালমুক্ত দ্বীন।

আ'মাল ও ইবাদাত কবুল হওয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে ঈমান। মহান আল্লাহ কেবল মুঅমিন ও মুত্তাক্বীদের থেকেই তাদের আ'মাল ও ইবাদাত কবুল করে থাকেন। ইন শা-আল্লাহ ঈমানের আলোচনা আমরা ৪র্থ দিনে করব।

১ম সেমিষ্টার **৩য় দিন**

সাওম, সিয়াম ও রামাদ্বান

রামাদ্বান অতি গুরুত্বপূর্ন একটি চন্দ্র মাসের নাম। এ মাসেই কুরআন অবতরন শুরু হয়েছে এবং এ মাসেই লোকিয়ে আছে লাইলাতু-ল-ক্বাদর। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় রমজান মাস। এ মাসের বিশেষ ইবাদাত হচ্ছে সাওম পালন বা সিয়াম সাধন, ফার্সি ভাষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের সমাজে বলা হয় রোজা রাখা। বর্তমানে এ মহান মাস চলমান রয়েছে। তাই এ সময়ে সাওম, সিয়াম ও রামাদ্বান সম্পর্কে জানা খুবই জরুরী। আর এ জন্যই আমরা এ বিষয়টিকে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি। বুঝার সুবিধার জন্য বিষয়টিকে আমরা কয়েকটি পাঠে বিন্যস্ত করেছি।

১ম পাঠঃ সাওম, সিয়াম ও রামাদ্বান

আমাদের উপর অর্পিত ফরজ দায়িত্ব সমূহের মাঝে অন্যতম আরো একটি হল রামাদ্বান মাসে সাওম পালন বা সিয়াম সাধন করা। ইসলামের ৫টি মৌলিক বিষয়ের ৪র্থ নম্বরে রয়েছে সিয়াম। সিয়াম সাধনকে আমাদের সমাজে ফার্সি ভাষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় রোজা রাখা। সাওম পালন করা মুসলিম হিসেবে আমাদের ফরজ দায়িত্ব। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184)

ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শোনো!) তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে সিয়াম সাধন করা (রোজা রাখা) যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। (আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকাকে তাকওয়া বলে। রোজা পালন করতে হয় এক মাস তথা) নির্ধারিত (২৯/৩০) দিন। (রোজার মাসে) কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে (সে এ রোজা ভেঙ্গে ফেলবে এবং রামাদ্বানের পর) অন্য দিন এ সংখ্যা পূর্ণ করবে। আর সক্ষম ব্যক্তি (রোজা না রাখলে প্রতিটি রোজার বদলে একজন করে) মিসকিনকে ফিদয়াহ (২ বেলার খাবার) দিবে। কেউ স্বেচ্ছায় সৎকাজ করলে এটা তার জন্য অনেক কল্যাণকর হয়। তোমরা রোজা রাখবে, এটা-ই তোমাদের জন্য কল্যাণকর (এ কথাটি) যদি তোমরা বুঝতে। (২ বাক্বারাহঃ ১৮৩-১৮৪)

আইন ও বিধানঃ ইসলামের সূচনাতে এমন বিধান ছিল, তখন সক্ষম ব্যক্তি রোজা না রেখে ফিদয়াহ দিলে হয়ে যেত কিন্তু পরবর্তীতে সামনের ১৮৫তম আয়াত দ্বারা এ বিধান রহিত করা হয়েছে। এখন সবাইকে রোজা রাখতে হয়। তবে বার্ধক্য বা স্থায়ী অসুস্থতার কারণে যারা রোজা রাখতে সক্ষম নয় তারা রোজা না রেখে ফিদয়াহ দেবে। এক রোজার বদলে একজন মিসকীনকে (দরিদ্র মানুষকে) দু'বেলা খাদ্য দানকে ফিদয়াহ বলা হয়। আর রামাদ্বান মাসে সফরে থাকলে অথবা অসুস্থ হলে তখন রোজা না রেখে অন্য সময়ে এটা পূর্ণ করতে পারবে।

আরবী সনের ৯ম মাস রামাদ্বান। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় রমজান। সিয়াম পালন করতে হয় রামাদ্বান মাসে। মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185)

রামাদ্বান মাস; যাতে মানুষের হেদায়াত, সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও ভালমন্দ নির্ধারণের নীতিমালা দিয়ে নাযিল করা হয়েছে আল-কুরআন। সুতরাং যে ব্যক্তি এ মাস পাবে সে যেন অবশ্য-ই রোজা রাখে। তবে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে (এ রোজা ভঙ্গ করবে এবং) অন্যদিন এটা পূর্ণ করবে। আল্লাহ (তার বিধানকে) তোমাদের তরে সহজ করতে চান, কঠিন করতে চান না। (তিনি অসুস্থতায় বা সফর অবস্থায় রোজা না রেখে এ রোজা অন্য সময়ে রাখার সুযোগ দিচ্ছেন) যেন তোমরা (রোজার) সংখ্যা পূর্ণ করতে পার আর আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা কর। কারণ তিনিই তোমাদেরকে হেদায়াত করেছেন। আর যেন তোমরা তার শোকর আদায় কর। (২ বাক্বারাহঃ ১৮৫) (অন্তরে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে নেয়ার নাম আল্লাহর শোকর আদায় করা।)

সাওম ও সিয়াম পরিচিতিঃ সাওম অর্থ সংযম, বিরতি আর সিয়াম অর্থ সংযম করা বা বিরত থাকা। ইসলামী শারীয়া'হ মতে "ফজরের সুচনা সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো প্রকার খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ এবং যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকাকে বলা হয় সাওম পালন বা সিয়াম সাধন"। সিয়াম অবস্থায় এ তিনটি কাজের যে কোনো একটি করে ফেললে সাওন নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের সমাজে সাওম বা সিয়ামকে বলা হয় রোজা রাখা।

পরিচিতি পর্যালোচনা ও সাওম ভঙ্গের কারণ সমূহঃ

- ফজরের সুচনা সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সিয়াম পালন করতে হয়। তাই রাতে সিয়াম পালন করলে হবে না।
- সিয়াম অবস্থায় খাদ্য থেকে বিরত থাকতে হয়। তাই খাবার খেলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায়
- সিয়াম অবস্থান পানীয় থেকে বিরত থাকতে হয়। তাই পান করলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায়
- সিয়াম অবস্থান যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকতে হয়। তাই যৌন সম্ভোগ করলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায়

২য় পাঠঃ সিয়ামের বিধান

ইসলামী শারীয়া'হ মতে রামাদ্বান মাসে সিয়াম সাধন করা বিবেকবান ও বালিগ প্রতিটি মুসলিম নর ও নারীর উপর ফরজ। সুতরাং

- পাগল, বেহুশ বা মাতালের উপর সিয়াম ফরজ হবে না
- নাবালিগ শিশুর উপর সিয়াম ফরজ হয় না
- অমুসলিমের উপর সিয়াম ফরজ হয় না।

রামাদ্বান পরিচিতিঃ চন্দ্র বছরের ৯ম মাসের নাম রামাদ্বান। আমাদের সমাজে উর্দু/ফার্সি উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় "রমযান বা রমজান"। রামাদ্বানসহ চন্দ্র মাসগুলো ২৯ বা ৩০ দিনে পূর্ণ হয়ে থাকে।

রামাদ্বান মাসের বৈশিষ্টঃ

- রামাদ্বান সিয়াম সাধনের মাস
- রামাদ্বান মাসে আল-কুরআন নাযিল করা হয়েছে
- রামাদ্বান মাসেই রয়েছে মহান আল্লাহর বিশেষ উপহার "লাইলাতু-ল-ক্বাদর" আমাদের সমাজে যে রাতকে শবে কদর বলা হয়। শবে কদর উর্দু ও ফার্সি ভাষার শব্দ।

সাওম পালনের লক্ষ্যঃ

- আল্লাহর আদেশ পালন করা তথা আল্লাহর ইবাদাত করা
- আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করা। (উল্লেখ্য আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকাকে তাকওয়া বলে।)

সাওম পালনের শিক্ষাঃ সাওম পালনের মাধ্যমে আমরা বেশ কয়েকটি বাস্তব শিক্ষা অর্জন করি। এরমাঝে নিজেদের প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ এবং লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনার উপর নিয়ন্ত্রণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন..

- সাওম অবস্থায় আমরা সকল প্রকার খাদ্য বর্জন করি। তাই এ শিক্ষা কাজে লাগিয়ে রামাদ্বানের পরও সকল প্রকার হারাম খাদ্য বর্জন করতে হবে।
- সাওম অবস্থায় আমরা সকল প্রকার পানীয় বর্জন করি। তাই এ শিক্ষা কাজে লাগিয়ে রামাদ্বানের পরও সকল প্রকার হারাম পানীয় বর্জন করতে হবে।
- সাওম অবস্থায় আমরা যৌন সম্ভোগ বর্জন করি। তাই এ শিক্ষা কাজে লাগিয়ে রামাদ্বানের পরও সকল প্রকার হারাম যৌনাচার বর্জন করতে হবে।

সুতরাং আমাদের লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা এবং প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রের এক বাস্তব অনুশীলনী হচ্ছে সিয়াম সাধন। আর এ শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে সারাটি বছর আমরা অনেক পাপ ও পাপাচার থেকে বাঁচতে পারব, ইন শা-আল্লাহ।

এবার আসুন! সিয়াম সাধন বা রোজা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু বিধিবিধান জেনে নেই..

অবস্থা	বর্ণনা	বিধান/মন্তব্য	করণীয়
অস্বীকার, অবজ্ঞা বা ঐচ্ছিক মনে করা	যে মুসলিম রামাদ্বান মাসের সিয়াম পালনে অস্বিকৃতি ব্যক্ত করল /রামাদ্বানের সিয়ামকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করল /রামাদ্বানের সিয়ামকে ঐচ্ছিক মনে করল..	তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে গেলো	তাওবাহ করে ঈমানকে নবায়ন করতে হবে। নতুবা সে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে।
না রাখা	যে ব্যক্তি তার উপর ফরজ হওয়া সত্বেও রামাদ্বান মাসের সিয়াম পালন করল না..	সে মহাপাপ করল	এ জন্য তাওবাহ ও ইস্তিগফার করতে হবে এবং এ রোজাগুলো পূর্ণ করতে হবে
রোগীব্যক্তি	যেমুসলিম রামাদ্বান মাসে রোগাক্রান্ত হয়ে গেলো	রোজা না রাখলেও হবে	পরে এসব রোজা পূর্ণ করবে
মুসাফির	যে ব্যক্তি রামাদ্বান মাসে মুসাফির হয়ে গেলো	রোজা না রাখলেও হবে	পরে এসব রোজা পূর্ণ করবে
অতি বৃদ্ধ	কোনো ব্যক্তি যদি বার্ধক্ষজনিত অতি দুর্বলতার কারণে রোজা রাখতে অক্ষম হয়ে যায় অথবা রোজা রাখলে তার মৃত্যু ঝুঁকি বা স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়ে যায় তবে সে..	রোজা রাখবে না	রোজার বদলে ফিদইয়াহ দেবে। উল্লেখ্য প্রতিটি রোজার বদলে একজন মিসকিনকে দু-বেলা খাদ্য দানকে ফিদইয়াহ বলা হয়।
	যে রোগী রোজা রাখলে মৃত্যু ঝুঁকি বা স্বাস্থ্য	রোজা রাখবে না	রোজার বদলে ফিদইয়াহ দেবে।

স্থায়ী রোগী	ঝুঁকি বেড়ে যায় এবং এমন রোগ থেকে আরোগ্য হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ থাকে এমন ব্যক্তি..		উল্লেখ্য প্রতিটি রোজার বদলে ১জন মিসকিনকে দু-বেলা খাদ্য দানকে ফিদইয়াহ বলা হয়।
গর্ভবতী	রোজা রাখলে যদি নিজের বা আগত সন্তানের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হয় তবে..	রোজা রাখবে না	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	আগত সন্তানের স্বাস্থ ঝুঁকি না থাকলে রোজা..	না রাখা অনুমোদিত	না রাখলে পরে পূর্ণ করবে
নিফাস	সন্তান জন্ম দেওয়ার পর মায়ের জড়ায়ু থেকে নির্গত রক্তস্রাবকে নিফাস বলে। নিফাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর অন্য কোনো অসুবিধান না থাকলে..	রোজা রাখবে	যদি নিফাসের দিন (হানাফী মতে ৪০ আর মালিকী মতে ৬০ দিন) পার হয়ে যায় এবং তখাপিও স্রাব বন্ধ না হয় তবে হিসাব মিলিয়ে দেখবে এটা হাইদ্ব তথা নিয়মিক ঋতুস্রাব কি না? নিয়মিত স্রাব হলে সালাত ও সিয়াম দুটু থেকেই বিরত থাকবে আর নিয়মিত ঋতুস্রাব না হলে সালাত ও সিয়াম দুটুই পালন করবে।
ধাত্রী মা	শিশুর বয়স ৬ মাসের কম হলে এবং মায়ের দুধ ব্যতীত অন্য খাবার না খেলে ওই মা..	রোজা রাখবে না	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	৬ মাসের কম বয়সী শিশু যদি মায়ের দুধ ছাড়াও বাজারের দুধে অভ্যস্ত থাকে তবুও ওই মায়ের জন্য..	রোজা না রাখার অনুমতি আছে	না রাখলে ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	শিশুর বয়স যদি ৬ মাসের বেশী হয় এবং মায়ে রোজা রাখলে যদি শিশুর স্বাস্থ্য সমস্যার সম্ভাবনা থাকে তবে ওই মা..	রোজা রাখবে না	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	শিশুর বয়স যদি ৬ মাসের বেশী হয় এবং মায়ে রোজা রাখলে যদি শিশুর স্বাস্থ্য ঝুঁকি না থাকে তবে ওই মা..	রোজা রাখবে	
হঠাৎ অসুস্থ	রোজা অবস্থায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দিলে	রোজা ভেঙ্গে ফেলবে	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
খাদ্য বা পানীয়	রোজার কথা ভুলে গিয়ে কোনোকিছু খেয়ে ফেললে বা পান করলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	কোনো প্রকার খাদ্য দ্রব্য বা পানীয় মুখে দিলে (যদি গলার ভিতরে না যায়)	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	কোনো প্রকার খাদ্য দ্রব্য বা পানীয় মুখে দেওয়ার পর যদি গলার ভিতরে চলে যায়	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	সাধারণভাবে কোনো খাদ্য/পানীয় গিলে ফেললে	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	অযু, গোসল বা সাধারণ ভাবে কুল্লি করার সময় অসাবধানতা বশত গলার ভিতর পানি চলে গেলে (এটাকে "খাত্বা" বলা হয়) অনেকের মতে এমন "খাত্বা"র কারণে রোজা নষ্ট হবে না। আর কারো কারো মতে নষ্ট হয়ে যাবে।	দ্বিমত রয়েছে	
লবণ টেষ্ট	খাদ্যে লবণ টেষ্ট বা স্বাদ টেষ্ট করলে যদি গলার ভিতর না যায়	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
যৌন সঙ্গম	রোজা অবস্থায় ইচ্ছাকৃত ভাবে যৌন সঙ্গম করলে (রামাদ্বানের রাতে স্ত্রীসহবাস বৈধ আছে। দেখুন বাক্বারাহঃ ১৮৭)	রোজা ভেঙ্গে যাবে	কাফফারাহ দিতে হবে (১টি রোজার বদলে ৬০টি রোজা রাখা অথবা ৬০ জন মিসকিনকে দু-বেলা খাদ্য দানকে রোজার কাফফারাহ বলে)
	রোজা অবস্থায় ধর্ষণের বা জোর পূর্বক সঙ্গমের স্বীকার হলে	রোজা ভেঙ্গে যাবে	যে ধর্ষণ করেছে বা জোর পূর্বক সঙ্গম করেছে সে কাফফারাহ দেবে আর অন্যজন শুধু কাজা আদায় করবে
ইচ্ছাকৃত পানাহার	রোজা অবস্থায় ইচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার করা মহাপাপ। এমন করলে	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	এ জন্য তাওবাহ ও ইস্তিগফার করতে হবে এবং ওই রোজা পূর্ণ করতে হবে। (হানাফী ফিক্বহ মতে কাজা ও কাফফারাহ দুটুই আদায় করতে হবে আর অন্য ফিক্বহ মতে শুধু কাজা করলেই চলবে)
বীর্যপাত	কোনো পুরুষ বা নারী রোজা অবস্থায় নিজে নিজে বীর্যপাত ঘটালে	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	পরে ওই রোজা পূর্ণ করবে। (এমন করা পাপ কাজ। তাই সাবধান তাকবে)
	রোজা অবস্থায় পুরুষ বা নারীর যদি স্বপ্নদোষ হয়ে বীর্যপাত হয়ে যায় তবে..	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে

কল্পনা	রোজা অবস্থায় সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কথা কল্পনা করে বীর্যপাত হলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে (কাজটি মোটেই উচিত নয়। তাই এ ব্যাপারে অতি সতর্ক থাকতে হবে)
স্পর্শ বা চুম্বন	রোজা অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে স্পর্শ বা চুম্বন করলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
রক্ত পরীক্ষা	রোজা অবস্থায় রক্ত পরীক্ষা করলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
ইনজেকশন	রোজা অবস্থায় মাংসপেশী বা রগের ভিতর ইনজেকশন নিলে অথবা পেটের চামড়ায় ইন্সুলিন নিলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
ঔষধ	রোজা অবস্থায় শরীরের বাইরের অংশের কাটা, ঘা অথবা আঘাতে ঔষধ লাগালে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	রোজা অবস্থায় পেট বা মাথার ভিতরে ঔষধ চলে গেলে	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	রোজা অবস্থায় যোনি পথে বা পায়খানার রাস্তার ভিতরে ক্রিম, মলম বা অন্য ঔষধ লাগালে	রোজা ভঙ্গ হবে না	করণ এসব বস্তু খাদ্যদ্রব্য নয় এবং খাদ্যনালী বা খাদ্য থলিতে যায় না
চুখের ড্রপ	ড্রপের স্বাদ গলার ভিতরে অনুভূত না হলে সর্বসম্মত মতে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	ড্রপের স্বাদ গলার ভিতর অনুভূত হলে.. (আবু-হানীফাহ, ইবনু তাইমিয়্যাহ, বিন বায, উছাইমিনসহ অনেকের মতে রোজা নষ্ট হবে না। আর মালিকী ও হাম্বলীদের মতে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে।)	দ্বিমত রয়েছে	রোজা অব্যাহত রাখবে/পরে পূর্ণ করবে (বিন বায বলেছেন দ্বিমত থেকে বাঁচার জন্য ওই রোজা পরে পূর্ণ করা উত্তম)
কানের ড্রপ	চুখের ড্রপের সমান বিধান	সমান বিধান	সমান বিধান
নাকের ড্রপ	চুখ ও কানের ড্রপের সমান বিধান	সমান বিধান	সমান বিধান
ঋতুস্রাব	রোজা অবস্থায় হাইদ্ব (নিয়মিত ঋতুস্রাব) শুরু হলে	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	স্বাভাবিক ভাবে পানাহার করবে এবং ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	রোজা অবস্থায় ইস্তিহাদ্বা (অনিয়মিত বা অস্বাভাবিক স্রাব) শুরু হলে (নিয়মিত স্রাব হচ্ছেঃ হানাফী মতে ৩-১০ দিন (কমপক্ষে ২ সপ্তাহ পরপর) আর মালিকী মতে ০-১৫ দিন এবং শাফিয়ী মতে ১-১৫ দিন। এ ছাড়া অন্য স্রাব হচ্ছে ইস্তিহাদ্বা বা অস্বাভাবিক স্রাব)	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে। (এ অবস্থায় নিয়মিত সালাত আদায় করবে, রোজা রাখবে এবং স্বামী সহবাস করতে পারবে)
রক্ত	শরীরের বাইরের অংশ থেকে রক্ত বের হলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে অতি দুর্বল হয়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দিলে	রোজা ভেঙ্গে ফেলবে	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
	মুখের ভিতর থেকে রক্ত বের হয়ে গলার ভিতর না গেলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	মুখের ভিতর থেকে রক্ত বের হয়ে গলার ভিতরে চলে গেলে কারো মতে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে আর কারো মতে হবে না	দ্বিমত রয়েছে	রোজা অব্যাহত রাখবে /ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
বমি	অনিচ্ছাকৃত বমি হলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	ইচ্ছাকৃত বমি করলে	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
দাঁত মাজন	মিছওয়াক, টুথপেস্ট, মাজন বা ছাই দিয়ে দাঁত মাজলে ওইসব দ্রব্য যদি গলার ভিতরে না যায়	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	ওইসব দ্রব্য যদি গলার ভিতরে চলে যায়	রোজা নষ্ট হয়ে যাবে	ওই রোজা পরে পূর্ণ করবে
রূপ চর্চা	সাবান, শাওয়ার বা বাথ লিকুইড অথবা শ্যাম্পু/কন্ডিশনার দিয়ে গোসল করলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে
	তেল, ক্রিম, ভ্যাসলিন বা লোসন ব্যবহার করলে	**রোজা নষ্ট হবে না**	রোজা অব্যাহত রাখবে
	মেকআপ, লিপিষ্টিক বা এ জাতীয় কিছু ব্যবহার করলে	রোজা নষ্ট হবে না	রোজা অব্যাহত রাখবে।

৩য় পাঠঃ সুহূর ও ইফতার

সুহূর পরিচিতিঃ মূল আরবী শব্দ "সাহার" রাতের শেষ অংশ। সে মতে রাতের শেষ প্রহরের পানাহারকে বলা হয় "সুহূর" আর আমাদের সমাজে উর্দু/ফার্সির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় "সেহরি"। সিয়ামের জন্য সুহূর করা বা সেহরি খাওয়া আবশ্যক নয় তবে উত্তম। সুহুর নবী সা.র সুন্নাহ। নবী সা. নিজে সুহূর করতেন এবং আমাদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। বর্ণিত আছে..

عن أنس قال :قال رسول الله ﷺتسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ তোমরা সুহূর খাও। কারণ অবশ্যই তাতে বারাকাহ বিদ্যমান। (বুখারী ও মুসলিম)
উল্লেখ্য সুহূর নির্ধারিত কোনো খাবারের নাম নয়। মানুষ তার অভ্যাস ও চাহিদা মত শেষরাতে যে খাবার গ্রহণ করবে এটাই সুহূর।

বিঃ দ্রঃ = উপরে উল্লেখিত হাদীছটি অনেক মজবুত এবং হাদীছে বর্ণিত শব্দটি আদেশসূচক কিন্তু তবুও সুহূর বা শেষরাতের খাবার ফরজ বা ওয়াজিব হয়নি এবং এ ব্যাপারে সকল ইমামগণ একমত, কোনো ইমামই সুহূরকে ফরজ বলেননি। কারণ নবী সা. কিছু বললেই ফরজ বা হারাম হয়ে যায় না। ফরজ বা হারাম হতে হলে আরো অনেক নিয়মনীতি রয়েছে। নবী সা. উত্তম বুঝানোর জন্য বা বৈধ বুঝানোর জন্য অথবা অন্য কারণেও অনেক কথা বলেছেন। এমনকি পবিত্র কুরআনেও অনেক আয়াত এমন আছে যাতে আদেশসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু বিষয়টি ফরজ হয়নি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে আমাদের এ কোর্সের সূচনাতে "ফরজ অধ্যায়টি" দেখে নিন।

সুহূরের সময়ঃ মধ্যরাতের পর থেকে ফরজের সূচনা সময় পর্যন্ত সুহূর খাওয়ার সময়। বর্ণিত হচ্ছে..

عَنْ عبدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺقَالَ :لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেনঃ (শুনো!) বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সুহূর থেকে বিরত রাখতে না পারে। কারণ তোমাদের যারা ইবাদাতে মশগুল থাকো তাদেরকে (সকালের আগমনের ব্যাপারে) সাবধান করতে আর ঘুমন্তদের জাগ্রত করতে সে রাতে আযান দেয়। তার আযান মানে এই নয় যে ফজর হয়েগেছে বা সকাল হয়েগেছে। (বুখারীঃ ৬২১)

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺأَنَّهُ قَالَ :إِنَّ بِلاَلًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেনঃ বিলাল রাতে আযান দেয় সুতরাং উম্মু মাকতূমের ছেলে আযান দেওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করবে। (বুখারীঃ ৮২২)

উল্লেখ্য রাসূল সা.র সময়ে ঘড়ি ছিল না। তাই পূর্ব আকাশ ফর্শা হয়ে সুবহে সাদিক উন্মুক্ত ভাবে ফুটে উঠলে তখন আযান দেওয়া হত। এ ছাড়াও উম্মু মাকতূমের ছেলে আব্দুল্লাহ অন্ধ ছিলেন। তিনি দেখতে পেতেন না। অন্যরা যখন উনাকে বলতঃ "সকাল হয়েগেছে, আযান দেন" তখন উনি আযান দিতেন।

আযান শুরু হলেও হাতের খাবার ফেলতে হবে না বরং খেয়ে নিতে পারবে। বর্ণিত হচ্ছে..

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ .رواه أحمد (10251)وأبو داود (2350)وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ তোমরা যখন (ফজরের) আযান শুনবে তখন খাবারের পাত্র হাতে থাকলে এটা রেখে দেবে না বরং প্রয়োজন পূর্ণ করে (খেয়ে) ফেলবে। (আহমাদঃ ১০২৫১, আবু-দাউদঃ ২৩৫০, শাইখ আলবানীর তাহকীক মতেও হাদীছটি সাহীহ)
হুঁশিয়ারিঃ পবিত্র কুরআনে সূরাহ বাক্বারাহর ১৮৭ তম আয়াতেও বলা হয়েছে ফজরের সাদা রং ফুটে উঠা পর্যন্ত পানাহার করা যাবে। কিন্তু অত্যান্ত দুঃখের শিত বলতে হচ্ছে আমাদের সমাজে অনেক ক্যালেন্ডারে ফজরের ১০ মিনিট আগে "সেহরির শেষ সময়" নির্ধারণ করে দেওয়া হয় এবং মাইকে ঘোষণা করা হয় "ফজরের আর মাত্র ১০ মিনিট বাকী আছে, খানা পিনা বন্ধ করুন"। আসলে এমন না করে যদি লিখে দেওয়া হত "সতর্কতার জন্য ফজরের ১০ মিনিট আগে পানাহার বন্ধ করা উচিত" তবে উত্তম হত।

ইফতার পরিচিতিঃ মূল শব্দ "ফাত্বারা" অর্থ ভেঙ্গে ফেলা। এর থেকে সকালের নাস্তাকে বলা হয় "ফুত্বূর" অর্থ আজকের উপবাস ভেঙ্গে ফেলা। এমন অর্থ বুঝাতে ইংলিশেও বলা হয় "ব্রেকফাস্ট" মানে আজকের উপবাস ভেঙ্গে ফেলা। আর এর থেকেই বলা হয় "ইফত্বার" মানে সাওম বা রোজা ভেঙ্গে ফেলা।
সারাদিন সিয়াম সাধনের পর যখন সূর্য অস্ত যায় তখন সাওম ভঙ্গ করতে যে খাদ্য আহার বা পানীয় গ্রহণ করা হয় এরই নাম "ইফত্বার"। ইফতার নির্ধারিত কোনো খাবারের নাম নয়। মানুষ তার অভ্যাস ও চাহিদা মত যে খাবার গ্রহণ করে সাওম ভঙ্গ করবে এটাই তার ইফতার। তবে ইফতারে সর্বপ্রথম খেজুর বা পানী গ্রহণ করা উত্তম। এ ব্যাপারে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আর ইফতারে দেরী না করে সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইফতার করে নেওয়া উচিত। ইফতারে দেরী করা নিন্দনীয় কাজ। বর্ণিত হচ্ছে..

عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ أَنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺقَالَ :لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجلوا الفطرَ. متفقٌ عَلَيْهِ.

সাহল বিন সা'দ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ মানুষ ততদিন "খাইর" (কল্যাণ বা ইসলাম) এর উপর বিদ্যমান থাকবে যতদিন তারা ইফতারে তাড়াতাড়ি ইফতার করবে। (বুখারী ও মুসলিম)
হুঁশিয়ারিঃ কিন্তু দুঃখের বিষয় এতো মজবুত হাদীছ বিদ্যমান থাকা সত্বেও আমাদের সমাজের অনেক ক্যালেন্ডারেও সূর্যাস্তের ৫-১০ মিনিট পরে ইফতারের সময় লিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ইফতারে দেরী করে নবী সা.র হাদীছ ও সুন্নাহকে অবজ্ঞা করে সমাজ ও জাতিকে অকল্যাণের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়।

ইফতারের দোয়াঃ যে খাবার বা পানীয় দ্বারা সিয়াম ভঙ্গ করা হয় এরই নাম ইফতার। ইফতার স্বাভাবিক খাবারের মতই। তাই অন্যান্য খাবারের মত বিসমিল্লাহ বলে ইফতার শুরু করতে হয় এবং ইফতারের পর আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং ছাওয়াবের আশা ব্যক্ত করে রাসূল সা. বলতেন..

عن ابن عمر قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال :ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله

ইবন উ'মার রা. বলেনঃ রাসূল সা. যখন ইফতার করতেন তখন বলতেনঃ তৃষ্ণা নিবারণ হয়েগেছে, রগসমূহ স্তেজ হয়ে গেছে এবং ছাওয়াবও অক্ষারিত হয়ে গেছে, ইন শা-আল্লাহ। (আবু-দাউদঃ হাসান)
বিঃ দ্রঃ = ইফতারের দোয়া হিসেবে আমাদের সমাজে আরো একটি দোয়া প্রচলিত আছে আর তা হলঃ "আল্লাহুমা লাকা সুমতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া আলা রিযকিরা ইফতারতু"। কিন্তু এ হাদিছটি সাহীহ নয়, মানে নবী সাঃ থেকে সঠিক ভাবে প্রমানিত নয়। তাই এটি সুন্নত হবে না।

৪র্থ পাঠঃ ই'তিকাফ ও লাইলাতু-ল-ক্বাদর

ই'তিকাফ পরিচিতিঃ ই'তিকাফ অর্থ অবস্থান করা। ছাওয়াবের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলা হয় আর যে ব্যক্তি ই'তিকাফ করে তাকে বলা হয় "মু'তাকিফ"। ইসলামে ই'তিকাফের বৈধতা এবং বিধান সম্পর্কে কিছু ধারণা আমরা পবিত্র কুরআন থেকেই পেয়েছি। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ	আর মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় নারী গমন করবে না। (২ বাক্বারাহঃ ১৮৭)

উল্লেখ্য উক্ত আয়াতে দুটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা..

- ই'তিকাফকে ইবাদাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে
- ই'তিকাফরত অবস্থায় নারীগমন তথা যৌন সঙ্গমকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ই'তিকাফের সময় ও দিনঃ ই'তিকাফের নির্ধারিত কোনো সময় বা দিন নেই এবং ই'তিকাফকালের নির্ধারিত কোনো পরিমাণও নেই। যার যতটুকু সময় ইচ্ছা যে কোনো সময় এবং যে কোনো দিন ই'তিকাফ করতে পারবে। তবে রামাদ্বান মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা নবী সা.র একটি বিশেষ সুন্নাহ। বর্ণিত হচ্ছে..

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما **قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ**

ইবন উ'মার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল সা. রামাদ্বানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ই'তিকাফের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় আল্লাহর ঘরে অবস্থান নেওয়া এবং যাবতীয় পাপ ও পাপাচার থেকে বিরত থেকে একমাত্র আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া ই'তিকাফের অন্যতম লক্ষ্য। বর্ণিত হচ্ছে..

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْمُعْتَكَفِ: هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا . رَوَاهُ ابْن مَاجَه

ইবন আ'ব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, মু'তাকিফ সম্পর্কে রাসূল সা. বলেছেনঃ সে আসলে সমুদয় পাপ থেকে ই'তিকাফ (দূরে অবস্থান) করে থাকে এবং (সে ই'তিকাফরত অবস্থায়) লোকেরা যত নেককাজ করে তাকে এর সমপরিমাণ ছাওয়াব দেওয়া হয়। (ইবনু মাজা)

কে ই'তিকাফ করবেঃ ই'তিকাফ পুরুষ ও নারী সকলের জন্য। পুরুষ নারী সবাই ই'তিকাফ করতে পারবে। বর্ণিত হচ্ছে..

عن عائشة رضي الله عنها **:أن رسول الله** صلى الله عليه وسلم **كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله عز وجل ، ثم اعتكف أزواجه بعده**

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. রামাদ্বানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন এবং তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এমন করেছেন। আর তার স্ত্রীগণও ই'তিকাফ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألبر ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال

আ'ইশাহ রা. বলেনঃ রাসূল সা. রামাদ্বানের শেষদশকে ই'তিকাফ করতেন আর আমি (মসজিদে) উনার জন্য তাবু বসাতাম। ফজরের সালাতের পর তিনি তাবুতে অবস্থান নিতেন। একদা (আ'ইশাহ রা. রাসূল সা.র জন্য এবং নিজের জন্য তাবু বসানোর পর) হাফস্বাহ রা. (ই'তিকাফের অনুমতির এনে দিয়ে) উনার জন্য তাবু বসাতে আ'ইশাহ রা.কে অনুরোধ করলেন। (আ'ইশাহ রা. বলেন) আমি হাফস্বার জন্য অনুমতি এনে দিলাম এবং তাবু বসিয়ে দিলাম। (হাফস্বার তাবু দেখার পর রাসূলের আরেক স্ত্রী) যাইনাব বিনত জাহাশ (রাসূলের অনুমতি না নিয়েই নিজের জন্য) আরেকটি তাবু বসিয়ে নিল। (এসব কিছু হল ২০ রামাদ্বান রাতে) সকালে এতোগুলো তাবু দেখে রাসূল সা. জিজ্ঞেস করলেনঃ "এসব কী"? তখন রাসূল সা.কে সবকিছু জানানো হলে তিনি বললেনঃ "এদের অবস্থা দেখো! নেকী নিয়েও কেমন করছে"। তিনি এ মাসে ই'তিকাফ ছেড়ে দিলেন এবং শাওয়্যাল মাসে ১০দিন ই'তিকাফ করলেন। (বুখারী)

ই'তিকাফরত অবস্থায় করনীয়ঃ ই'তিকাফরত অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করতে হবে। একান্ত প্রয়োজন না হলে কোনো প্রকার ইবাদাত, সামাজিক, পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কাজের জন্য মসজিদ থেকে বের হবে না। বর্ণিত হচ্ছে..

وعنها قالت :السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلاّ في مسجد جامع (رواه أبو داود

আ'ইশাহ রা. বলেনঃ ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নাহ (নিয়ম) হচ্ছে সে..

- রোগী দেখতে যাবে না
- জানাযায় শরীক হবে না
- নারী স্পর্শ করবে না
- যৌন মিলন করবে না
- একান্ত প্রয়োজন (খাদ্য, পানীয়, পবিত্রা অর্জন, পেশাব-পায়খানা, ইত্যাদি) ছাড়া মসজিদ থেকে বের হবে না
- সাওম (রোজা) ছাড়া ই'তিকাফ হবে না
- জামে মসজিদ ছাড়া (অন্য মসজিদে বা ঘরে) ই'তিকাফ হবে না। (আবু-দাউদ। হাদীছের সনদে সমস্যা নেই)

কোথায় ই'তিকাফ করতে হবেঃ উপরের হাদীছ থেকে এবং রাসূল সা. ও সাহাবাদের আমল থেকে জানা যায় ই'তিকাফ শুধু জামে মসজিদেই করতে হয়। জামে মসজিদ ব্যতীত অন্য মসজিদে বা ঘরে ই'তিকাফ হবে না।

বিঃ দ্রঃ = নিরাপত্তা জনিত সমস্যার কারণে মহিলারা বাড়ির মসজিদে (মাসজিদ বাইতিহা) ই'তিকাফ করতে পারবে বলে মন্তব্য করেছেন ইমাম আবু-হানীফাহ রাহি.। আর এ কথাটিকে ব্যবহার করে কেউ কেউ মহিলাদের জন্য ঘরের এক কক্ষে ই'তিকাফ করার বৈধতা দিয়ে থাকেন। আসলে বিষয়টি সরাসরি উল্লেখিত হাদীছের বিপরীতে চলে যায়।

লাইলাতুল ক্বাদরঃ লাইলাতু-ল-ক্বাদর অর্থ মহিমান্বিত রাত, ভাগ্য রজনী। রামাদ্বান মাসের এক রাতে কুরআন অবতরণ শুরু হয়েছে। প্রতি বছর এ রাতে মহান আল্লাহর আদেশ নিয়ে জিবরাঈল আ.সহ ফিরিস্তাগণ পৃথিবিতে নেমে আসেন। মহান আল্লাহ তায়া'লা এ রাতকে লাইলাতু-ল-ক্বাদর হিসেবে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)

নিশ্চয় আমি এ কুরআন নাযিল করেছি "লাইলাতু-ল-ক্বাদরে" (শবে ক্বদরে, কদরের রাতে) তুমি কী জানো "লাইলাতু-ল-ক্বাদর" কি? "লাইলাতু-ল-ক্বাদর" হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ রাতে আল্লাহর অনুমোদনক্রমে ফিরিস্তাগণ এবং রূহ (জিবরাঈল) বিশেষ কাজ নিয়ে (দুনিয়ায়) নেমে আসে। এ শান্তি ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত (বিস্তৃত থাকে। ৮৭ আল-ক্বাদর)

লাইলাতু-ল-ক্বাদরে দুনিয়ার জন্য ১বছরের কর্মতালিকা আকাশ থেকে দুনিয়ায় কর্মরত ফিরিস্তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5)

নিশ্চয় আমরা এ কুরআন নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে (লাইলাতু-ল-ক্বাদরে।) নিশ্চয় আমরা (এ কিতাবের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে পাপের পরিণতি সম্পর্কে) সাবধান করে দিচ্ছি। আর (যে রাতে এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে) সেই রাতেই আমার আদেশে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলাদা (যমীনের ফিরিস্তার কাছে হস্তান্তর) করা হয়। নিশ্চয় আমি-ই প্রেরণ করে থাকি। (কেউ কেউ মনে করেন এ বরকতময় রাত হল শবে বরাত। এমন মনে করা ভুল। আসলে এ রাত হল শবে কদর। দেখুন সূরাহ আল-ক্বাদর।) (৪৪ দুখানঃ ৩-৫)

লাইলাতু-ল-ক্বাদরে করণীয়ঃ লাইলাতু-ল-ক্বাদর এ উম্মতের জন্য মহান আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত। এ রাতে আমাদেরকে বোনাস হিসেবে এক হাজার মাসের চেয়ে বেশী ছাওয়াব দান করা হয়। তাই আমাদের জন্য উত্তম হলো এ রাতে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে আল্লাহর ইবাদাত ও দোয়া করা। হাদীছে বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيماناً واحتسابا غفر لله ما تقدم من ذنبه

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে লাইলাতু-ল-ক্বাদরে ক্বিয়াম করবে তার আগেকার সমুদয় পাপ মাফ করে দেওয়া হবে। (বুখারীঃ ৩৫, মুসলিমঃ ৭৬০)

عن عائشة رضى الله عنها قالت :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ :قُولِي :اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

আ'ইশাহ রা. বলেনঃ একদা আমি জিজ্ঞেস করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কী মনে করেন? যদি আমি লাইলাতু-ল-ক্বাদর পেয়ে যাই তখন আমি কী বলব? তিনি বললেনঃ বলবে "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আ'ফুয়্যুন, তুহি'ব্বু-ল-আ'ফওয়া, ফা'ফু আ'ন্না"- (হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করতে পছন্দ কর সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও।) (ইবনু-ল-কাইয়্যুম। হাদীছটি সাহীহ)

লাইলাতু-ল-ক্বাদর কোন রাতঃ লাইলাতু-ল-ক্বাদর তা আমাদেরকে নির্ধারণ করে বলা হয়নি। তবে এই মর্মে ধারণা দেওয়া হয়েছে যে এটা হবে রামাদ্বান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাতে। বর্ণিত হচ্ছে..

عن عائشة رضي الله عنها عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال :تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ في الوِتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেনঃ তোমরা রামাদ্বান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতু-ল-ক্বাদরের সন্ধান করবে। (বুখারী)

২য় সেমিষ্টার **৪র্থ দিন**

ঈমান ও মুঅমিন

১ম পাঠঃ ঈমান ও মুঅমিন

আখেরাতে মুক্তির জন্য শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহন করা বা মুসলিম হওয়াই যথেষ্ট নয়। কারন মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও মুনাফিক ধরনের লোকগুলো চির জাহান্নামী হবে। আসলে আখেরাতে মুক্তির একমাত্র সনদ ঈমান। শুধুমাত্র মুঅমিন ও মুত্তাক্বী লোকেরাই আখেরাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে আর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

ঈমান ও মুঅমিন পরিচিতিঃ ঈমান অর্থ অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস। যে ব্যক্তি ঈমান আনে তাকে মুঅমিন বলা হয়। জান্নাতে যেতে হলে শুধু ইসলাম গ্রহন করাই যথেষ্ট নয় বরং অবশ্যই ঈমানের অধিকারী হতে হবে। ঈমান আখেরাতে মুক্তির সনদ, ঈমান আমল কবুলের পূর্বশর্ত। জান্নাতে জেতে হলে অবশ্যই পরিপূর্নভাবে ঈমান আনতে হবে এবং ঈমানের সহিত নেক-কাজ করতে হবে। মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ আর যে ব্যক্তি আখেরাত কামনা করে এবং এজন্য কাজ করে সে যদি মুঅমিন হয়ে থাকে তবে তার এ কাজ ফলপ্রসু হবে। (ইসরাঃ ১৯)

ঈমান আনতে হলে ৩টি কাজ করতে হয়। যথা..

- ঈমানের সকল বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয় এবং ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান নোইতিক ও আদর্শিকভাবে মেনে নিতে হয়। (আর এটা-ই ঈমানের মূল বিষয়। বিশ্বাসে বা নীতি আদর্শে নড়বড়ে হলে ঈমান হয় না বরং এটাকে কুফর বলা হয়।)
- ঈমানের ঘোষণা দেওয়া (এটা ঈমানের সামাজিক দিক। ঘোষণা না দিয়ে নিজের ঈমানকে গোপন রাখলেও ঈমান হয়ে যায়। দেখুন সূরাহ গাফিরঃ ২৮)
- বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হয়। (বাস্তব জীবনে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে না পারলে ঈমান দুর্বল হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি এমন করে সে আর মুঅমিন তথা ঈমানদার থাকে না বরং ফাসিক হয়ে যায় এবং তাঁর আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যায়।)

মুঅমিন হওয়ার পূর্বশর্তঃ মুঅমিন হতে হলে পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেন..

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

না..। তোমার প্রভুর কসম! তারা মুঅমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের যাবতীয় বিষয় মীমাংসার জন্য তোমার কাছে আসবে, তোমার ফয়সালা বিনা দ্বিধায় মেনে চলবে এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে। (৪ নিসাঃ ৬৫)

জ্ঞাতব্যঃ এখানে মুঅমিন হবার জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এ তিন শর্তের যে কোনো একটি পরিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করতে না পারলে কোনো ব্যক্তি মুঅমিন হতে পারবে না। শর্ত ৩টি হচ্ছে..

- জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে রাসূল সাঃর তথা ইসলামী বিধানের শরণাপন্ন হওয়া।
- রাসূলের ফয়সালা তথা ইসলামী বিধান বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া।
- আল্লাহর (বিধান ও রাসূল সাঃর আদর্শের) কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা।

উল্লেখ্য মুঅমিন হতে হলে আমাদেরকে..

- প্রথমে কুফর শিরক পরিত্যাগ করতে হবে (আর এটাকে বলা হয় কুফর শিরক থেকে ফিরে আসা তথা তাওবাহ করা)
- তারপর সকল প্রকার ত্বাগূ'তকে বর্জন করতে হবে (এর নাম ত্বাগূ'ত বর্জন)
- তারপর সঠিকভাবে ঈমান আনতে হবে। (এটাকে বলা হয় ঈমান গ্রহণ)
- তারপর মনের গভীরে ঈমানকে স্থাপন করতে হবে এবং ঈমানের উপর অবিচল থাকতে হবে। (আর এটা হল ইস্তিক্বামত তথা ঈমানের উপর অবিচল থাকা)
- শুধু মুখে মুখে ঈমান আনলে মুঅমিন হওয়া যায় না।

আত্মসমর্পণ পরিচিতিঃ নিজের জীবনে সবকিছু আল্লাহর কাছে সপে দেওয়া এবং বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে চলাকে নিজের উপর অবধারিত করার নাম আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163)

(হে নবী!) বলে দাওঃ আমার সালাত, আমার সাধনা, আমার জীবন, আমার মরণ (তথা আমার জীবনের সবকিছু একমাত্র) রাব্বু-ল-আ'লামীন আল্লাহর জন্য, যার কোনো শরীক নেই আর আমাকে এমন আদেশই দেয়া হয়েছে। আমিই প্রথম আত্মসমর্পণকারী। (আনয়ামঃ ১৬২-১৬৩)

জ্ঞাতব্যঃ আপনি আপনার সবকিছু আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে পারলে-ই কেবল মুসলিম হিসেবে দাবী করতে পারেন।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

আল্লাহ বা রাসূল কোনো সিদ্ধান্ত করে ফেললে (এ ব্যাপারে) মুঅমিন পুরুষ বা নারী কারো কোনো এখতিয়ার থাকে না। (বরং সবাইকে এটা মেনে নিতে হয় এবং মেনে চলতে হয়। আল্লাহ্ বা রাসূলের কোনো সিদ্ধান্ত অমান্য করা অবাধ্যতা হিসেবে গণ্য হয়) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়ে গেল সে চরম ভাবে বিভ্রান্ত হয়ে গেল। (৩৩ আহযাবঃ ৩৬)

ইসলামের মূল বিষয়ই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ আর আত্মসমর্পণের বিষয়টিকে ভালোভাবে বুঝার জন্য এখানে আমার স্বরচিত একটি কবিতা যুক্ত করা হল..

আত্মসমর্পণ

আল্লাহ আমার একক ইলাহ
আল্লাহ আমার রব,
মুসলিম আমি, সপে দিয়েছি
আল্লাহর কাছে সব।

আমার চিন্তা আমার চেতনা
আমার মুখের কথা,
ইবাদাত সব আরাধনা আর
সুখ আছে যত ব্যথা,

আমার জীবন আমার মরণ
যত পথে যত চলা,
সংগ্রাম আমার সাধনা আমার
যত কথা যত বলা,

সব-ই আমার প্রভুর তরে
প্রভু যাতে খুশি রয়,
প্রভুর পথের সিপাহি আমি
কাউকে করিনা ভয়।

প্রভুর কথা-ই আমার কথা
প্রভুর মতে-ই মত,
আমি দাস তিনি মালিক আমার
তাঁর পথ-ই আমার পথ।

তাঁর ইশারাতে জীবনের সব
দিতে পারি কুরবান,
তাঁর তরে মোর জীবন মরণ
তিনি যে মেহেরবান।।

ঈমান আনার পর মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অবিচল থাকতে এবং ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি এবং পাপাচার থেকে বেচে থাকতে হয়। উল্লেখ্য ঈমান বিনষ্টকারী কোনো কাজে জড়িয়ে পড়লে ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং সকল ইবাদাত ও আ'মাল নস্যাত ও বরবাদ হয়ে যায়। তখন ওই ব্যক্তি আর মুঅমিন থাকে না। বরং মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামি হয়ে যায়। আর কবীরাহ গোনাহ করলে তথা পাপাচারে জড়িয়ে পড়লে ঈমান দুর্বল হয়ে যায় আর ওই ব্যক্তি ফাসিক হয়ে যায়, তখন তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যায়।

২য় পাঠঃ ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহঃ

উল্লেখ্য ঈমানের মৌলিক বিষয় ৬টি। যথা..

১. আল্লাহর উপর ঈমান
২. ফিরিস্তাগণের উপর ঈমান
৩. আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের উপর ঈমান
৪. আল্লাহর পাঠানো রাসূলগণের উপর ঈমান
৫. ভালোমন্দ তাক্বদীরের উপর ঈমান
৬. কিয়ামত, পুনরুত্থান ও আখেরাতের উপর ঈমান।

সূত্রঃ হাদীছ জিবরাঈল নামে খ্যাত এক সুদীর্ঘ হাদীছে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে রাসূল সা. ঈমানের এ ৬টি মৌলিক বিষয় উল্লেখ করেছেন।

বিঃ দ্রঃ = ঈমানের ৬টি মৌলিক বিষয় এবং এসবের উপর ঈমান আনার পদ্ধতি নিয়ে যথাযথ দলীলসহ আলাদা একটি বই আমরা রচনা করেছি এবং "ইসলাম শিক্ষা কোর্স" নামে আমাদের ঈমান আক্বীদাহ সিলেবাসের ৩য় বই হিসেবে বইটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছি। বইটির নাম "যেভাবে ঈমান আনতে হয়"। নিজের ঈমান আক্বীদাহকে সঠিক ও সুদৃঢ় করার জন্য বইটি অধ্যয়নের আহ্বান রইল।
আমাদের এখনকার কোর্সটি যেহেতু শারীয়া'হ তথা বিধানগত কোর্স। তাই ঈমান ও আক্বীদাহগত বিষয়গুলো এখানে খুব কমই উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমান ও আক্বীদাহ বিষয়ে স্ববিস্তারে জানতে হলে আমাদের "ইসলাম শিক্ষা কোর্স" অধ্যয়ন করতে হবে। তবে আপনাদের মনে ক্রিয়ে দেওয়ার জন্য ঈমানের ৬টি মোউলিক বিষয় অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল..

১. আল্লাহর উপর ঈমানঃ আল্লাহর উপর ঈমানের মূল কথা হচ্ছেঃ মহান আল্লাহর জাতিসত্তা ও সকল বৈশিষ্টে আল্লাহকে একক সত্বা হিসেবে মেনে নেওয়া তথা আল্লাহর তাওহীদে (একত্ববাদে) বিশ্বাস করা। আর এ বিশ্বাসের পদ্ধতি হচ্ছে সাহাবাদের পদ্ধতি। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারাহর ১৩৭ তম আয়াতে।
আল্লাহর জাতিসত্তা অথবা কোনো বৈশিষ্টে অন্যকে আল্লাহর শরীক বা সমকক্ষ বানালে শিরক হয়। শিরক সবচেয়ে জঘন্যতম মহাপাপ। শিরক অমার্জনীয় অপরাধ। শিরক করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ যুমার এর ৬৫তম আয়াতে। আর সুরাহ নিসার ৪৮ তম আয়াতে বলা হয়েছেঃ যে ব্যক্তি শিরক করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। তবুও শিরক থেমে নেই। আমাদের সমাজে নানা ভাবে শিরক করা হয়। আর শয়তান জানে যে শিরক করলে আর ক্ষমার সম্ভাবনা থাকে না। তাই সে ছলে বলে কৌশলে মানুষকে দিয়ে শিরক করাতে চায় আর শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মানুষও নানা ভাবে শিরকে জড়িয়ে পড়ে। যেমন..

শিরক পরিচিতিঃ শিরক অর্থ শরীক করা, অংশীদার বানানো। মহান আল্লাহ তার জাতিসত্বা এবং যাবতীয় বৈশিষ্ট্যে এক ও অদ্বিতীয়; এটা হল তাওহীদ। আর তাওহীদের বিপরীত হল শিরক। অর্থাৎ মহান আল্লাহর সাতিসত্বা বা কোনো বৈশিষ্ট্যে অন্যকে আল্লাহর সমান, সমকক্ষ বা অংশীদার বানানো হল শিরক। যেমন..

- আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে, পরিবার আছে বা সাহায্যকারী আছে বলে বিশ্বাস করা। এসব হল আল্লাহর জাতিসত্বায় শিরক
- আল্লাহ ছাড়া অন্যকাউকে সার্বভৌমত্বের মালিক, ক্ষমতার উৎস বা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী মনে করা। এসব হল আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক।
- আল্লাহর ইবাদাত করতে যা করা হয় অন্যকাউকে বা অন্যকিছুকে সম্মান জানাতে গিয়ে এমন কিছু করা। এটা হল আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শিরক।
- আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে নীতিনির্ধারক বা কর্তৃত্বশীল মনে করা। এটা হল আল্লাহর হাকিমিয়্যাতে শিরক।
- আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্যের বিধান মেনে নেওয়া। এটা হল আল্লাহর বুরুবিয়্যাতে শিরক। ইত্যাদি।

উল্লেখিত কাজ সমূহ হচ্ছে বড় শিরক। এমন শিরকে জড়ালে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। এবং কোনো মুসলিম এমন কাজ করলে আখেরাতে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত তার জন্য হারাম হয়ে যায়। সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।
আর আল্লাহর ছাড়া অন্যের নামে কসম করা। অন্যকে খুশী করার জন্য বা অন্যের অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ইবাদাত করা। ইত্যাদি হল ছোট শিরক।

২. ফিরিস্তাগণের উপর ঈমানের মূল কথা হচ্ছেঃ ফিরিস্তা নূরের তৈরি, ফিরিস্তা চিরতরে আল্লাহর অনুগত ও বাধ্য জাতি। সব ফিরিস্তাই ভালো, সৎ ও উত্তম। কোনো ফিরিস্তাই মন্দ নয় এবং তারা কেউ কখনো মন্দকাজ করেনি।

৩. আল্লাহর কিতাবসমূহের উপর ঈমানের মূল কথা হচ্ছেঃ আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত বিধানকে বাস্তব জীবনের একমাত্র অনুকরণীয় বিধান হিসেবে মেনে নেওয়া এবং মেনে চলা। বাস্তব জীবনের কোনো ক্ষেত্রে বা কোনো বিষয়ে এর ব্যতিক্রম করলে কুফর হয়। আর কুফর করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। যে কথা বলা হয়েছে সুরাহ মাইদাহর ৫ম আয়াতে।

৪. রাসূলগণের উপর ঈমানের মূল কথা হচ্ছেঃ বাস্তব জিবনে রাসূলের আদর্শকে অনুকরণ করা, সামাজিক ও রাজনৈতিকসহ জীবনের সকল বিষয়ে রাসূলের অনুগত থাকা এবং রাসূলের আদর্শ বহির্ভূত সকল নীতি, আদর্শ, দর্শন ও তরীকাকে বিসর্জন দেওয়া। নতুবা কুফরে জড়িয়ে ঈমান হারা হতে হবে।

৫. তাক্বদীরের উপর ঈমানঃ তাক্বদীর আরবী শব্দ। তাক্বদীর অর্থ নির্ধারণ করা। কারো জন্য কনোকিছু নির্ধারণ করে দেওয়াকে তাক্বদীর বলা হয়। মহান আল্লাহ সৃষ্টির সুচনাতেই সৃষ্টিকুলের জন্য সবকিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন। সৃষ্টিকুলের জন্য মহান আল্লাহর নির্ধারণ বিষয়সমূহকেই তাক্বদীর বলা হয়।

আমাদের আরো একটি ফরজ দায়িত্বসমূহের মাঝে অন্যতম একটি হচ্ছে তাক্বদীদের উপর ঈমান আনা এবং তাক্বদীর মেনে নেওয়া। এটা হচ্ছে ঈমানের ৬টি মূলনীতির ৫ম মূলনীতি। মহান আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেন..

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ	আমরা সবকিছুকেই "ক্বাদার" (তাক্বদীর) দিয়ে সৃজন করেছি। (ক্বামারঃ ৪৯)

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً	আল্লাহই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের তাক্বদীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (ফুরক্বানঃ ২)

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)

..আল্লাহ তার সিদ্ধান্ত অবশ্যই পরিপূর্ণ করে থাকেন। আল্লাহ অবশ্যই সবকিছুর তাক্বদীর নির্ধারিত করে রেখেছেন। (৬৫ ত্বালাক্বঃ ৩)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ তাক্বদীর মহান আল্লাহর এক গোপন রহস্য। তাক্বদীরের উপর ঈমান (অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস) রাখা ফরজ এবং ঈমানের ৬টি মূলনীতির মাঝে ৫ম নম্বরে হচ্ছে তাক্বদীরের উপর ঈমান রাখা।

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে..

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (23)

পৃথিবীতে যত বিপর্যয় ঘটে এবং তোমাদের জীবনে যত মুসীবত আসে; এসব সংগঠিত হবার আগে-ই আমরা কিতাবে (লাউহে মাহফূজে) লিখে রেখেছি (আর এটা-ই তাক্বদীর।) এটা আল্লাহর জন্য অতি সহজ কাজ। (তাক্বদীরের রহস্য ও উপকারিতা হলো) যেন কিছু হারিয়ে গেলে তোমরা হতাশ হয়ে না পড়ো আর কিছু পেয়ে গেলে অতি উল্লাসিত না হও। (কারণ অতি উচ্ছাস ও উল্লাস অহমিকার জন্ম দেয়। আর) আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (৫৭ হাদীদঃ ২২-২৩)

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (38)	...আল্লাহর সকল বিষয়ের তাক্বদীর আগ থেকেই নির্ধারণ করা থাকে। (৩৩/৩৮)

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (61)

(হে আমার বান্দা!) তুমি যে অবস্থায়-ই থাক, কুরআনের যেখান থেকেই তিলাওয়াত কর আর তোমরা যে যখন যে কোনো কাজ কর, প্রতিটি পদক্ষেপে-ই আমরা (আল্লাহ ও ফিরিস্তাগণ) তোমাদের সঙ্গে থাকি /সাক্ষী থাকি। আসমান বা যমীনে অণু পরিমান অথবা এরচেয়ে বড় বা ছোট কোনোকিছু-ই তোমার প্রভু থেকে গোপন থাকে না বরং সবকিছু সুস্পষ্ট ভাবে কিতাবে (লাউহে মাহফুজে) লিপিবদ্ধ রয়েছে। (আর এর-ই নাম তাক্বদীর। সুতরাং নেককাজ করে ঘোষণা দিতে হবে না আর পাপ করে কেউ গোপন করতে পারবে না) (১০ ইউনুসঃ ৬১)

প্রাসঙ্গিক কথাঃ তাক্বদীর সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীছও বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টিকে সহজভাবে বুঝার জন্য এমন কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করা হল..

قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة

আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর আগেই আল্লাহ (সু. তা.) সবকিছুর তাক্বদীর নির্ধারণ করে রেখেছেন। (ইবনু হিব্বান। হাদীছটি সাহীহ)

অন্য হাদীছে এসেছে..

لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه

কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ মুঅমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে ভালোমন্দ তাক্বদীরের উপর ঈমান আনবে, যতক্ষণ না সে বিশ্বাস করবে তার কাছে যাকিছু (কল্যাণ বা অকল্যাণ) এসেছে তার কোনোটিই না আসার ছিল না আর যা আসেনি তা আসার ছিল না। (তিরমিযী, জাবির রা. থেকে। শাইখ আলবানীর তাহক্বীক মতেও হাদীছটি সাহীহ।)

سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر	অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের মাঝে এমন কিছু মানুষের আবির্ভাব ঘটবে যারা তাক্বদীর অস্বীকার করবে। (মুসতাদরাক হাকিম। হাদীছটি সাহীহ।)

তাক্বদীর সম্পর্কে আক্বীদাহ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ইমাম ত্বাহাবী রাহি. তার কিতাবে লিখেছেন.. "তাক্বদীর আসলে সৃষ্টি জগতের মাঝে মহান আল্লাহর এক গোপন রহস্য" যে সম্পর্কে নৈকট্য অর্জনকারী কোনো ফিরিস্তা বা প্রেরিত কোনো রাসূলকেও অবগত করাননি। তাই এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করা অথবা বিষয়টি নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা বিচ্যুতির কারণ, ধ্বংসের সিঁড়ি এবং অবাধ্যতার মাধ্যম হবে। সুতরাং এ ব্যাপারে চিন্তা, গবেষণা, ধারণা, ইত্যাদি সকল দিক থেকেই চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ তাক্বদীরের বিষয়টিকে আল্লাহ তায়া'লা সকল সৃষ্টি থেকে গোপন রেখেছেন এবং এ নিয়ে চিন্তা-গবেষনা করতেও বারণ করে দিয়েছেন।

৬. আখেরাতঃ আমাদের আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হচ্ছে কিয়ামত, পুনরুত্থান, হিসাব, বিচার, জান্নাত, জাহান্নাম ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখা তথা এসব বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখা এবং এসব বিষয়কে মন থেকে মেনে নেওয়া। এটা হচ্ছে ঈমানের ৬টি মূলনীতির ৬ষ্ঠ মূলনীতি। সহজ ভাবে বুঝার জন্য এ বিষয়টিকে আমরা কয়েকটি ভাগে উপস্থাপন করব। যেমন..

ক. কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ঃ কিয়ামত বা মহাপ্রলয় বলতে আমরা সাধারণত এ মহাবিশ্বের ধ্বংসলীলাকে বুঝি। অর্থাৎ এমন এক দিন আসবে যখন মহান স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেবেন। আর এ মহাপ্রলয়ের জন্য তিনি তৈরি রেখেছেন এক মহাশিঙ্গা। মহাপ্রলয়ের মহা ধ্বংসলীলা বাস্তবায়িত হবে মহাশিঙ্গার একটিমাত্র ফুঁৎকারের মাধ্যমে। মহান আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেন..

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50)

তারা (কাফিররা মুঅমিনদেরকে) আরো বলেঃ তোমরা সত্য হলে (বলো! কিয়ামত, হাশর, হিসাব, জান্নাত, জাহান্নাম) এসব প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হবে? (তাদের এমন প্রশ্নের উত্তরে মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেন..)

আসলে তারা অপেক্ষা করছে একটিমাত্র গর্জনের (তথা মহাশিঙ্গায় মহা ফুঁৎকারের) আর এটা যখন চলে আসবে তখনো তারা বিবাদে রত থাকবে। তখন (মুহূর্তে সব ধ্বংস হয়ে যাবে) তারা পরস্পরকে উপদেশ দিতেও সক্ষম হবে না আর আপন পরিবারের কাছে ফিরে যেতেও পারবে না। (৩৬ ইয়াসীনঃ ৪৮-৫০)

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (68)

আর যখন (১ম বার) শিঙ্গা ফুঁকা হবে তখন আসমানে যারা আছে এবং যমীনে যারা আছে সবাই (মরে) অচেতন হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাদের চান (তারা মরবে না) তারপর যখন পুনরায় শিঙ্গা ফুঁকা হবে তখন সবাই উঠে দেখতে থাকবে। (৩৯ যুমারঃ ৬৮)

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। হাদীছে বলা হয়েছে। ১ম শিঙ্গা ফুঁকার সময় সবাই মরে গেলেও জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফীল এবং মালাকু-ল-মাওত এ চারজন ফিরিস্তা মরবে না। পরে পর্যায়ক্রমে তিন জনের মৃত্যু হবে।

(এ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ হাদীছ আছে, হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তাফসীর কুরতুবী, তাবারী এবং তিরমিযীর তাফসীর অধ্যায়ে। আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৩য় বই "যেভাবে ঈমান ঈমান আনতে হয়" এর ফিরিস্তাদের উপর ঈমান অধ্যায়েও হাদীছটি উল্লেখ আছে।)

খ. পুনরুত্থানঃ মহাপ্রলয়ের পর চলে যাবে দীর্ঘ সময়। তারপর হবে পুনরুত্থান। পুনরুত্থান সংঘটিত করানোর জন্য ২য় বার পুনরায় সেই মহাশিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। তবে এ ফুঁ ধ্বংসের জন্য নয় বরং ধ্বংসপ্রাপ্ত সবকিছুকে পুনরায় জীবন দান করার জন্য। আর এ পুনরায় জীবন দান করাকে-ই বলা হয় পুনরুত্থান। ইরশাদ হচ্ছে..

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (51) قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (53) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (54)

(দ্বিতীয় বার) শিঙ্গা ফুঁকা হলে তারা কবর/মাটির নীচ থেকে উঠে প্রভুর দিকে ছুটে চলবে। (১ম ফুঁৎকারের পর ২য় ফুঁৎকার তথা পুনরুত্থান পর্যন্ত পাপিষ্ঠদের কবরের আযাব বন্ধ রাখা হবে এবং সবাই নিদ্রিত থাকবে -জালালাইন) তাই ২য় ফুৎকারের পর সবাই ঘুম থেকে উঠে ছুটে চলবে তখন..)

তারা বলবেঃ সর্বনাশ! সর্বনাশ! আমাদেরকে নিদ্রা থেকে কে জাগ্রত করেছে? (তখন তারা বলাবলি করবে /তাদেরকে বলা হবে) এটা-ই রাহমানের প্রতিশ্রুতি, রাসূলগণ সত্য বলে ছিলেন।

এটা (পুনরুত্থান) আসলে একটিমাত্র গর্জন। তৎক্ষণাৎ সবাই উঠে আমার কাছে হাজির হবে। (তখন ঘোষণা করা হবে) আজ কারো প্রতি সামান্যতম অবিচার করা হবে না। তোমরা যে যা করেছ আজ তোমাদেরকে এসবের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। (৩৬ইয়াসীনঃ ৫১-৫৪)

গ. হিসাব, বিচার, জান্নাত ও জাহান্নামঃ পুনরুত্থানের পর শুরু হবে হিসাব ও বিচার। দুনিয়ার জীবনে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের রেকর্ড রাখা হচ্ছে। ফিরিস্তাগণ তখন প্রতিটি মানুষের রেকর্ডবুক /রিপোর্ট বই /আমলনামা পেশ করবে। সবাইকে নিজ নিজ রিপোর্ট বই দেওয়া হবে এবং বিচারের চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা হবে আর এ রায়ের ভিত্তিতেই ফয়সালা হবে আমাদের চিরস্থায়ী আবাসনের। কেও যাবে জান্নাতে আর কেও জাহান্নামে। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (26)

নিশ্চয় আমার কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন এবং আমার দায়িত্বেই তাদের হিসাব গ্রহণ /আমার কাছেই তাদের জবাবদিহিতা। (৮৮ গাশিয়াহঃ ২৫-২৬)

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (16) الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (17)

সেদিন (বিচারের দিন) সকলের সবকিছু উন্মুক্ত হয়ে যাবে, কারো কোনোকিছু-ই আল্লাহ থেকে গোপন থাকবে না। (সেদিন উন্মুক্ত ময়দানে জিজ্ঞেস করা হবে) আজকের এ দিনে সার্বভৌম ক্ষমতা কার? (সব দিক থেকে আওয়াজ উঠবে) মহাপ্রতাপশালী এক আল্লাহর। (তখন ঘোষণা করা হবে আজ ১০০% ন্যায় বিচার হবে এবং) আজ সবাইকে নিজ নিজ কর্মফল দেওয়া হবে, আজ (কারো প্রতি) সামান্যতম অবিচার হবে না। আল্লাহ খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৪০গাফিরঃ ১৬-১৭)

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (15) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ (16)

(পরকালে) অবশ্যই নেক লোকেরা থাকবে নিয়ামতপূর্ণ (জান্নাতে) আর পাপিষ্ঠরা থাকবে জাহী'মে (তথা প্রজ্বলিত জাহান্নামে।) প্রতিদান দিবসে সবাই সেখানে দাখিল হবে, কেউ সেখান থেকে পালিয়ে থাকতে পারবে না। (৮২ ইনফিত্বারঃ ১৩-১৬)

বিঃ দ্রঃ = আসলে ঈমানের মৌলিক বিষয় ৬টি। যথা..

১. আল্লাহর উপর ঈমান
২. ফিরিস্তাগণের উপর ঈমান
৩. আল্লাহর কিতাবসমূহের উপর ঈমান
৪. আল্লাহর রাসূলগণের ঈমান ঈমান
৫. তাক্বদীরের উপর ঈমান
৬. কিয়ামত, পুনরুত্থান ও আখেরাতের উপর ঈমান।

এ ছাড়াও আল্লাহ থেকে আগত এবং রাসূল সা.র কর্তৃক আনীত সকল বিষয়েই ঈমান আনতে হয়। আমরা এসব থেকে মাত্র দুটি বিষয় (তাক্বদীর ও আখেরাত) অতি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছি। বাকি বিষয়গুলো উল্লেখ করিনি। কারণ আমাদের এ কোর্সের নাম "শারীয়া'হ

কোর্স” আর ঈমান সংক্রান্ত বিষয়গুলো আসলে ঈমান আক্বীদাহ কোর্সের সাথে সম্পৃক্ত। তাই এসব বিষয়কে আমরা সবিস্তারে “ইসলাম শিক্ষা কোর্স” এ আলোচিত হয়েছে এবং ঈমানের এ ৬টি মৌলিক বিষয় নিয়ে আমরা “যে ভাবে ঈমান আনতে হয়” নামে আলাদা একটি বই সংকলন করেছি। বিষয়গুলোকে সবিস্তারে জানার জন্য বইটি অধ্যয়নের আবেদন রইল।

৩য় পাঠঃ আমল

ঈমানের পর পরই আমাদের পরবর্তি দায়িত্ব হচ্ছে আমল করা। আমল ঈমানকে পূর্নতা দান করে। আমল ছাড়া ঈমান দুর্বল হয়ে যায় আর যে ব্যক্তি পরিপূর্নভাবে আমল করে না সে ফাসিক হয়ে যায়।

আমল পরিচিতিঃ আমল অর্থ কাজ। বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে যাকিছু করা হয় এসবকে বলা হয় সৎকাজ, নেককাজ বা আমলে সালেহ। আ’মাল বলতে আমরা এসব কাজকেই বুঝে থাকি।

যে আমল আল্লাহর কছে কবুল হবে আখেরাতে এর ছাওয়াব পাওয়া যাবে আর যে আমল কবুল হবে না আখেরাতে এজন্য কিছুই পাওয়া যাবে না।

আমল কবুল হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। তাই আমল করার আগে এসব শর্ত পুরন করতে হয় এবং তারপর আমল করলে এ আমল কবুল হয়। আমল কবুল হওয়ার শর্ত সমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ..

শর্ত ১ ঈমানঃ আমল কবুল হওয়ার প্রথম শর্ত ঈমান। ঈমান ব্যতীত আমল কবুল হয় না। ইরশাদ হচ্ছে..

আর যে ব্যক্তি আখেরাত কামনা করে এবং এজন্য কাজ করে সে যদি মুঅমিন হয়ে থাকে তবে তার এ কাজ ফলপ্রসু হবে। (ইসরাঃ ১৯)

শর্ত ২ ইখলাস্বঃ আমল কবুল হওয়ার ২য় শর্ত ইখলাস্ব। ইখলাস্ব সম্পর্কে উপরে ২য় দিনের ৩য় পাঠে আলোচনা করা হয়েছে।

শর্ত ৩ নবী সাঃর অনুকরনঃ আমল ও বাদাত কবুলের আরো একটি শর্ত হচ্ছে নবী সাঃর অনুকরন। নবী সাঃর অনুকরন ব্যতীত অন্য কোনো পন্থা বা তরীকাহ মেনে আমল বা ইবাদাত করলে এটা কবুল করা হয় না। (পবিত্র কুরআনে সূরাহ আল-ই’মরানের ৩১তম আয়াতে নবী সাঃর অনুকরনের কথা বলা হয়েছে)

শর্ত ৪ রিয়া মুক্ত থাকাঃ রিয়া অর্থ লোক দেখনো। লোক দেখানো কোনো কাজ আল্লাহর কাছে কবুল হয় না। (পবিত্র কুরআনে সূরাহ নিসার ৩৮তম আয়াতে রিয়ার কথা বলা হয়েছে)

শর্ত ৫ আহকাম ও আরকানঃ আহকাম অর্থ বিধিবিধান আর আরকান অর্থ মূলবিষয় বা মূলনীতি। অর্থাত আমল ও ইবাদাতের যেসব বিধিবিধান ও নিয়ম নীতি রয়েছে এগুলো মেনেই কাজটি করতে হবে। নতুবা একাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।

শর্ত ৬ হারাম মুক্ত থাকাঃ অর্থাত যে ব্যক্তি আমল করেছে তাকে অবশ্যই হারাম মুক্ত হতে হবে। হারাম খাদ্য, হারাম পানীয়, হারাম পশাক, ইত্যাদি ব্যবহার করে আমল করলে ওই আমল বা ইবাদাত আল্লাহর কাছে কবুল হয় না।

যেসব কাজ কলে আমল নস্যাত হয়ে যায়ঃ আর উল্লেখিত শর্ত মেনে আমল সম্পাদন করার পর এ আমল ও এর ফলকে নস্যাত হওয়া থেকে বাচিয়ে রাখতে হবে। কারন এমনকিছু পাপ রয়েছে যা করলে আমল ও ইবাদাতের ফল বা প্রতিদান তথা ছাওয়াব নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। যেমন ..

১- কুফরঃ সনাতন বা আধুনিক যে কোন প্রকার কুফরে জড়িয়ে পড়লে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আমাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে.. “যে ব্যক্তি ঈমান আনা সত্ত্বেও কুফর করল তার সলক আ’মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে গেল” (দেখুন সূরাহ মাইদাহঃ ৫ম আয়াতের শেষাংশ)

২- শিরকঃ সনাতন বা আধুনিক যে কোন প্রকার শিরকে জড়িয়ে পড়লে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আমাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে..

(হে নবী!) তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তী নবীদের কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, “যদি তুমি শিরক কর তবে তোমার সকল আ’মাল বরবাদ হয়ে যাবে” এবং তুমি (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে। (৩৯ যুমারঃ ৬৫)

৩- অপছন্দঃ আল্লাহর নাযিলকৃত কোনো তথ্য, বিধান বা অন্যকিছু অপছন্দ করলে সকল আমল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে..

কারনঃ আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে, ফলে আল্লাহ তাদের সকল আ’মাল নস্যাত করে দেন। (সূরাহ মহাম্মাদঃ ৯)

৪- খোটা দেওয়াঃ দান, অনুদান বা সহযোগিতা করার পর গ্রহিতাকে খোটা দিলে এর ছাওয়াব নস্যাত হয়ে যায়। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শোনো!) তোমরা (গ্রহিতাকে) খোটা দিয়ে বা দুঃখকষ্ট দিয়ে নিজেদের সাদাকাতকে নস্যাত করে দিও না। (বাক্বারাহঃ ২৬৪)

৫- দুঃখকষ্ট দেওয়াঃ দান, অনুদান বা সহযোগিতা করার পর গ্রহিতাকে এ বিষয়ে কষ্ট দিলে এর ছাওয়াব নস্যাত হয়ে যায়। (দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ২৬৪)

পাপ ও পাপের পরিনতি

পাপ একটি মারাত্মক ব্যাধি এবং প্রতিক্রিয়াশীল ক্রিয়া। পাপ মানুষের ঈমান আমল ও স্বভাব-চরিত্রকে কলোষিত করে তুলে। কোনো কোনো পাপ মানুষের ঈমান ও আমলে সরাসরি আঘাত করে এবং এর প্রভাবে ঈমান, আমল স্বভাব-চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। তাই পাপ ও পাপের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। আর এ আশ্যকতার বিষয়টি বিবেচনা করেই আমাদের এ পাঠ।

১ম পাঠঃ পাপ পরিচিতিঃ

বাস্তব জীবনের কোনো ব্যাপারে আল্লাহর বিধান অমান্য করা অপরাধ, ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে বলা হয় পাপ। পাপ দুই প্রকারঃ কাবীরাহ ও ছাগী'রাহ তথা মহাপাপ ও ছোটপাপ।

আল-কুরআনের **সুস্পষ্ট আয়াত** অথবা **মুতাওয়াতির হাদীছ** দ্বারা প্রমাণিত কোনো হারামে জড়িয়ে পড়া অথবা কোনো ফরজ তরক করা তথা আল্লাহর কোনো আদেশ লঙ্ঘন করা অথবা আল্লাহ সরাসরি নিষেধ করেছেন এমন কোনো কাজ করে ফেলা মারাত্মক অপরাধ, আর এটাকেই বলা হয় কাবীরাহ গোনাহ, বড় গোনাহ বা মহাপাপ। আর এ ছাড়া বাকি পাপ সমূহ হল ছোট পাপ। ইরশাদ হচ্ছে..

إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما

তোমরা যদি আল্লাহর নিষেধকৃত মহাপাপ থেকে বিরত থাকো তবে তোমাদের ছোট পাপ সমূহ আমি মোচন করে দেব আর তোমাদের প্রবেশ করাব সম্মানিত আবাসনে। (৪ নিসাঃ ৩১)

পাপ মোচনের উপায়ঃ অযু, নামায, তিলাওয়াত, সাওম, হাজ্জ, উমরাহ, নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ, মসজিদে যাতায়াত, জ্ঞান অন্বেষণ, তাসবিহ, তাহলিল, মানব কল্যাণ, সৃষ্টির সেবা ইত্যাদি সৎকাজের মাধ্যমে ছোট পাপসমূহ মাফ হয়ে যায়। এটা আমাদের উপর মহান আল্লাহর বিশেষ দয়া এবং পাপ মোচনের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি। আর বড়পাপ তাওবাহ ব্যতীত মাফ হয় না। বড়পাপ মোচনের জন্য তাওবাহ ও ইস্তিগফার করতে হয়।

উল্লেখ্যঃ আল্লাহর ভয়ে (মনে প্রানে সংকল্প করে) নিজেকে শোধরে নিয়ে পাপ ছেড়ে সৎপথে ফিরে আসার (তথা ভালো হয়ে যাবার) নাম **তাওবাহ** এবং পাপের জন্য অনুশোচনা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার নাম **ইস্তিগফার**।

পাপের প্রতিক্রিয়াঃ পাপ একটি প্রতিক্রিয়াশীল কাজ। মানুষের স্বভাবে, জীবনে এবং ঈমানে পাপের প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। পাপের প্রতিক্রিয়া হয় ৩ ভাবে। যথা..

প্রতিক্রিয়াঃ ১ = পাপের প্রাথমিক প্রভাব পড়ে মানুষের স্বভাব চরিত্রের উপর। মানুষের স্বভাবের উপর ছোট বড় সকল পাপের প্রভাব পড়ে। তাই নিজের স্বভাব চরিত্রকে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রাখতে ছোট বড় সকল পাপ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

প্রতিক্রিয়াঃ ২ = কাবীরাহ বা মহাপাপ সরাসরি আমাদের ঈমানে আঘাত করে। মহাপাপের প্রভাবে ঈমান কখনো দুর্বল হয়ে পড়ে আর কখনো একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ মহাপাপ দুই ধরনের হয় এবং এর প্রতিক্রিয়াও হয় দুই ধরনের।

কিছু কাবীরাহ খুব ভয়াবহ এবং এর প্রতিক্রিয়াও ধ্বংসাত্বক। এসব পাপের প্রভাবে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। ফলে অনেক নেক আমল করেও আখেরাতে ক্ষমার কোনো উপায় থাকে না। যারা এসব পাপ করে তারা আর মুঅমিন থাকে না বরং মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়।

আর কিছু কাবীরাহর প্রভাবে ঈমান দুর্বল ও রোগ্ন হয়ে যায় তবে একেবারে নষ্ট হয় না। তাই আখেরাতে আল্লাহর করুণা ও ক্ষমার আশা থেকে যায়। যারা এসব পাপ করে তারাও আর মুঅমিন থাকে না বরং ফাসিক হয়ে যায়। বর্নিত হচ্ছেঃ

وعن أبي ذر قال :أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائمٌ عليه ثوبٌ أبيض ثم أتيته فإذا هو نائمٌ ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال :ما من عبدٍ قال :لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت :وإن زنى وإن سرق؟ قال :وإن زنى وإن سرق قلت :وإن زنى وإن سرق؟ قال :وإن زنى وإن سرق ثلاثًا ثم قال في الرابعة : على رغم أنف أبي ذر قال :فخرج أبو ذر وهو يقول :وإن رغم أنف أبي ذر.

আবুযার রাঃ বলেন একদা আমি রাসূল সাঃর কাছে এলাম। তিনি সাদা কাপড় মুড়িয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। একটু পর আমি আবার এলাম। তিনি তখনো ঘুমিয়ে। কিছুক্ষন পর আবার এলাম। তিনি তখন জেগে উঠেছেন। আমি কাছে বসলাম। তিনি বললেন: যে ব্যক্তি **"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"** বলবে (তথা বাস্তব জীবনে এক আল্লাহর প্রভূত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলবে) এবং মৃত্যু পর্যন্ত এর উপর অবিচল থাকবে সে জান্নাতে যাবে।

আমি বললাম: যিনা করলেও, চুরি করলেও..? তিনি বললেন: যিনা করলেও, চুরি করলেও।

আমি বললাম: যিনা করলেও, চুরি করলেও..? তিনি বললেন: যিনা করলেও, চুরি করলেও।

আমি বললাম: যিনা করলেও, চুরি করলেও..? তিনি বললেন: যিনা করলেও, চুরি করলেও।

কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন: আবুযারের নাকে ধুলা পড়লেও। আবুযার রাঃ বেরিয়ে গেলেম। তিনি বলতে ছিলেন: আবুযারের নাকে ধুলা পড়লেও..। (বুখারী: ৫৫১৩, ১১৮০, ৬০৭৮ মুসলিম: ৯৪, তিরমিযী: ২৬৪৪)

বুঝা গেল কারো ঈমান সঠিক হলে এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অবিচল থাকলে পাপি হলেও সে জান্নাতে যাবে।

প্রতিক্রিয়াঃ ৩ = আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মহাপাপ দুই ধরনের হয় এবং আমাদের ঈমানের উপর এর প্রতিক্রিয়াও দুই ধরনের হয়ে থাকে। কিছু পাপ ঈমানকে দুর্বল ও রোগ্ন করে দেয় আর কিছু পাপ ঈমানকে নষ্ট করে দেয়।

ঈমান বিনষ্টকারী কোনো পাপে জড়িয়ে পড়লে কেউ আর মুঅমিন থাকে না বরং কাফির, মুশরিক বা মুরতাদ হয়ে যায়। তবে মুসলিম হিসেবে জীবনযাপনের কারনে তাকে কাফির না বলে মুনাফিক বলা হয়।

কিন্তু ঈমান শূন্য হয়ে যাবার ফলে তার ইবাদত বন্দেগী নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত তার জন্য হারাম হয়ে যায়। কারণঃ ঈমান শূন্য কোনো ব্যক্তি আখেরাতে সামান্যতম রহমত বা মাগফিরাতও পাবে না, এরা হয়ে যাবে ক্ষমার অযোগ্য, চির জাহান্নামী।

আসলে আখেরাতে নাজাতের একমাত্র উপায় হচ্ছে ঈমান। আর ঈমান নষ্ট হয়ে যাবার ফলে এদের নাজাতের আর কোনো উপায়ই বাকি থাকবে না। এদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)

...কেউ ঈমান আনা সত্ত্বেও কুফর করলে তার সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায় আর আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্থ (চির জাহান্নামী) হয়ে যায়। (৫ মা-ইদাহঃ ৫)

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65)

তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তি নবীদের কাছে এই মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, "শিরক করলে তোমার সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যাবে" তখন তুমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে। (৩৯ যুমারঃ ৬৫)

নাওয়াক্বিদু-ল-ঈমানঃ যেসব পাপ করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় এগুলোকে বলা হয় "নাওয়াকিদু-ল-ঈমান" (ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় সমূহ।) নাওয়াক্বিদু-ল-ঈমানের মূল বিষয়ঃ কুফর ও শিরক। অর্থাৎ কোনো মুসলিম যখন নিজেকে (আধুনিক বা সনাতন) কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে ফেলে তখনি তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়।
আর ঈমান বিনষ্টকারী এসব কুফর শিরকের অপর নাম নিফাক বা মুনাফাকী। যে মুসলিম এমন কোনো কাজ করল সে মুনাফিক হয়ে গেল। মুনাফিক ব্যক্তি যেহেতু ঈমানশূন্য হয়ে যায় তাই তার সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবার হয়ে যায়। ফলে আখেরাতে সে কিছুই পাবে না।
ইতিমধ্যে আমরা কুফর, শিরক ও নিফাক সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আসলে এ তিনটিই ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। এর যেকোনোটিতে জড়িয়ে পড়লেই ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। বিষয়টিকে আরো সহজ ভাবে বোঝানোর জন্য সমাজে প্রচলিত কিছু নাওয়াক্বিদ্ব (ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়) উল্লেখ করা হল।

২য় সেমিষ্টার ৬ষ্ঠ দিন

তাহারাত বা পবিত্রতা

প্রারম্ভিক কথাঃ ত্বাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন আমাদের উপর অর্পিত আরো একটি ফরজ দায়িত্ব। এটা প্রতিটি মুসলিম নর ও নারীর উপর ফরজ হয়। তাহারাত বা পবিত্রতা সর্বকালীন ফরজ নয়। শুধু বিশেষ কিছু ইবাদাত এবং বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ধরণের ত্বাহারাত বা পবিত্রতাকে ফরজ করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ফিক্বহী পরিভাষাঃ বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে বুঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ফিক্বহী পরিভাষা জানা আবশ্যক। যথা..
১. তাহারাতঃ পবিত্রতাকে আরবীতে ত্বাহারাত বলা হয় আর অপবিত্রতাকে বলা হয় নাজাসাত।
২. নাজাসাতঃ নাজাসাত দুই প্রকার। আসল নাজাসাত (নাজাসাত হাক্বিক্বী) ও বিধিবদ্ধ নাজাসাত (নাজাসাত হুকমী)
৩. নাজাসাত হাক্বিক্বীঃ যে সব বস্তু আসল নাপাক এটাকে নাজাসাত হাক্বিক্বী বলে। যেমনঃ মল, মূত্র, রক্ত ইত্যাদি।
৪. নাজাসাত হুকমীঃ আসল নাপাক নয় তবে বিধিবদ্ধ ভাবে নাপাক ধরা হয় এমন নাপাককে বলা হয় নাজাসাত হুকমী তথা বিধিবদ্ধ নাপাক। যেমনঃ অযুহীন ব্যক্তি, জুনুবী (গোসল ফরজ হয়েছে এমন) ব্যক্তি, ইত্যাদি।
৫. হাদাছঃ ফিক্বহী পরিভাষায় নাজাসাত হুকমীকে বলা হয় হাদাছ। হাদাছ আবার দুই প্রকার হয়ে থাকে। বড় হাদাছ ও ছোট হাদাছ তথা হাদাছ আকবার ও হাদাছ আসগার।
৬. হাদাছ আকবারঃ যে হাদাছ থেকে শুধু অযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যায় না বরং গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে হয় এটাকে হাদাছ আকবার (বড় হাদাছ) বলে।
৭. হাদাছ আসগারঃ যে হাদাছ থেকে শুধু অযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যায় এটাকে হাদাছ আসগার (ছোট হাদাছ) বলে।

উল্লেখ্য তাহারাত বা পবিত্রতার দুটি ধাপ রয়েছে। যথাঃ বড় হাদাছ বা জানাবাত থেকে পবিত্রতা তথা ফরজ গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করা আর ছোট হাদাছ থেকে পবিত্রতা তথা অযু করে পবিত্রতা অর্জন করা।

এবার আসুন! কোন কাজের জন্য কোন ধরণের তাহারাত প্রয়োজন হয় এ বিষয়গুলো একটু স্ববিস্তারে জেনে নেই। যেমন..
ক. স্বালাতঃ যে সব ইবাদাতের জন্য পরিপূর্ণ তাহারাত ফরজ করা হয়েছে এর অন্যতম একটি হচ্ছে স্বালাত। স্বালাত শুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিপূর্ণ তাহারাত। গোসল ফরজ থাকলে অবশ্যই গোসল করতে হবে আর গোসল ফরজ না হলে অযু করতে হবে। আর অযু বা গোসলের জন্য পানি না পাওয়া গেলে অথবা পানি ব্যবহারে জীবনের ঝুকি বা স্বাস্থ্য ঝুকি থাকলে অযু অ গোসলের বদলে তায়াম্মুম করতে হবে। পরিপূর্ণ পবিত্রতা ব্যতীত স্বালাত শুদ্ধ হবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)

হে মুঅমিনগণ! তোমরা যখন স্বালাতে দাঁড়াবে তখন..

- নিজ নিজ মুখমণ্ডল ধৌত করবে এবং কনুই পর্যন্ত উভয় হাত (ধৌত করবে) তোমরা নিজ নিজ মাথা মাসেহ করবে আর কায়া'ব (টাখনু) পর্যন্ত পাও (ধৌত করবে।)
- আর তোমরা জুনুবী হলে (স্ত্রী সহবাস করলে বা বীর্যপাত ঘটালে) উত্তমরূপে পবিত্রতা হাসিল করবে (তথা গোসল করবে।)
- তোমরা যদি অসুস্থ হও অথবা সফরে থাকো আর মলমূত্র ত্যাগ করে (অযুর জন্য) অথবা নারী স্পর্শ করে (তথা সঙ্গম করে গোসলের জন্য) পানি না পাও (অথবা পানি ব্যবহারে সক্ষম না হও) তখন (অযু ও গোসলের বদলে) পবিত্র স্বাঈ'দ (মাটি, বালু, পাথর) দিয়ে তায়াম্মুম করবে তথা মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করে নেবে।

আল্লাহ তোমাদের উপর কোনো কষ্ট চাপিয়ে দিতে চান না, তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের উপর তার নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা শোকর আদায় কর। (৫ মা-ইদাহঃ ৬)

আইন ও বিধানঃ সালাতের আগে অবশ্যই পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। কারণ সালাতের পূর্বশর্ত হচ্ছে পবিত্রতা। পবিত্রতা ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হয় না। তাই স্বালাত আদায়ের আগে পবিত্রতা অর্জন করা আমাদের ফরজ দায়িত্ব।
স্বালাতের জন্য তাহারাতের ব্যাপারটিকে একেবারে স্পষ্ট করে বুঝার জন্য নিম্নে একটি হাদীছ উল্লেখ করা হল..

عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه **قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ** صلى الله عليه وسلم **يَقُولُ لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ .** رواه مسلم.

ইবনু উ'মার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূল সা.কে বলতে শুনেছি "আল্লাহ্ (দুই ধরণের ইবাদাত) কবুল করেন না। (১) তাহারাত ব্যতীত স্বালাত আর (২) হারাম সম্পদ থেকে সাদাক্বাহ"। (মুসলিম)

দলীল বিশ্লেষণঃ উপরে উল্লেখিত সূরাহ মাইদার ৬ষ্ঠ আয়াতে সালাতের আগে পবিত্রতা অর্জনের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং উল্লেখিত আয়াত এবং বর্ণিত হাদীছ থেকে বুঝা যায় পরিপূর্ণ তাহারাত সালাতের পূর্বশর্ত। আর বিষয়টি যেহেতু আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত তাই এতে কারো কোনো দ্বিমত নেই এবং দ্বিমতের কোনো সুযোগও নেই। তবে আরো ২টি ইবাদাতের জন্য পবিত্রতার প্রয়োজন বলেও অনেক ইমাম থেকে মতামত পাওয়া যায়। কিন্তু বিষয়টি যেহেতু অকাট্ট দলীল (আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত অথবা মুতাওয়াতির মানের হাদীছ) দ্বারা প্রমাণিত হয়নি তাই এতে ভিন্নমতের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং ভিন্নমত পাওয়াও যায়। যেমন..

খ. তাওয়াফঃ অধিকাংশ ইমামের মতে তাওয়াফের জন্যও পরিপূর্ণ তাহারাত আবশ্যক। অর্থাৎ গোসল ফরজ থাকলে গোসল করতে হবে নতুবা অযু করতে হবে এবং তারপর তাওয়াফ করবে। পরিপূর্ণ পবিত্রতা তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না। হাদীছে বর্ণিত আছে..

روى عبد الله بن عباس رضي الله عنه **أَنَّ رسول اللهﷺ قال :الطَّوافُ حولَ البيتِ مثلَ الصَّلاة، إلا أنكم تتكلَّمونَ فيهِ**

আব্দুল্লাহ বিন আ'ব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেনঃ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ সালাতের মত। তবে এতে কথা বলা যায়।
(তিরমিযী। হাদীছটির সনদ সাহীহ।)

পর্যালোচনাঃ ইমাম নববী, ইমাম বাইহাক্বীসহ অনেকেই বলেছেন "এটা রাসূল সা.র হাদীছ নয় বরং বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে এটা ইবন আব্বাস রা.র নিজের কথা"। (এ কথাটির সূত্র ও হাওয়ালা নিম্নে আরবীতে দেওয়া আছে।)

ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها **قالت لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ وقد قال ﷺ خذوا عني مناسككم** . رواه مسلم .(1297)

বুখারী ও মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, আইশাহ রা. বলেনঃ নবী সা. তাওয়াফের আগে অযু করেছেন। আর মুসলিমের এক বর্ণনায় (১২৯৭) এসেছে নবী সা. বলেছেনঃ "তোমরা তোমাদের মানাসিক (ইবাদাতের নিয়ম কানুন) আমার থেকে শিখে নাও।

পর্যালোচনাঃ যারা বলেছেন তাওয়াফের জন্য অযু শর্ত নয় উনাদের কথা হচ্ছেঃ উল্লেখিত হাদীছ দুটি সাহীহ হলেও কোনো বিধানকে ফরজ বানানোর জন্য যথেষ্ট নয়। বরং এমন হাদীছ দ্বারা বেশী থেকে বেশী সুন্নত বা মুস্তাহাব প্রমাণ করা যেতে পারে। (এ কথাটির সূত্র ও হাওয়ালা নিম্নে আরবীতে দেওয়া আছে।)

ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال لعائشة لما حاضت افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে আ'ইশাহ রা.র ঋতুস্রাব শুরু হলে রাসূল সা. বলেছেন "অন্য হাজীগণ যা করে তুমিও তাই করবে। তবে (স্রাব থেকে) পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত তাওয়াফ করবে না।

পর্যালোচনাঃ যারা বলেছেন তাওয়াফের জন্য অযু শর্ত নয় উনাদের কথা হচ্ছেঃ উল্লেখিত হাদীছটি দ্বারা ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়ে তাওয়াফ করতে বারণ করা হয়েছে এবং স্রাব বন্ধ হওয়ার পর তাওয়াফ করতে বলা হয়েছে। এর সাথে অযুর কোনো সম্পর্ক নেই। (এ কথাটির সূত্র ও হাওয়ালা নিম্নে আরবীতে দেওয়া আছে।)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ অনেক ইমামের মতে তাওয়াফের জন্য অযু আবশ্যক হলেও ইমাম আবু-হানীফাহ, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহি.সহ কয়েকজন উলামার মতে তাওয়াফের জন্য অযু শর্ত নয়। বরং অযু ছাড়াও তাওয়াফ করা যাবে এবং তাওয়াফ হয়ে যাবে। কারণ উল্লেখিত দলীলসমূহ অযু ফরজ করার জন্য যথেষ্ট নয়।

উপরে উল্লেখিত তাওয়াফ বিষয়ে বর্ণিত বিধান সমূহের আরবী টেক্সট হচ্ছে..

وذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة من الحدث ليست شرطاً للطواف وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله **واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .وأجابوا عن أدلة القول الأول بالآتي :**
أما حديث الطواف بالبيت صلاة فقالوا :لا يصح من قول النبي ﷺ وإنما هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما **. قال النووي في المجموع :الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ,كَذَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْحُفَّاظِ اهـ .**
وأما فعل النبي ﷺ وأنه طاف متطهراً فقالوا هذا لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب فقط ، لأن النبي ﷺ فعله ولم يَرِد أنه أمر أصحابه بذلك .
وأما قوله ﷺ لعائشة افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي فإنما منعها النبي ﷺ من الطواف لأنها حائض والحائض ممنوعة من دخول المسجد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً ؛ فإنه لم يَنقل أحدٌ عن النَّبي ﷺ لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة، وقد اعتمر عمَراً متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبيَّنه النبيﷺ بياناً عامّاً، ولو بيَّنه لنَقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب ؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة، وقد قال :إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طهر . ... اهـ .
"مجموع الفتاوى" (21 / 273)

গ. কুরআনের কপি স্পর্শ করাঃ মুস্বহাফ বা কুরআনের কপি স্পর্শ করার জন্য অযু আবশ্যক বলে মানসম্পন্ন দলীল দ্বারা স্টহিকভাবে প্রমানিত নয়। তাই বিষয়টি নিয়ে ভিন্নমতের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং ফিক্বহী ইমামগন ভিন্নমত পোষন করেছেন। অনেকের মতে মুস্বহাফ স্পর্শ করতে অযু লাগবে। দলীল হিসেবে উনারা উল্লেখ করেন..

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)

নিশ্চয় এটা হল সম্মানিত কুরআন, এটা (সংরক্ষিত) আছে সুরক্ষিত কিতাবে (লাউহে মাহফূজে) এটাকে স্পর্শ করে কেবল তারাই যারা পূত ও পবিত্র। (৫৬ ওয়াক্বিয়া'হঃ ৭৭-৭৯)

লক্ষণীয়ঃ এ তিন আয়াতে ৪টি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। বিষয়গুলো হচ্ছে..
৭৭ তম আয়াতের কুরআন কারীম শব্দটি, যার অর্থ সম্মানিত কুরআন (এখানে সুস্পষ্ট ভাবে কুরআনের কথা বলা হয়েছে)

৭৮ তম আয়াতের কিতাব মাকনূন তথা লাউহে মাহফূজ (এখানে সুস্পষ্ট ভাবে কিতাব মাকনূন তথা লাউহে মাহফূজের কথা বলা হয়েছে)
৭৯ তম আয়াতের এটাকে স্পর্শ করে কেবল তারাই যারা পূত ও পবিত্র।

এ আয়াতে এটাকে স্পর্শকারীদের ব্যাপারে খবর বা তথ্য দেয়া হয়েছে। তবে "এটা" শব্দ ব্যবহার করে কি বুঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। অর্থাৎ এব্যাপারে বিধানটি সুস্পষ্ট নয়। এখানে "এটা" সর্বনাম দ্বারা যেমন কুরআন বুঝা যায়, তেমনি লাউহে মাহফূজও বুঝা যায়। আর আরবী ব্যাকরণের নিয়ম (সর্বনাম সাধারণত তার নিকটতম শব্দকে বুঝিয়ে থাকে) মানা হলে লাউহে মাহফূজ বুঝার সম্ভাবনাই বেশী। তাই এ আয়াত সমূহের অর্থ কয়েক ভাবে বুঝা যেতে পারে। যেমন..

১. লাউহে মাহফূজে যে কিতাব রয়েছে এটাকে স্পর্শ করে কেবল তারাই যারা সৃষ্টিগত ভাবে পূত ও পবিত্র তথা ফিরিস্তারা। ফিরিস্তা ছাড়া অন্য কেউ এটা স্পর্শ করতে পারে না।
যারা এমন তাফসীর করেন উনাদের মতে মুসলিম কাফির নির্বিশেষে সকল মানুষই দুনিয়ায় থাকা কুরআনের কপি তথা মুস্বহাফ স্পর্শ করতে পারবে।
এমন মত পোষণকারীদের আরো একটি যৌক্তিক প্রমাণ হলঃ আল-কুরআন পাঠানো হয়েছে মানবজাতির হেদায়াত স্বরূপ। অর্থাৎ মানুষ এটা পড়বে, বুঝবে এবং এর বিধান মেনে জীবন যাপন করবে। আর কোনো কিতাব মানতে হলে প্রথমে এটা পড়তে হবে এবং বুঝতে হবে।
যে বা যারা এ কিতাবের বিধান মেনে নিয়ে বাস্তব জীবন পরিচালিতে করবে তারাই হবে মুসলিম। এখন যদি মুসলিম না হলে কেউ এটা ধরতেই না পারে তবে পড়বে কিভাবে, বুঝবে কি ভাবে? সুতরাং "মুসলিম না হয়ে কেউ কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না" এমন বিধান কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যায়।

২. উক্ত আয়াতের আরো একটি তাফসীর হচ্ছেঃ লাউহে মাহফূজ থেকে কুরআন অবতীর্ণ করে কেবল তারাই যারা সকল প্রকার পাপ পঙ্কিলতা থেকে পূত ও পবিত্র তথা ফিরিস্তারা।

৩. উক্ত আয়াতের আরো একটি তাফসীর হচ্ছেঃ কুরআনের যে কপি আমাদের হাতে বিদ্যমান আছে এটাকে স্পর্শ করবে শুধু তারাই যারা কুফর শিরক থেকে পবিত্র। অর্থাৎ সকল মুসলিম কুরআন স্পর্শ করতে পারবে যদিও তার অযু না থাকে বা সে জুনুবী হয়।
যারা এমন কথা বলেন তারা নিজেদের দলীল হিসেবে ওইসব হাদীছ উপস্থাপন করেন যেখানে বলা হয়েছে "মুঅমিন অপবিত্র হয় না"।

৪. উক্ত আয়াতের আরো একটি তাফসীর হচ্ছেঃ কুরআনের কপিকে স্পর্শ করবে শুধু তারাই যারা জুনুবী নয় অর্থাৎ যাদের উপর গোসল ফরজ হয়নি। যারা এ তাফসীর করেছেন উনাদের মতে মুসলিম ব্যক্তি বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করতে পারবে যদি সে জুনুবী না থাকে।

৫. উক্ত আয়াতের আরো একটি তাফসীর হচ্ছেঃ কুরআন স্পর্শ করবে শুধু তারাই যারা সকল প্রকার হাদাছ (অপবিত্রতা) থেকে পবিত্র। যারা এমন তাফসীর করেন উনাদের মতে বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করবে না

৬. উক্ত আয়াতের আরো একটি তাফসীর হচ্ছেঃ কুরআন পাঠের স্বাদ পায় তথা এর দ্বারা উপকৃত হয় কেবল তারাই যারা তাওহীদে বিশ্বাসী। সূত্রঃ এসব তাফসীর ও অভিমত তাফসীর কুরতুবী থেকে নেয়া হয়েছে।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ আয়াতের বর্ণনা যেহেতু সুস্পষ্ট নয়, তাই বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করা নিয়ে ফিক্বহী ইমামগণের মাঝে ভিন্ন মতের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ ব্যাপারে ইমামগণ থেকে ভিন্নমত পাওয়া যায়। যেমন..

- অধিকাংশ উলামার মতে কেউ বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করবে না। সাহাবাদের মাঝে আলী, ইবন মাসউ'দ, সায়া'দ বিন আবু-ওয়াক্কাস, সাঈদ বিন যাইদ রাঃহুম এবং পরবর্তিদের মাঝে ইমাম জুহরী, ইবরাহীম নাখয়ী, হাম্মাদসহ আরো অনেক থেকে এমন অভিমত পাওয়া যায়। ফিক্বহী ইমামগণের মাঝে ইমাম শাফিয়ী' এবং ইমাম মালিক এ মতটি গ্রহণ করেছেন।
- ইবন আব্বাস, শায়'বী গং আলিমগণের মতে বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করা যাবে। ফিক্বহী ইমামগণের মাঝে ঈমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃ এ মতটি গ্রহণ করেছেন। তবে আবু-হানীফাহ থেকে অন্য আরেকটি মতও পাওয়া যায়। অন্যমতে তিনি বলেছেনঃ বিনা অযুতে শুধু উপরের অংশ এবং ভিতরের খালি অংশ স্পর্শ করবে যেখানে লেখা থাকে না। কুরআনের লেখা অংশ অযু ছাড়া স্পর্শ করবে না। (উল্লেখিত সকল মতামত কুরতুবী থেকে আনা হয়েছে)
- কাগজে কাপড়ে পাথরে টাইলসে বা অন্যকিছুতে কুরআনের আয়াত লিখা থাকলেও উল্লেখিত নিয়ম কার্যকর হবে।
- কোনো ফ্রেইমে কুরআনের আয়াত লিখা থাকলে ফ্রেইমের উপরে যদি আলাদা গ্লাস, পলিথিন বা অন্যকিছু থাকে তবে সকলের মতেই বিনা অযুতে ধরতে পারবে। আর যদি লেমিনিটিং মেশিন দিয়ে একেবারে লাগিয়ে দেয়া হয় তবে উল্লেখিত ভিন্নমত কার্যকর হবে।
- জুনুবী ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করবে না। তবে ইমাম মালিক বলেছেনঃ ঋতুবতী নারী কুরআন তিলাওয়াত করবে। দলীল হিসেবে তিনি বলেছেন যেহেতু কুরআন বা হাদীছে সরাসরি নিষেধ করা হয়নি এবং এতো দীর্ঘ দিন কুরআন থেকে দূরে থাকা একজন মুঅমিনের পক্ষে কল্যাণকর নয়। তাই ঋতুবতী নারী কুরআন পড়বে।
- যে সব নারী লাইব্রেরীতে বা প্রিন্টিং প্রেসে বা এমন স্থানে কাজ করেন যেখানে কাজের প্রয়োজনে তাকে কুরআনের কপি স্পর্শ করতে হয় এমন অবস্থায় অনেকের মতে ঋতুস্রাব অবস্থায় ধরতে পারবে আর অনেকের মতে হাতে গ্লভস (হাত মোজা) পড়ে নিতে হবে। (আল্লাহু আ'লাম)

পবিত্রতা অর্জনের উপায়ঃ পবিত্রতা অর্জনের মূল মাধ্যম হলো "অযু" ও "গোসল"। আর কোনো বৈধ কারণে অযু গোসল করতে সক্ষম না হলে "তায়াম্মুম"র মাধ্যমেও পবিত্রতা অর্জন করা যায়।

এবার আসুন! অযু, গোসল ও তায়াম্মুম সম্পর্কে একটু স্ববিস্তারে জেনে নেই..

১ম পাঠঃ অযু

আমাদের উপর অন্যতম আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হলো প্রয়োজন হলে সময় অযু করা। অযু সর্বকালীন ফরজ নয়। বরং যে সব ইবাদাতের জন্য অযু আবশ্যক বলে ক্বাত্বয়ী' (অকাট্ট) দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় শুধু ওই সকল কাজের জন্যই অযু ফরজ হয়। অযুর মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে পবিত্রতা অর্জিত হয়। আমাদেরকে অযুর আদেশ দিয়ে মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

হে মুঅমিনগণ! তোমরা যখন সালাতে দাঁড়াবে তখন নিজ নিজ মুখমণ্ডল ধৌত করবে এবং কনুই পর্যন্ত উভয় হাত (ধৌত করবে) তোমরা নিজ নিজ মাথা মাসেহ করবে আর কায়া'ব (টাখনু) পর্যন্ত পাও (ধৌত করবে। ৫ মা-ইদাহঃ ৬)

বিশেষ ইবাদাতের উদ্দেশ্যে পবিত্রতা অর্জনের জন্য অযু করতে হয়। সাধারণত মুখ মণ্ডল ধৌত করা, দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা, মাথা মাসেহ করা এবং দুই পা কা'ব (টাখনু) পর্যন্ত ধৌত করার নাম অযু।

অযুতে নিয়ত করা এবং বিসমিল্লাহ বলা আবশ্যক। নিয়ত না করলে অযুর ছাওয়াব পাওয়া যায় না আর বিসমিল্লাহ না বললে অযুর বরকত হাসিল হয় না। এছাড়া কুল্লি করা, নাকে পানি দেয়া ও কান মাসেহ করা অযুর সুন্নত কাজ। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول اللهﷺ توضأ نحو وضوئي هذا - . متفق عليه.

উছমান রা. একদা অযুর পানি আনালেন তারপর (জনসম্মুখে অযু করতে শুরু করলেন। প্রথমে)

- তিনি উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ৩ বার ধৌত করলেন,
- তারপর কুল্লি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং নাক ঝাড়লেন।
- তারপর ৩ বার মুখ মণ্ডল ধৌত করলেন।
- তারপর ডানহাত কনুই পর্যন্ত ৩ বার ধৌত করলেন।
- তারপর বামহাত এভাবেই ধৌত করলেন।
- তারপর মাথা মাসেহ করলেন।
- তারপর ডান পা টাখনু পর্যন্ত ৩ বার ধৌত করলেন।
- তারপর একই ভাবে বাম পা ধৌত করলেন।
- অতঃপর বললেনঃ আমি রাসুল সা.কে এভাবেই অযু করতে দেখেছি যে ভাবে আমি এখন অযু করলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

বিঃ দ্রঃ = অযুর অঙ্গসমূহ ১ বার ১ বার করেও ধৌত করা যায়, ২ বার ২ বার করেও ধৌত করা যায়, ৩ বার ৩ বার করেও ধৌত করা যায় আবার একই অযুতে কোনো অঙ্গ ১ বার কোনো অঙ্গ ২ বার এবং কোনো অঙ্গ ৩ বার করেও ধৌত করা যায়। এ সকল অযুই রাসূল সা. থেকে প্রমাণিত। তবে ৩ বার ৩ বার করে অযু করা উত্তম বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন..

عن عبد الله بن زيد أن النبيﷺ توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه مرتين **قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذكر في غير حديث أن النبي ﷺ توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثا وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة**

আব্দুল্লাহ বিন যাইদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. একদা অযু করছিলেন (আর আব্দুল্লাহ দেখছিলেন) তিনি মুখ মণ্ডল ধৌত করেছেন ৩ বার, উভয় হাত ধৌত করেছেন ২ বার ২ বার করে, মাথা মাসেহ করেছেন (১ বার) আর উভয় পা ধৌত করেছেন ২ বার। (তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন হাদীছটি হাসান সাহীহ।)

অন্য বর্ণনায় এসেছে.. নবী সা. অযুর কোনো কোনো অঙ্গ ১ বার করে ধৌত করেছেন আর কোনো কোনো অঙ্গ ৩ বার করে ধৌত করেছেন। (এতোটুকু বর্ণনা করার পর ইমাম তিরমিযী বলেছেন) কোনো কোনো আলীমগণ এমন করাকে অনুমোদিত বলেছেন। উনারা বলেছেনঃ অযুর কোনো অঙ্গ ১ বার, কোনো অঙ্গ ২ বার আর কোনো অঙ্গ ৩ বার করাতে কোনো সমস্যা হবে না।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ

- হানাফী ফিক্বহ মতে অযুর ফরজ ৪টি তথা মুখ মণ্ডল ধৌত করা, দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা, এক চতুর্থাংশ মাথা মাসেহ করা আর দুই পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত করা।
- মালিকী, শাফিয়ী' ও হাম্বলী ফিক্বহ মতে অযুতে নিয়ত করা আবশ্যক।
- কোনো কোনো ফিক্বহ মতে অযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা, অযুতে কুল্লি করা এবং নাকে পানি দেওয়াও আবশ্যক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ অযু ভঙ্গের কারণসমূহঃ শারীয়া'হ বিধান মতে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা করলে বা সংগঠিত হলে অযু নষ্ট হয়ে যায় এবং নতুন করে অযু করতে হয়, ফিক্বহী পরিভাষায় এগুলোকে বলা হয় "নাওয়াক্বিযু-ল-ওয়ুযু" তথা অযু ভঙ্গের কারণসমূহ। আমাদের ইবাদাত বন্দেগী বিশুদ্ধতার জন্য এসব বিষয়ে জানা আবশ্যক। সুতরাং আসুন! জেনে নেই; কোন কোন কারণে অযু ভঙ্গ হয়ে যায় এবং নতুন করে অযু করতে হয়..

১. মলদ্বার অথবা মুত্রদ্বার দিয়ে কোনোকিছু বের হলে অযু নষ্ট হয়ে যায় এবং তখন (অযু প্রয়োজন হয় এমন কোনো ইবাদাতের জন্য) আবার নতুন করে অযু করতে হয়। অযুর ব্যাপারে বিধান দিয়ে মহান আল্লাহ তায়া'লা সুরাহ নিসার ৪র্থ আয়াতে বলেছেন..

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ	অথবা তোমাদের কেউ যখন টয়লেট থেকে আসবে (তখন সে অযু করবে)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ যেহেতু বিষয়টি আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত তাই এতে ভিন্নমতের কোনো সুযোগ নেই এবং কেও ভিন্নমত পোষণ করেননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ পেশাব পায়খানা থেকে পবিত্রতা অর্জনের উপায়

ক. পেশাবঃ পেশাব করার পর পেশাবের নির্গমনস্থান পানি দিয়ে ধৌত করা অথবা টিসু বা অন্যকিছু দিয়ে পরিষ্কার করা মুস্তাহাব।

খ. পায়খানাঃ পায়খানা করার পর মলদ্বারে লেগে থাকা আবর্জনা পরিষ্কার করতে হয় এবং স্বাভাবিক ভাবে পাথর, মাটি বা টিসু দিয়ে পরিষ্কার করাই যথেষ্ট তবে পানি দিয়ে ধৌত করা উত্তম। বর্ণিত হচ্ছে..

قوله ﷺإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزي عنه .رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الحافظ الدارقطني :إسناده صحيح،

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ তোমাদের কেও টয়লেটে গেলে সে যেন ৩টি পাথর (৩টি মাটির ঢিলা বা ৩ টুকরা টিসু) সঙ্গে নিয়ে যায়, যার দ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করবে। আর এটুকুই তার জন্য যথেষ্ট হবে। (আহমাদ, আবু-দাউদ। হাদীছটি সাহীহ)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ পায়খানা করার পর ৩ টি পাথর বা ৩টি মাটির দলা অথবা ৩ পিস টিসু দিয়ে মলদ্বার মুছে নেওয়াই যথেষ্ট। তবে পানি দিয়ে ধৌত করা উত্তম। এ ব্যাপারে বর্ণিত হচ্ছে..

روى البخاري (150)ومسلم (271) **عن أنس بْن مَالِكٍ، قال :كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، أَجِيءُ أَنَا وَغُلاَمٌ، مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ ، يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ"** والْإِدَاوَة :إِنَاء صَغِير من جلد يتَّخذ للْمَاء ، كما في "فتح الباري "لابن حجر.(1/ 76)

আনাস বিন মালিক রা. বলেনঃ নবী সা. যখন হাজতের জন্য (পায়খানার জন্য) বের হতেন তখন আমি আর আরো একটি বালক এক ইদাওয়াহ পানি নিয়ে আসতাম। আর তিনি এ পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা (পরিচ্ছন্নতা হাসিল) করতেন। (বুখারীঃ ১৫০, মুসলিমঃ ২৭১) উল্লেখ্য চামড়া দিয়ে বানানো ছোট পানির পাত্রকে ইদাওয়াহ বলা হয়।

২. রক্ত, পুঁজ ও বমিঃ শরীর থেকে রক্ত, পুঁজ, বমি ইত্যাদি বের হওয়ার কারণেও অযু নষ্ট হয়ে যাবে এবং এর পর (অযু প্রয়োজন হয় এমন কোনো ইবাদাত করতে হলে) আবার নতুন করে অযু করতে হবে। এটা হলো হানাফী ও হাম্বলীদের অভিমত। দলীল হিসেবে বর্ণিত হচ্ছে..

الأمر الثاني من نواقض الوضوء : سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ .أخرجه ابن ماجة .والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন যে ব্যক্তি (সালাতের ভিতর) বমি করল অথবা নাক থেকে রক্ত বের হল অথবা পিত্ত বমি করল সে যেন ফিরে গিয়ে অযু করে এবং কোনো প্রকার কথাবার্তা না বলে। তারপর তার সালাত (যেখান থেকে চলে গিয়েছিল সেখান থেকেই) চালিয়ে যায়। (ইবনু মাজা। হাদীছটি দ্বাইফ)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ হানাফী মতে রক্ত বের হলেই অযু ভঙ্গ হবে না বরং রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে গেলে বা গড়িয়ে পড়লেই কেবল অযু ভঙ্গ হবে এবং বমি মুখ ভরে হলেই কেবল অযু ভঙ্গ হবে।
কিন্তু অন্য ইমামগণের মতে এসব কারণে অযু ভঙ্গ হবে না। কারণ হাদীছটি দ্বাইফ। আর দ্বাইফ হাদীছ বিধানের ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে গণ্য হয় না।

৩. ঘুমঃ ঘুম অযু ভঙ্গের কারণ কী না? এ সম্পর্কে দুই ধরণের হাদীছ পাওয়া যায়। যথা..

لقوله صلى الله عليه وسلم **:العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن،**

এক বর্ণনায় রাসূল সা. বলেছেনঃ চোখ হলো বায়ুপথের প্রহরী (যতক্ষণ চোখ সজাগ থাকবে ততক্ষণ বায়ুপথ দিয়ে কিছু বের হলে মানুষ এটা বুঝতে পারবে আর যখন চোখ ঘুমিয়ে পড়বে তখন বায়ুপথ দিয়ে কিছু বের হলেও মানুষ বুঝতে পারবে না।) সুতরাং যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়লো সে যেন অযু করে। (আহমাদ, ইবনু মাজা। হাদীছটি হাসান)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে..

لقول أنس :كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم **ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون .رواه مسلم،**

আনাস রা. বলেছেনঃ রাসূল সা.'র সাহাবাগণ (ইশার সালাতের জন্য অপেক্ষা করতে করতে) ঘুমিয়ে পড়তেন এবং অতঃপর (রাসূল সা. চলে এলে উনারা) সালাত আদায় করতেন, উনারা আর অযু করতেন না। (মুসলিম)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ ঘুম সম্পর্কে উপরে দুটি হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। উপরের হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে ঘুমালে অযু নষ্ট হয়ে যাবে এবং এরপর (অযু আবশ্যক হয় এমন কোনো ইবাদাত করতে চাইলে) পুনরায় অযু করতে হবে। আর নীচের হাদীছ থেকে বুঝা যায় ঘুমালে অযু নষ্ট হবে না এবং এরপর (অযু আবশ্যক হয় এমন কোনো ইবাদাত করতে চাইলে) পুনরায় অযু করতে হবে না।

আসলে ঘুম অযু বিনষ্টকারী কী না এ সম্পর্কে উল্লেখিত দুই ধরণের বেশ কয়েকটি হাদীছ বিদ্যমান আছে। তাই আমাদের উচিত বিষয়টিকে সূক্ষ্ম ভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করা আর এ অনুধাবনের নাম-ই হলো ফিক্বহ।

তাই আসুন! বিষয়টি সম্পর্কে প্রসিদ্ধ চার ইমামের মতামত, বিশ্লেষণ এবং অনুধাবন সম্পর্কে জেনে নেই..
উপরের দুই প্রকার হাদীছ বিশ্লেষণ করে প্রসিদ্ধ চার ইমাম ঘুমকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা..
অতি সামান্য ঘুমা বা হালকা ঘুম আর গভীর ঘুম। অতঃপর উনারা মতামত দিয়েছেন "অতি সামান্য এবং হালকা ঘুমে অযু ভঙ্গ হবে না আর গভীর ঘুমে অযু নষ্ট হয়ে যাবে"। তবে হালকা ঘুম আর গভীর ঘুমের বিশ্লেষণ এবং সীমানা নির্ধারণ করা অনেক জটিল বিষয়। তআর এজন্যই হালকা ঘুম আর গভীর ঘুমের সীমানা নির্ধারনের বিষয়েও উনারা একমত হতে পারেননি। তাই আপনাদের বুঝার সুবিধার্থে বিষয়টিকে আমরা স্ববিস্তারে বর্ণনা করছি..

- শোয়ে ঘুমালে অযু ভেঙ্গে যাবে কারণ এটা গভীর ঘুম। এটা হলো প্রসিদ্ধ চার ইমামের সম্মিলিত মতামত।
- কোনোকিছুতে হেলান না দিয়ে চেপে বসে ঘুমালে অযু ভঙ্গ হবে না। এটাও চার ইমামের সর্ব সম্মত মত।

- দাঁড়ানো অবস্থায়, রুকু অবস্থায়, সিজদাহরত অবস্থায় তথা সালাতের অবস্থায় ঘুমালে অযু ভঙ্গ হবে না। কারণ এমনভাবে ঘুমালে শরীরের অঙ্গসমূহ ঠিলা হয়ে যায় না এবং তখন ওই ব্যক্তি তার পায়ু পথের নিয়ন্ত্রণ হারায় না। সুতরাং এমতাবস্থায় বাতাস বের হলে অবশ্যই সে জানতে পারবে। এটা হল ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃর মত, ইমাম আহমদ রাহিঃ থেকেও এমন একটি মত পাওয়া যায়।
- ইমাম শাফিয়ী রাহিঃর মতে যদি কেও এমনভাবে ঘুমায় যে তার মলদ্বার উন্মুক্ত থাকে এবং বাতাস বের হওয়ার জন্য কোনো প্রকার প্রতিবন্ধক না থাকে তবে অযু বিনষ্ট হয়ে যাবে। যেমন রুকু, সাজিদাহ, দাঁড়ানো বা এমনভাবে বসে ঘুমিয়েছে যে তার বায়ুপথ উন্মুক্ত রয়েগেছে তবে অযু ভেঙ্গে যাবে।
- কোনো ব্যক্তি যদি কোনোকিছুতে হেলান দিয়ে চেপে বসে ঘুমায় তবে ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃর মতে তার অযু বিনষ্ট হয়ে যাবে। কারণ এটা গভীর ঘুম। আর ইমাম শাফিয়ী' রাহিঃর মতে তার অযু ভঙ্গ হবে না। কারণ চেপে বসার কারণে বাতাস বের হবার সম্ভাবনা নেই।
- বিমান, রেলগাড়ি, বাস, কোচ বা কারের সিটে বসা অবস্থায় ঘুমালেও উল্লেখিত বিধান কার্যকর হবে। (যদিও আজকাল কোনো কোনো হানাফী আলীমও এসব বাহনে চেপে বসে ঘুমালে অযু ভঙ্গ হবে না বলে মতামত দিয়ে থাকেন)

বিঃ দ্রঃ = কোন কোন ইবাদাতের জন্য অযু আবশ্যক হয় এসব বিষয় উপরে তাহারাত অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে বিধায় এখানে আর উল্লেখ করা হল না।

২য় পাঠঃ গোসল

আমাদের উপর আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হচ্ছে জুনুবী হলে গোসল করা। গোসল ফরজ হয়ে গেলে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। এমতাবস্থায় শুধু অযু করলে পবিত্রা অর্জন হয় না। আমাদেরকে গোসলের আদেশ দিয়ে মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

আর তোমরা যদি জুনুবী হও তবে উত্তমরূপে পবিত্রতা হাসিল করবে (তথা গোসল করবে। ৫ মা-ইদাহঃ ৬)	**وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا**

গোসল ফরজ হওয়ার কারণসমূহঃ গোসল ফরজ হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে জুনুবী হওয়া। আর জুনুবী হওয়া যৌনতা সংক্রান্ত ব্যাপার। একজন পুরুষ এবং একজন নারী দুই ভাবে জুনুবী হতে পারে তথা যৌনতা সংক্রান্ত ব্যাপারে দুই কারণে গোসল ফরজ হতে পারে। আর শুধু এসব কারণ ছাড়া অন্য কারণেও তথা মেয়েদের হাইদ্ব ও নিফাস বন্ধ হওয়ার পরও গোসল ফরজ হয়। যে আলোচনা সামনে আসছে। গোসল ফরজ হওয়ার কারণসমূহ হচ্ছে..

গোসল ফরজ হওয়ার কারণঃ ১ যৌন সঙ্গমঃ নারী ও পুরুষ যৌন সঙ্গম করলে উভয়ের উপর গোসল ফরজ হয় এবং এ অবস্থাকে জুনুবী বলা হয়। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ মাইদাহর ৬ষ্ঠ আয়াতে। এ ছাড়া হাদীছে বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي هريرة رضي الله عنه **قال :قال رسول الله ﷺ :إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ثم جَهَدها، فقد وجب الغسل متفق عليه.زاد مسلم وإن لم يُنزل**

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ পুরুষ যখন (সঙ্গমের জন্য) নারীর চার অঙ্গের মধ্যখানে বসবে (দুই রান ও যোনির দুই কপাটের মধ্যখানে বসবে) এবং তারপর (তার লিঙ্গ নারী যোনিতে প্রবেশ করিয়ে সঙ্গমের) কাজ শুরু করবে তখন বীর্যপাত না হলেও (উভয়ের উপর) গোসল ওয়াজিব হয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

উপরের হাদীছে বর্ণিত বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট ভাবে বুঝার জন্য নিম্নে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করা হল..

عن عائشة رضي الله عنها **قالت :قال رسول الله ﷺ إذا قعد بين شُعَبِها الأربع، ثم مسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسلُ** (رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، وصححه، ولفظه) **:إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل.**

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ পুরুষ যখন (সঙ্গমের জন্য) নারীর চার অঙ্গের (দুই রান ও যোনির দুই কপাটের) মধ্যখানে বসবে এবং তারপর পুরুষের খিতান যখন নারীর খিতান স্পর্শ করবে তখন (উভয়ের উপর) গোসল ওয়াজিব হয়ে যাবে। (মুসলিম, আহমদ, তিরমিযী। হাদীছটি সাহীহ।)

খিতান পরিচিতিঃ খিতান অর্থ খাতনার স্থান। পুরুষাঙ্গের মাথার উপর অতিরিক্ত কিছু চামড়া থাকে, খাতনা করার সময় যে স্থান থেকে এ অতিরিক্ত চামড়া কেটে ফেলা হয় ওই স্থান হচ্ছে পুরুষের খিতান। নারীদের যোনিমুখের উপরি ভাগেও কিছু অতিরিক্ত বাড়তি চামড়া থাকে, যে নারীরা খাতনা করে খাতনার সময় তাদের এ বাড়তি চামড়াও কেটে ফেলা হয়, যে স্থান থেকে অতিরিক্ত বাড়তি চামড়া কেটে ফেলা হয় ওই স্থান হচ্ছে নারীর খিতান।

পুরুষের খিতান হচ্ছে লিঙ্গের অগ্রভাগের পরে আর নারীর খিতান হচ্ছে যোনিমুখের ঠিক উপর। সে মতে পুরুষের খিতান তখনই নারীর খিতান স্পর্শ করবে যখন লিঙ্গের অগ্রভাগ যোনিমুখের ভিতরে চলে যাবে। আর তখনই গোসল ফরজ হয়ে যাবে।

বিঃ দ্রঃ = পুরুষের খাতনা করা অনেকটা সহজ হলে নারীদের খাতনা করা খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। কারণ যোনীমুখের এ চামড়া স্বাভাবিক চামড়া নয়। তাই এ খাতনায় একটু ভুল হলেই যোনীমুখের এ অস্বাভাবিক চামড়া কেটে যাবে এবং নারীর জীবন ঝুকিতে পরতে পারে। তাই বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর।

প্রাসঙ্গিক বিষয়ঃ সঙ্গমের নিয়মঃ স্বামী-স্ত্রীর জন্য একে অপরের পুরা দেহটাই বৈধ। তারা একে অপরের দেহের সবকিছুই দেখতে পারবে, ধরতে পারবে এবং সকল অঙ্গ নিয়ে খেলা করে মজা করতে পারবে। তবে সঙ্গম করতে হবে শুধুই যোনিপথে, বায়ুপথে সঙ্গম করতে পারবে না। এ সম্পর্কে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)

পটভূমিঃ ইয়াহুদ সমাজে ঋতুবতী নারী সম্পর্কে নানা কুসংস্কারের প্রচলন ছিল। কিছু মানুষ তাদের সম্পূর্ণ আলাদা করে দিত আর কেউ কেউ মলদ্বারে সঙ্গম করত। সাহাবাগণ তাদের করণীয় সম্পর্কে জানতে চাইলে নাযিল হয়..

(হে নবী!) লোকজন তোমার কাছে ঋতুবতী নারী সম্পর্কে জানতে চায়, বলে দাওঃ এটা বড়ই নোংরা (অবস্থা।) সুতরাং স্রাব চলাকালীন সময়ে তোমরা নারী (সঙ্গম) থেকে বিরত থাকবে, (স্রাব থেকে) পবিত্র হওয়া পর্যন্ত (সঙ্গমের জন্য) তাদের কাছে যাবে না। তারা যখন

(স্রাব থেকে) উত্তম রূপে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তাদের সাথে সঙ্গম করবে আল্লাহর নির্দেশিত পথে (তথা যোনিপথে, বায়ুপথে নয়। আর স্রাব অবস্থায় সঙ্গম করে ফেললে তাওবাহ করবে) নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা তাওবাহ করে, আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করে। (২ বাক্বারাহঃ ২২২)

আইন ও বিধানঃ ঋতুকালে নারীর যোনি নোংরা থাকে, এ অবস্থায় সঙ্গম করলে নানা রোগের সৃষ্টি হয়। ঋতুবতী নারীর সাথে সঙ্গম করা বৈধ নয়। তবে সঙ্গম ব্যতীত অন্য সব (যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন, ইত্যাদি) বৈধ আছে। স্রাব পরিপূর্ণ ভাবে বন্ধ হয়ে গেলে (তথা সাদা স্রাব দেখা গেলে) নারী প্রথমে গোসল করবে এবং এ গোসল নারীর ফরজ দায়িত্ব। গোসলের পর ওই নারীর সাথে সহবাস করা যাবে। ঋতুবতী নারীর সাথে সহবাস করলে ১ দিনার (৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ বা সমমূল্য) বা আধা দিনার সাদাক্বাহ দিতে হয়। স্বামী-স্ত্রী সহবাসকালে ইচ্ছামত নানা পদ্ধতি গ্রহণ করে আনন্দ করা অবৈধ নয়। তবে সঙ্গম করতে হবে যোনি পথে, মলদ্বারে সঙ্গম করা বৈধ নয়।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

فقد أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان عن ابن عباس قال :قال رسول اللهﷺ لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر . صححه ابن خزيمة في صحيحه.

ইবন আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ আল্লাহ ওই ব্যক্তির প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে বায়ুপথে সঙ্গম করে। (তিরমিযী, নাসায়ী। ইবনু খুজাইমাহ হাদীছটিকে সাহীহ বলেছেন)

كما في مسند الإمام أحمد، وسنن أبي داود، والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"ملعون من أتى امرأته في دبرها"

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বায়ুপথে স্ত্রী সঙ্গম করল সে অভিশপ্ত। (আবু-দাউদ, নাসায়ী, আহমাদ)

গোসল ফরজ হওয়ার কারণঃ ২ বীর্যপাতঃ মানুষ জুনুবী হওয়ার ২য় কারণ হচ্ছে বীর্যপাত অর্থাৎ সঙ্গম ব্যতীত অন্যভাবে বীর্যপাত ঘটলে বা ঘটালে গোসল ফরজ হয়ে যায়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله تعالى عنه **قال: قال رسولُ الله ﷺ الماء من الماء.** رواه مسلمٌ،

আবু-সাঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন "পানি পানির কারণে"। (মুসলিম)

অর্থাৎ পুরুষের লিঙ্গ অথবা নারীর যোনি থেকে যৌবনের পানি বের হলে তথা বীর্যপাত হলে পবিত্রতার জন্য পানি ব্যবহার করা তথা গোসল করা আবশ্যক হয়।

উল্লেখ্য পুরুষ ও নারীর যৌনাঙ্গ থেকে দুই ধরণের পানি বের হয়। এর একটি হলো যৌনরস, যাকে আরবীতে "মাযী" আর উর্দুতে "মযী" বলা হয়। আর অপরটি হলো যৌবনের পানি বা বীর্য, যাকে আরবীতে "মানী" আর উর্দুতে "মনী" বলা হয়।

মাযী পরিচিতিঃ মাযী বা মযী হচ্ছে যৌনরস যা সঙ্গমকালে নারীপুরুষ উভয়ের যৌনাঙ্গ থেকে অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় ধীরে ধীরে বের হয় এবং যোনি পথকে পিচ্ছিল করে রাখে যাতে যৌন মিলন আরো বেশী তৃপ্তিদায়ক ও আনন্দময় হয়। মযীর নির্গমন যৌন উত্তেজনাকে আরো তীব্র করে তুলে এবং দেহমনে যৌবনের উন্মাদনাকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

মানী পরিচিতিঃ মানী বা মনী হচ্ছে নারীপুরুষের বীর্য যা চরম উত্তেজনা শেষে তীব্র বেগে বের হয়। বীর্য বের হওয়ার মাধ্যমে নারী ও পুরুষের যৌন উত্তেজনার সমাপ্তি ঘটে এবং দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

ফিক্বহী বিধানঃ কোনো কারণে দেহে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হলে নারী ও পুরুষ উভয়েরই মযী বের হয় এবং মযী বের হলে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়। আর যৌন বিষয়ক কল্পনা, একে অপরকে স্মরণ, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মানষিক আকর্ষণ, হস্তমৈথুন, ইত্যাদি যে কোনো কারণে নারী বা পুরুষের মনী বের হয়ে গেলে তথা বীর্যপাত ঘটলে গোসল ফরজ হয়ে যায়।

বিঃ দ্রঃ = হস্তমৈথুন অবৈধ কাজ এবং এটি একটি বাজে অভ্যাস। হস্তমৈথুন মানব স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। হস্তমৈথুনের মাধ্যমে পুরুষ তার যৌবন হারায় আর নারী নষ্ট করে তার ত্বকের লাবন্যতা ও যৌবনের তৃপ্তি। সাথে পাপ এবং নানা যৌন রোগতো আছেই। তাই এমন বদ-অভ্যাস থেকে বেঁচে থাকার জন্য সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি।

গোসল ফরজ হওয়ার কারণঃ ৩ হাইদ্ব বা নিফাসের স্রাব বন্ধ হওয়াঃ গোসল ফরজ হওয়ার আরো একটি কারণ হচ্ছে হাইদ্ব বা নিফাস বন্ধ হয়া। মহিলাদের ঋতুস্রাব (হাইদ্ব) অথবা সন্তান প্রসব সংলগ্ন স্রাব (নিফাস) বন্ধ হবার পর পবিত্রতা হাসিলের জন্য গোসল করতে হয় এবং এটাও ফরজ গোসল। এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে ইরশাদ হচ্ছে..

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)

পটভূমিঃ ইয়াহুদ সমাজে ঋতুবতী নারী সম্পর্কে নানা কুসংস্কারের প্রচলন ছিল। কিছু মানুষ তাদের সম্পূর্ণ আলাদা করে দিত আর কেউ কেউ বায়ুপথে সঙ্গম করত। সাহাবাগণ তাদের করণীয় সম্পর্কে জানতে চাইলে নাযিল হয়..

(হে নবী!) লোকজন তোমার কাছে ঋতুবতী নারী সম্পর্কে জানতে চায়, বলেদাওঃ এটা বড়ই নোংরা/কষ্টকর (অবস্থা।) সুতরাং স্রাব চলাকালীন সময়ে তোমরা নারী (সঙ্গম) থেকে বিরত থাকবে, (স্রাব থেকে) পবিত্র হওয়া পর্যন্ত (সঙ্গমের জন্য) তাদের কাছে যাবে না। তারা যখন (স্রাব থেকে) উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তাদের সাথে সঙ্গম করবে আল্লাহর নির্দেশিত পথে (তথা যোনি পথে, মলদ্বারে নয়। আর স্রাব অবস্থায় সঙ্গম করে ফেললে তাওবাহ করবে) নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা তাওবাহ করে, আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করে। (২ বাক্বারাহঃ ২২২)

আইন ও বিধানঃ ঋতুকালে নারীর যোনি নোংরা থাকে, এ অবস্থায় সঙ্গম করলে নানা রোগের সৃষ্টি হয়। ঋতুবতী নারীর সাথে সঙ্গম করা বৈধ নয়। তবে সঙ্গম ব্যতীত অন্যসব (যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন, ইত্যাদি) বৈধ আছে। রক্তস্রাব পরিপূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেলে (তথা সাদা স্রাব দেখা গেলে) নারী প্রথমে গোসল করবে এবং এ গোসল নারীর ফরজ দায়িত্ব। গোসলের পর ওই নারীর সাথে সহবাস করা যাবে। ঋতুবতী নারীর সাথে সহবাস করলে ১ দিনার (৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ বা সমমূল্য) বা আধা দিনার সাদাক্বাহ দিতে হয়। স্বামী-স্ত্রী সহবাসকালে ইচ্ছামত নানা পদ্ধতি গ্রহণ করে আনন্দ করা অবৈধ নয়। তবে সঙ্গম করতে হবে যোনি পথে, মলদ্বারে সঙ্গম করা বৈধ নয়।

গোসলের পদ্ধতিঃ পবিত্রতা হাসিলের নিয়তে সমস্ত শরীর ধৌত করার নাম গোসল।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ হানাফী মতে গোসলে কুল্লি করতে হয় এবং নাকে পানি দিতে হয়, এ ছাড়া গোসল শুদ্ধ হয় না। হানাফী মতে নিয়ত না করলেও গোসল হয়ে যায়। অন্য তিন ফিক্বহ মতে গোসলে নিয়ত করা ফরজ। তবে কোনো কোনো ফিক্বহ মতে কুল্লি করা বা নাকে পানি দেওয়া ফরজ নয়।

গোসলের সুন্নাহ পদ্ধতিঃ প্রথমে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে তারপর যৌনাঙ্গ ধৌত করবে তারপর অযু করবে তারপর সমস্ত শরীর ধৌত করবে। বর্ণিত হচ্ছে..

عن عائشة رضي الله عنها **:كانَ رَسولُ اللهِ** صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ **إذا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ المَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حتَّى إذَا رَأَى أنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.**

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, জানাবতের গোসল করতে গিয়ে রাসূল সা. প্রথমে উভয় হাত (কব্জি পর্যন্ত) ধৌত করতেন তারপর ডান হাতে পানি ঢেলে বাম হাত দিয়ে ঘষিয়ে লজ্জাস্থান ধৌত করতেন তারপর সালাতের অযুর মত অযু করতেন তারপর এক হাতে পানি ঢেলে অন্য হাতের আঙ্গুল দিয়ে চুলের গোঁড়ায় পানি পৌঁছাতেন, যখন নিশ্চিত হয়ে যেতেন যে চুলের গোঁড়ায় পানি পৌঁছেগেছে তখন তিনবার মাথায় পানি ঢালতেন তারপর সমস্ত শরীর ধৌত করতেন এবং সবশেষে উভয় পা ধৌত করতেন। (মুসলিমঃ ৩১৬)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ ফরজ গোসলের সময়ে মাথার চুল ধৌত করার ব্যাপারে পুরুষ ও নারীর ব্যাপারে বিধানের ভিন্নতা রয়েছে। চুল যেহেতু নারীর সৌন্দর্যের বাহার তাই এ ব্যাপ্রে নারীকে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। ফরজ গোসলের সময়ে পুরুষকে মাথার চুল খুলে ধৌত করতে হবে আর নারীগণ ইচ্ছা করলে চুল না ভিজিয়ে শুধু মাথা ধুয়ে নিলেই চলবে। বর্ণিত হচ্ছে..

لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم **فقالت :إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ :لا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ** .أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.

উম্মু সালামাহ রা. একদা রাসূল সা.কে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বললেনঃ আমি সাধারণত আমার মাথার চুলকে শক্ত বেনী করে রাখি। জানাবতের গোসলের জন্য কী আমার চুল খুলতে হবে? রাসূল সা. বললেনঃ না.. (তোমার চুলের বেনী খুলতে হবে না। বরং) তুমি তিনবার মাথায় পানি ঢালবে অতঃপর শরীর ধৌত করবে, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট আর এভাবেই তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। (মুসলিম) **বিঃ দ্রঃ =** অযু ও গোসলে পবিত্রতা হাসিলের জন্য পানি ব্যবহার করা হয়।

৩য় পাঠঃ তায়াম্মুম

আমাদের উপর আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হলো পানি ব্যবহারে সক্ষম না হলে অযু বা গোসলের বদলে তায়াম্মুম করা। মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

আর তোমরা যদি অসুস্থ হও অথবা সফরে থাকো আর মলমূত্র ত্যাগ করে (অযুর জন্য) অথবা নারী স্পর্শ করে (তথা সঙ্গম করে গোসলের জন্য) পানি না পাও (অথবা পানি ব্যবহারে সক্ষম না হও) তবে (অযু ও গোসলের বদলে) পবিত্র স্বাঈ'দ (পৃথিবীর উপরি ভাগ, মাটি বালু পাথর, ইত্যাদি) দিয়ে তায়াম্মুম করবে তথা মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করবে। (৫ মাইদাহঃ ৬)

তায়াম্মুম করার সুন্নাহ পদ্ধতিঃ তায়াম্মুম দুই ভাবে বা দুই পদ্ধতিতে করা যায়। যথা..

১ম পদ্ধতিঃ তায়াম্মুমের নিয়তে মাটিতে একবার হাত স্পর্শ করে ওই হাত দিয়ে মুখ মণ্ডল ও দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করবে। এ তায়াম্মুম-ই পবিত্রতা হাসিলের জন্য যথেষ্ট। বর্ণিত হচ্ছে..

وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما **قال :بعثني النبي ﷺ في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقال : إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه** (متفق عليه، واللفظ لـ مسلم.

আ'ম্মার বিন ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূল সা. আমাকে এক কাজে পাঠালেন, এক পর্যায়ে আমি জুনুবী হয়ে গেলাম আর (গোসল করার জন্য) পানিও খুঁজে পেলাম না। (তায়াম্মুমের ব্যাপারে আমার জানা ছিল কিন্তু তায়াম্মুমের পদ্ধতি জানা ছিল না) তাই আমি স্বাঈদ (পৃথিবীর উপরি ভাগ তথা মাটি বা বালি)র মধ্যে এমনভাবে গড়াগড়ি খেলাম যেমন গড়াগড়ি খায় দাব্বাহ (পশু/কীট। তারপর সালাত আদায় করলাম) ফিরে এসে রাসূল সা.র কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করলাম। তিনি বললেনঃ তোমার জন্য এমন করাই যথেষ্ট হত (এই বলে) তিনি উভয় হাত একবার মাটিতে রাখলেন তারপর এক হাত দিয়ে অন্য হাত কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করলেন এবং মুখ মণ্ডল মাসেহ করলেন।
(বুখারী ও মুসলিম)

২য় পদ্ধতিঃ তায়াম্মুমের নিয়তে মাটিতে হাত স্পর্শ করে এ হাত দিয়ে মুখ মণ্ডল মাসেহ করবে, পুনরায় মাটিতে হাত স্পর্শ করে এ হাত দিয়ে দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করবে। এটা হলো তায়াম্মুমের ২য় পদ্ধতি। বর্ণিত হচ্ছে..

عن ابن عمر رضي الله عنهما **قال :قال رسول الله** صلى الله عليه وسلم **التيمُّم ضربتانِ :ضربةٌ للوجه وضربةٌ لليدين إلى المِرْفقينِ؛** رواه الدارقطني

ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ তায়াম্মুম হচ্ছে দুইবার হাত মারা। ১ বার মুখ মণ্ডল মাসেহ করার জন্য আর ১ বার দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার জন্য।

সূত্রঃ দার কুতনী। হাদীছটি দুই ভাবে বর্ণিত হয়েছে। (১) মারফু' সনদে রাসূল সা.র বাণী হিসেবে (২) মাওকুফ সনদে আব্দুল্লাহ বিন উমর রা.র বাণী হিসেবে। মারফু' সনদে হাদীছটি দ্বাইফ, মানে বিধান প্রমাণের জন্য নির্ভরযোগ্য নয়। আর মাওকুফ সনদে (আব্দুল্লাহ বিন উমর রা.র বাণী হিসেবে) সাহীহ।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ

- তায়াম্মুমের ২য় পদ্ধতিটি হচ্ছে হানাফী, শাফিয়ী' এবং মালিকী ফিক্বহের ইমামগণের পছন্দনীয় পদ্ধতি।
- ইমাম আহমাদ রাহিঃ তায়াম্মুমের ১ম পদ্ধতিতে পছন্দ করেছেন এবং বলেছেন এটাই যথেষ্ঠ।

- পানি না পেলে বা পানি ব্যবহারে সক্ষম না হলে অথবা পানি ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হলে অযু ও গোসলের বদলে তায়াম্মুম করতে হয়।
- মাটি, বালি, পাথর অথবা এসব দিয়ে বানানো বস্তু (ইট, টাইলস, দেয়াল ইত্যাদি) দিয়ে তায়াম্মুম করা যায়।
- অযু ও গোসলের তায়াম্মুম এক-ই রকম হয় এবং একই ভাবে করতে হয়, শুধু নিয়ত ভিন্ন।
- অযু, গোসল ও তায়াম্মুমের মাধ্যমে মানুষের শরীর পবিত্র হয়। আর সালাত আদায়ের জন্য শরীরে পোশাক এবং সালাত আদায়ের স্থান ও পবিত্র হতে হয়। এমনকি জুতা বা মোজা পরিধানরত অবস্থায় সালাত আদায় করলে শরীরে লেগে থাকা জুতা এবং মোজাও পবিত্র হতে হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ নাজাসাত

নাজাসাত পরিচিতিঃ নাজাসাত অর্থ নাপাক, অপবিত্র। ইসলামী রীতি মতে এমন কিছু ইবাদাত রয়েছে যা পালন করার সময়ে পবিত্রতা হাসিল করতে হয় তথা পবিত্র হয়েই এসব কাজ করতে হয়। যেমন..

- সূরাহ মাইদাহর ৬ষ্ঠ আয়াতে অযু, গোসল ও তায়াম্মুমের কথা বলা হয়েছে
- সূরাহ মুদ্দাচ্ছিরের ৪র্থ আয়াতে কাপড়/পোশাক পবিত্র করার কথা বলা হয়েছে,
- হাদীছে যমীন পাক এবং জোতা পাকের কথা বলা হয়েছে, ইত্যাদি।।

নাজাসাতের প্রকার ভেদঃ নাজাসাত সাধারণত দুই প্রকার হয়ে থাকে। যথা..

- **নাজাসাত হাক্কিক্বী বা আসল নাজাসাতঃ** ইসলামী শারীয়া'হ যে সব বস্তুকে বস্তুগত ভাবে নাপাক হিসেবে চিহ্নিত করেছে এসব বস্তু হলো নাজাসাত হাক্কিক্বী বা আসল নাজাসাত। (যেমনঃ পেশাব, পায়খানা)
- **নাজাসাত হুকমী বা বিধানগত নাজাসাতঃ** যে বস্তু আসলে নাজাসাত নয় তবে বিশেষ ইবাদাতের জন্য বিশেষ ভাবে পাক করতে হয় একে বলা হয় নাজাসাত হুকমী তথা বিধিবদ্ধ অপবিত্র। (যেমনঃ জুনুবী মানুষ)

নাজসাত হাক্কিক্বীর বিধানঃ নাজাসাত হাক্কিক্বী বস্তুটি নিজেও অপবিত্র এবং অন্যকেও অপবিত্র বানায় অর্থাৎ ওই বস্তু যেখানে লাগে সেখানকেও অপবিত্র বানিয়ে ফেলে। এমনকিছু লাগানো শরীর, কাপড় বা স্থান অপবিত্র হিসেবেই বিবেচিত হবে। যেমন বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم **فقالت يا رسول الله؛ إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، فقالت فإن لم يخرج الدم؟ قال :يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره** .رواه أبو داود وأحمد، وصححه الألباني.

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, একদা খাওলাহ বিনত ইয়াসার রা. নবী সা.'র কাছে এসে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি মাত্র কাপড় আছে, আমি স্রাব অবস্থায়ও ওই কাপড়ই পরিধান করে থাকি (এবং কাপড়ে প্রায়ই স্রাবের রক্ত গেলে যায়) এখন আমি কী করব? নবী সা. বললেনঃ স্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পর তুমি কাপড়টি ধোয়ে নেবে অতঃপর এ কাপড় পরেই সালাত আদায় করবে। খাওলাহ বললেনঃ রক্তের দাগ যদি না যায়? নবী সা. বললেনঃ রক্ত ধোয়ে ফেলাই যথেষ্ট হবে, রক্তের দাগ কোনো ক্ষতি করবে না।

(আবু-দাউদ, আহমদ। হাদীছটি সাহীহ)

নাজাসাত হাক্কিকী যুক্ত বস্তু নিয়ে সালাত শুদ্ধ হবে না। যেমন বর্ণিত হচ্ছে..

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ، أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ، قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ جِبْرِيلَ ﷺ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى وَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا.

رواه أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وأبو داود في السنن قال عنه الحاكم في المستدرك :هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذهبي، كما صححه الألباني

আবু-সাঈদ আল-খুদরী রা. বলেনঃ একদা রাসূল সা. (সাহাবাদেরকে নিয়ে) সালাত আদায় করছিলেন (উল্লেখ্য তখনকার দিনে নবী সা. এবং সাহাবাগণ জোতা পায়ে রেখেই মসজিদে স্বালাত আদায় করতেন। সেদিন স্বালাতরত অবস্থায়-ই) হঠাৎ তিনি পায়ের জোতা খুলে বাম পাশে রেখে দিলেন। রাসূল সা.'র কান্ড দেখে অন্যরাও নিজ নিজ জোতা খোলে ফেললেন। সালাত সমাপ্ত করার পর রাসূল সা. জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কেন জোতা খোলে রেখেছো? লোকজন বললঃ আমরা দেখলাম আপনি জোতা খোলে ফেলেছেন তাই আমরাও খুলেছি। রাসূল সা. বললেনঃ জীবরীল আ. এসে আমাকে বললেনঃ আমার জোতার নীচে নাপাকি রয়েছে তাই আমি খুলে ফেলেছি। অতঃপর রাসূল সা. বললেনঃ তোমরা যখন মসজিদে আসবে তখন জোতার তলা দেখে নিবে, তাতে কোনো নাপাকি দেখলে মুছে নেবে এবং এ জোতা পরেই সালাত আদায় করবে। (আহমদ, আবু-দাউদ। হাদীছটি সাহীহ)

বিঃ দ্রঃ = জোতা পায়ে মসজিদে যাওয়া এবং জোতা পায়ে সালাত আদায় করা সাহাবাদের সময়ে সাধারণ রীতি ও প্রথা ছিল।

উল্লেখ্য প্রতিটি হাক্কিক্বী নাজাসাতই অপবিত্র হয়ে থাকে এবং এসব নাজাসাত যে বস্তুতে যুক্ত হয় বা মিশ্রিত হয় বা যে বস্তুর সাথে লেগে যায় এসব বস্তুও অপবিত্র হয়ে যায়। এমন সব অপবিত্র বস্তুকে ধোয়ে পবিত্র করতে হয় আর ধোয়া সম্ভব না হলে (যেমন যমীন, কার্পেট, ইত্যাদি) অপবিত্র স্থানে পানি ঢালতে হয় অথবা ঘষে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিতে হয়।

দিরহাম পরিমাণঃ প্রতিটি নাজাসাত-ই এক দিরহাম পরিমাণ মাফ হয়ে থাকে। অর্থাৎ শরীরে বা কাপড়ে অথবা অন্য কোথাও নাজাসাত লেগে থাকলে এটা যদি দিরহাম পরিমান বা এরচেয়ে কম হয় তবে এটা মাফ হয়ে থাকে মানে এ বস্তুকে নাপাক হিসেবে ধরা হয় না। আর এরচেয়ে বেশী হলে নাপাক হিসেবে ধরা হয়। ফিক্বহী কিতাবাদিতে এমন একটি বিধান পাওয়া যায়। তবে এর দলীল খুঁজতে গিয়ে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। দলীল হিসেবে যা পেয়েছি তা আপনাদের সামনে পেশ করা হল..

ومن أهل العلم من قدر ذلك بقدر الدرهم وحجتهم حديث أخرجه الدارقطني في سننه عن روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال تعاد الصلاة في قدر الدرهم من الدم وفي لفظ إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة.

قال البخاري رحمه الله :حديث باطل، وروح هذا منكر الحديث .وقال ابن حبان رحمه الله :هذا حديث موضوع لا شك فيه لم يقله رسول الله - ﷺولكن اخترعه أهل الكوفة وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات .وذكره ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেছেনঃ (কোনো ব্যক্তি যদি তার শরীরে বা কাপড়ে রক্ত নিয়ে সালাত আদায় করে তবে) রক্ত দিরহাম পরিমাণ হলে সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। (আর দিরহামের চেয়ে কম হলে পুনরায় পড়তে হবে না) অন্য বর্ণনায় এসেছেঃ কাপড়ে যদি দিরহাম পরিমাণ রক্ত লেগে থাকে তবে কাপড় ধৌত করে পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে। (দার ক্বুতনী। ইমাম বুখারী বলেছেন হাদীছটি বাতিল। ইমাম ইবনু হিব্বান বলেছেনঃ মাওযূ'। তিনি বলেছেন এটা কুফাবাসীর রটনা। ইবনু-ল-জাওযীও হাদীছটিকে মাওযূ' বলেছেন।)

আসলে উল্লেখিত হাদীছটি দলীল হবার যোগ্য নয়। তবে মুখতাস্বার আল-ত্বাহাওয়ী এবং কিতাবু-ল-আছার ইত্যাদি কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখা হয়েছেঃ দিরহামের পরিমাণ আসলে (হাদীছ থেকে নয় বরং) কিয়াস থেকে নেওয়া হয়েছে। আর কিয়াসটি হলঃ পায়খানা করার পর পাথর বা মাটির ঢিলা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা যায় বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আর এমনভাবে পবিত্রতা অর্জন করলে মলদ্বারে অপবিত্রতার প্রলেপ বা চিহ্ন থেকে যায়। যে অংশটির আয়তন সাধারণত দিরহাম পরিমাণ হয়ে থাকে। যারা আরবী বুঝেন উনাদের জন্য এর আরবী ইবারাত নিম্নে পেশ করা হল..

في شرح مختصر الطحاوي للرازي وأما مقدار الدرهم فإنه تقدير لموضع الاستنجاء لأنهم كانوا يستنجون ويستبرؤن فقدروا الموضعين جميعا بالدرهم وهذا اجتهاد قال إبراهيم النخعي أرادوا أن يقولوا مقدار المقعدة فاستفحشوا فقالوا مقدار الدرهم (انتهى .بواسطة حاشية أبي الوفاء الأفغاني على كتاب الآثار لمحمد بن الحسن.(408 \1)

নাজাসাত হুকমীর বিধানঃ নাজাসাত হুকমী নিজে অপবিত্র হলেও অন্যকে অপবিত্র বানায় না অর্থাৎ জুনুবী ব্যক্তি আসলে অপবিত্র নয় বরং শুধুই বিধানগত কারণে তাকে অপবিত্র ধরা হয়। তাই তাকে স্পর্শ করলে অন্য কেই বা অন্যকিছু অপবিত্র হবে না। যেমন আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28)

মুঅমিনগণ! (শোনো! কাফির) মুশরিকরা অবশ্যই অপবিত্র। তাই (তোমরা এমন ব্যবস্থা নেবে) যেন এ বছরের পর তারা আর মাসজিদ হারামের (তথা মক্কার) কাছে আসতে না পারে। আর তোমরা (যদি মনে কর এমন ব্যবস্থা নেওয়ার কারণে তোমাদের পর্যটন ও ব্যবসা-বানিজ্য কমে যাবে এবং এর ফলে তোমরা) অভাব-অনটনে পড়ে যাবে তবে (জেনে রাখো!) আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজ দয়ায় তোমাদেরকে ধনী বানিয়ে দিতে পারেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী। (৯ তাওবাহঃ ২৮)

আইন ও বিধানঃ কাফির ও মুশরিকরা আইনগতভাবে নাজাস তথা অপবিত্র। তাদের জন্য মসজিদু-ল-হারাম তথা মক্কার সীমানায় প্রবেশ করা নিষিদ্ধ এবং তাদেরকে মক্কার সীমানা থেকে ফিরিয়ে রাখা ইসলামী সরকার ও মুসলিম সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ মুশরিকরা নাজাস হলেও তাদের এ নাজাসাত বা অপবিত্রতা শুধুই বিধানগত। তারা নাজাসু-ল-আইন বা নাজাসাত হাক্বিক্বী তথা বস্তুগত নাপাক নয়। তাই তো কোনো মুশরিকের সাথে করমর্দন অথবা কোনো মুশরিকের স্পর্শ বা ছোঁয়া আপনাকে অপবিত্র বা নাপাক বানাবে না।

জ্ঞাতব্যঃ আজকাল মুসলিম নামধারী অনেক ব্যক্তি বা দেশ দরিদ্রতার ভয়ে কাফির ও কুফরকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। আসলে তাদের উচিত ছিল শুধু-ই আল্লাহর উপর ভরসা করা।

কয়েকটি হাক্বিক্বী নাজাসাতঃ নিম্নে কয়েকটি হাক্বিক্বী নাজাসাতের তালিকা এবং বিধান উল্লেখ করা হল..

১. রক্তঃ রক্ত বলে এখানে বুঝানো হয়েছে মানুষ অথবা পশুপাখির শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত রক্ত এবং এসবের মাংসের সাঙ্গে মিশে থাকা রক্ত। জলজ প্রাণী অথবা কীটপতঙ্গের দেহের রস আসলে রক্ত নয়।

রক্ত মুলত একটি অপবিত্র বস্তু তথা নাজাসাত হাক্বিক্বী। রক্ত বস্তুটি অপবিত্র এবং এটি অন্য বস্তুকেও অপবিত্র করে ফেলে। শরীরে, কাপড়ে বা অন্যকিছুতে রক্ত লাগলে যে অংশে রক্ত লাগবে ওই অংশ অপবিত্র হয়ে যাবে এবং পবিত্রতা হাসিলের জন্য এ রক্ত ধোয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তবে মূল রক্ত ধোয়ে ফেলার পর রক্তের দাগ লেগে থাকলে সমস্যা নেই। যেমনটি বলা হয়েছে একটু উপরে থাওলাহ বিনত ইয়াসার বর্ণিত আবু-দাউদ ও আহমদের হাদীছে।

২. পেশাবঃ মানুষের পেশাব মুলত অপবিত্র বস্তু তথা নাজাসাত হাক্বিক্বী। এ ব্যাপারে বর্ণিত হচ্ছে..

وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ استَنْزِهُوا من البول فإنَّ عامَّة عذاب القبر منه . رواه الدَّارقطني.وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد.

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ তোমরা পেশাব থেকে সাবধান থাকবে। কারণ সাধারণত এজন্য কবরে আযাব হয়ে থাকে। (দার ক্বুতনী, হাকিম। হাদীছটি সাহীহ) উল্লেখ্য হারাম প্রাণীর পেশাবকেও মানুষের পেশাবের মত নাজাসাত হিসেবে ধরা হয়।

পেশাব করার আদবঃ সাধারণত বসে পেশাব করতে হয়। এটা হচ্ছে পেশাব করার আদব। নবী সা. এবং সাহাবাগণ সাধারণত বসেই পেশাব করতেন। বর্ণিত হচ্ছে..

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا **قَالَتْ :مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺبَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا جَالِسًا** .رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُد، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ :هُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ.

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ কেও যদি তোমাদেরকে বলে যে নবী সা. দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন তবে তাকে বিশ্বাস করবে না। তিনি কেবল বসেই পেশাব করতেন। (আবু-দাউদ ছাড়া বাকি ৫টি কিতাবে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে)

তবে প্রয়োজনে দাড়িয়েও পেশাব করা যায়। যেমন বর্ণিত হচ্ছে..

وَعَنْ حُذَيْفَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ ﷺانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، فَتَنَحَّيْتُ، فَقَالَ :ادْنُهْ، فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ .رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

হুজাইফাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. একদা আবর্জনা ফেলার জায়গায় গেলেন এবং দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। (আমি পানির পাত্র নিয়ে পিছে পিছে যাচ্ছিলাম। তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করছেন দেখে) আমি একটু পিছনে চলে এলাম। (পেশাব শেষ করার পর) তিনি বললেনঃ কাছে আসো। আমি কাছে এসে উনার দুই গোড়ালির মধ্যখানে দাড়ালাম। (আমি পানি ঢেলে দিলাম) তিনি অযু করলেন এবং উভয় মোজা মাসেহ করলেন। (বুখারী, মুসলিমসহ প্রায় সকল কিতাবেই হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে)

৩. পায়খানাঃ মানুষের পায়খানা ও মুলত হাক্কিকী নাজাসাত হিসেবে গণ্য হয়। কারণঃ পায়খানা করার পর এটাকে পরিষ্কার করার তাগিদ দিয়ে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে কুরআনেও আয়াত নাযিল হয়েছে। তাই কুরআন ও হাদীছের ইঙ্গিত থেকে এমনই বুঝা যায়।

৪. মনি বা বীর্যঃ আসলে বীর্য পবিত্র না অপবিত্র এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি, নবী সা.র সুন্নাহ বা হাদীছ থেকে স্পষ্ট কিছু পাওয়া যায়নি, এমনকি রাসূল সা. কোনো সাহাবাকে বীর্য ধোয়ে পাক করার আদেশ দিয়েছেন বলেও কোনো হাদীছে পাওয়া যায় না। এবং সাহাবাদের থেকেও কোনো ঐক্যমত্য পাওয়া যায়নি। তাই বিষয়টি নিয়ে ফিক্বহী ইমামদের দ্বিমত পরিলক্ষিত। ইমাম শাফিয়ী' ও ইমাম আহমাদ বীর্যকে পবিত্র বলেছেন। কারণ মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (54)

আর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন পানি (বীর্য) থেকে তারপর ঠিক করে দিয়েছেন রক্ত সম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্ক, তোমার প্রভু (সর্ববিষয়ে) ক্ষমতাবান। (২৫ ফুরক্বানঃ ৫৪)

বিশ্লেষণঃ এ আয়াতে এবং আরো অনেক আয়াতে বীর্যকে পানি বলা হয়েছে আর পানি সাধারণত পবিত্র বস্তু, তাই বীর্য ও পবিত্র। এছাড়া পবিত্র কুরআনের কোথায় স্পষ্ট ভাবে বীর্যকে অপবিত্র বলা হয়নি এমনকি রাসূল সা. থেকে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীছেও স্পষ্ট করে বীর্যকে অপবিত্র বলা হয়নি এবং এ ব্যাপারে সাহাবাদের কোনো ইজমা ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই বীর্যও পবিত্র হবে।

আর ইমাম আবু-হানীফাহ ও ইমাম মালিক রাহিঃ বীর্যকে অপবিত্র বলেছেন। তবে ইমাম মালিকের মতে বীর্য ধোয়ে পাক করতে হবে, ধোয়ে সাফ না করলে বীর্য পাক হবে না। কারণ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

عن عائشة رضي الله عنها **قالت :كُنْت أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَخْرُجُ إلَى الصَّلاةِ وَإِنَّ بُقْعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ (متفق عليه.**

আ'ইশাহ রা. বলেনঃ আমি রাসূল সা.'র (কাপড় থেকে) জানাবতের চিহ্ন তথা বীর্য ধোয়ে দিতাম আর তিনি ওই কাপড় নিয়েই সালাতে চলে যেতেন। তখনো উনার কাপড়ে পানি গেলে থাকতো। (বুখারী ও মুসলিম)

আর ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃর মতে কাপড়ে বা শরীরে তরল বীর্য গেলে থাকলে ধোয়ে পাক করতে হবে আর বীর্য শুকিয়ে গেলে আর ধোঁয়া লাগবে না বরং রগড়ে নিলেই পাক হয়ে যাবে। কারণ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

عن عائشة رضي الله عنها **قالت :لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرْكاً، فَيُصَلِّي فِيهِ(مسلم).**

আ'ইশাহ রা. বলেনঃ আমি রাসূল সা.'র (কাপড় থেকে) বীর্য ডলে দিতাম আর তিনি ওই কাপড় নিয়েই সালাত আদায় করতেন। (মুসলিম)

৫. মাযীঃ মাযী বা মযী বের হলে গোসল করতে হয় না, শুধু অযু করলেই হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে..

ما رواه أبو داود في سننه **عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر من الاغتسال فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها ثوبك حيث تُرى أي تظنّ أنه أصابه** ورواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح

সাহাল বিন হানীফ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার খুব বেশী মযী বের হত এবং এজন্য আমি খুব বেশী গোসল করতাম। আমি একদা এ ব্যাপারে রাসূল সা.কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ এজন্য অযু করাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমার কাপড়ে লেগে যায়? তিনি বললেনঃ যেখানে দেখবে বা লেগেছে বলে মনে করবে একহাতে পানি নিয়ে সেখানে মেরে দেবে আর এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। (তিরমিযী। তিনি বলেছেন হাদীছটি হাসান, সাহীহ)

৪র্থ পাঠঃ হাইদ্ব, নিফাস ও ইস্তিহাদ্বা

প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর জড়ায়ু থেকে যোনি পথ দিয়ে মাঝে মাঝে রক্ত জাতীয় কিছু পদার্থ বের হয়। এটা আল্লাহ্ প্রদত্ব এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে নারী জড়ায়ু স্বয়ংক্রিয়ভাবে সন্তান ধারণের জন্য তৈরি হয়।
নারীর যোনি পথ দিয়ে বের হওয়া এসব পদার্থ অপবিত্র হয়ে থাকে এবং ইসলামী শারীয়া'হর বিধান মতে ওই সময় ওই নারীর জন্য বেশ কিছু কাজ করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। শারীরিক পবিত্রতা আবশ্যক এমন কাজকর্মের বিধান বর্ণনার সুবিধার্থে নারী পথ দিয়ে নির্গত এসব রক্তকে ৩টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথাঃ হাইদ্ব, নিফাস ও ইস্তিহাদ্বা।

হাইদ্ব পরিচিতিঃ নারী জড়ায়ু থেকে সাধারণত প্রতি মাসে পচা রক্তের মত এক প্রকার পদার্থের স্রাব বের হয়। এমন স্রাবকে আমরা বলি মাসিক স্রাব বা ঋতুস্রাব। আরবীতে এটাকে হাইদ্ব বলা হয় আর ইংরেজিতে বলা হয় ম্যান্স বা পিরিয়ড।

হাইদ্বের আসল রহস্যঃ পুরুষের প্রজনন যন্ত্রসমূহের মাঝে বিশেষ দুটি কোষ রয়েছে, যেগুলোকে আমরা অণ্ডকোষ বলে থাকি। ঠিক তেমনিভাবে নারীর প্রজনন যন্ত্রসমূহের মাঝেও বিশেষ দুটি কোষ থাকে। নারীর কোষ দুটিকে বলা হয় ডিম্বকোষ।
পুরুষের অণ্ডকোষ যৌন উত্তেজনার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সচল হয় এবং বীর্য তৈরি করে। পুরুষের বীর্যে থাকে হাজার হাজার বীর্যকীট। সহবাসের সময় এ বীর্যকীটগুলো নারী জড়ায়ুতে প্রবেশ করে সেখানে অবস্থান নেয় এবং নারী ডিম্বকে খুঁজতে থাকে। পুরুষের এসব বীর্যকীট ৩/৪দিন পর্যন্ত নারী জড়ায়ুতে জীবিত থাকে।

আর নারীর ডিম্বকোষ দুটি প্রতি মাসের নির্ধারিত সময়ে স্বয়ংক্রিয় ভাবে একবার সচল হয় এবং হাজার হাজার ডিম্বাণু তৈরি করে বিশেষ রগের মাধ্যমে জড়ায়ুতে প্রেরণ করে। এসব ডিম্বাণু সঞ্চালনের সময় অনেক নারীরই পেটে প্রচন্ড ব্যাথা অনুভূত হয়। (উল্লেখ্য এ ব্যাথার কোনো চিকিৎসা নেই। একমাত্র পেইন কিলার ঔষধ সেবন করে এ ব্যাথার যন্ত্রণা থেকে সাময়িক পরিত্রাণ পাওয়া যায়।) নারীর এ ডিম্বাণুগুলো জড়ায়ুতে যাবার পর ৩/৪ দিন জীবিত থাকে।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ পুরুষ যে ভাবে নারীর প্রতি আসক্ত থাকে ঠিক তদ্রূপ পুরুষের বীর্যকীটও নারী ডিম্বাণুর প্রতি আসক্ত থাকে। তাই যৌন মিলনের পর পুরুষের বীর্যকীট নারী জড়ায়ুতে গিয়ে নারী ডিম্বাণু খুঁজতে থাকে এবং এর সন্ধান পাওয়ামাত্র আবরণ ছেদ

করে সোজা ভিতরে ঢুকে যায়। নারীর ডিম্বাণু এবং পুরুষের বীর্যকীটের মিলনেই জড়ায়ুতে তৈরি হয় নতুন মানব ভ্রূণ। এটা হচ্ছে মহান আল্লাহর এক নিপুণ কারিগরি।

৩/৪ দিন পর এসব নারী ডিম্বাণু জড়ায়ুতেই মরে যায় এবং পচে যায়। তারপর এ পচা ডিম্বগুলোই এক সময় যোনি পথ দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসে। আর এটাকেই আমরা হাইদ্ব বা ঋতুস্রাব বলে থাকি।
এছাড়া নারী জড়ায়ু প্রতি মাসে সন্তান ধারণের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন করে প্রস্তুত হয়। প্রতি মাসেই জড়ায়ুতে একটি শক্ত আবরণ তৈরি হয় যেন ভ্রূণ তৈরি হলে একে শক্ত করে ধরে রাখা যায় এবং জড়ায়ু ও সন্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। মাস শেষে ভ্রূণ তৈরি না হলে ওই আবরণ ফেটে যায় এবং এর তরল ঝিল্লিসমূহ নষ্ট হয়ে স্রাবের সঙ্গে বের হয়ে আসে।

হাইদ্বের সময়কালঃ হাইদ্ব বা ঋতুস্রাবের সময়কাল নিয়ে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই। তাই এ বিষয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানার জন্য সঙ্গত কারণেই আমাদেরকে হাদীছ খুঁজতে হবে।
কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারে হাদীছের বর্ণনাও সুস্পষ্ট নয়। তাই শারীয়া'হর মূল দুটি উৎসে বিষয়ে নিস্পত্তি করতে না পেরে আমাদেরকে ফিক্বহের শরণাপন্ন হতে হয়।
যেহেতু কুরআন বা হাদীছে বিষয়টি অকাট্ট ভাবে বর্ণিত হয়নি। তাই বিষয়টি নিয়ে ভিন্ন মতের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং ফিক্বহী ইমামগণের মাঝে ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণত ৩টি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন..

- হাইদ্বের সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে ৩ দিন আর সর্ব উচ্চ সময় হচ্ছে ১০ দিন। (এ দিন বলে ২৪ ঘন্টার দিন বুঝানো হয়েছে) এ অভিমতটি ইমাম আবু-হানীফাহ এবং উনার শিষ্যদের। যদিও উনার এক শিষ্য আবু-ইউসুফ বলেছেন সর্ব নিম্ন আড়াই দিনের বেশী সময় স্রাব হলেই এটাকে হাইদ্ব হিসেবে ধরে নেওয়া হবে। হানাফী মতে উল্লেখিত সময়ের চেয়ে কম বা বেশী হলে এটাকে হাইদ্ব হিসেবে ধরা হবে না বরং ইস্তিহাদ্বা হিসেবে গণ্য করা হবে।
- হাইদ্বের সর্ব নিম্ন কোনো সময় নির্ধারিত নেই। অতি সামান্য রক্তস্রাব হলেও এটাকে হাইদ্ব হিসেবে ধরা হবে। আর হাইদ্বের সর্ব উচ্চ সময় হচ্ছে ১৫ দিন। এ মতটি ইমাম মালিক রাহিঃর। কোনো নারীর ১৫ দিনের বেশী স্রাব হলে ওই অতিরিক্ত স্রাবকে ইস্তিহাদ্বা হিসেবে ধরা হবে।
- হাইদ্বের সর্বনিম্ন সময় ১ দিন আর সর্বউচ্চ সময় হচ্ছে ১৫ দিন। ইমাম শাফিয়ী' এবং ইমাম আহমাদ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উনাদের মতে ১৫ দিনের বেশী স্রাব হলে ওই অতিরিক্ত স্রাবকে ইস্তিহাদ্বা হিসেবে ধরা হবে।
- হাইদ্ব তথা ঋতুস্রাবের সময়কাল নিয়ে ইমামগণের এমন ভিন্নমত আসলে সাহাবী ও তাবিয়ীগণ থেকে পাওয়া বিভিন্ন তথ্যের কারণে তৈরি হয়েছে।
- প্রায় মহিলাদেরই ঋতুস্রাবের একটা নির্ধারিত দিন থাকে। মানে সাধারণত প্রতিবারে এতোদিন স্রাব হয়ে থাকে। ফিক্বহী পরিভাষায় এটাকে বলা হয় স্রাব সম্পর্কে ওই নারীর আদত বা অভ্যাস। যে নারীর যতদিন আদত থাকে ওই এতোদিনই হাইদ্ব ধরবে। মানে ওই নারীর যদি কখনো নির্ধারিত দিনে স্রাব বন্ধ না হয় তবে সে তার অভ্যাসগত দিনই হাইদ্ব হিসেবে ধরবে আর বাকি দিন ইস্তিহাদ্বা হবে।
- তবে অভ্যাস পরিবর্তন হতে পারে, অভ্যাসে পরিবর্তন ঘটলে নতুন অভ্যাস ধর্তব্য হবে আর পুরাতন অভ্যাস বাতিল হয়ে যাবে।

ঋতুস্রাবের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাঃ হাইদ্বের সময় নির্ধারণ খুবই জটিল বিষয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট সমাধান দিতে পারেনি। চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে এ ব্যাপারে প্রত্যেক মহিলা-ই স্বতন্ত্র। এমনকি স্বাস্থ্য ও বয়স অনুপাতে একই মহিলার বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে। তবে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান পূরা ঋতু চক্রকে সাধারণত ২৮ দিনের একটি চক্র বলে সাব্যস্ত করেছে এবং এ ২৮ দিনের মধ্যে নারী জড়ায়ুতে ৩ ধরণের পরিবর্তন ঘটে। চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে ঋতু চক্র বা মাসিকের এ চক্রের ৩টি স্তর বা ফেজ হয়ে থাকে। যথা..

১. মেন্সট্রুয়াল ফেজঃ এ সময় যোনিপথে রক্ত বের হয়। সাধারণত **৪-৭ দিন স্থায়ী** এ রক্তপাতে ভেঙ্গে যাওয়া রক্তকনিকা ছাড়াও জড়ায়ুর ভিতরকার শ্বেত কনিকা, জরায়ুমুখের মিউকাস, জরায়ুর নিঃসৃত আবরণী, ব্যাকটেরিয়া, প্লাজমিন, প্রস্টাগ্লানডিন এবং অনিষিক্ত ডিম্বাণু স্রাব হিসেবে বেরিয়ে আসে। ইস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরন হরমোনের যৌথ ক্রিয়ায় এই পর্বটি ঘটে থাকে।

২. প্রলিফারেটিভ ফেজঃ এর সময়কাল ৮-১০ দিন স্থায়ী হতে পারে। শুধু ইস্ট্রোজেন হরমোনের প্রভাবে এমনটি হয়ে থাকে। এ সময় জরায়ু নিষিক্ত ডিম্বাণুকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়।

৩. সেক্রেটরি ফেজঃ এটি হচ্ছে ঋতুচক্রের সবচেয়ে দীর্ঘ ফেজ, যা প্রায় ১০-১৪ দিন ব্যাপী স্থায়ী হয়। একে প্রজেস্টেরন বা লুটিয়াল ফেজ-ও বলা হয়। এটিও ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন উভয় হরমোনের যৌথ কারণে হয়। এই সময় নিষিক্ত ডিম্বাণুর বৃদ্ধির জন্য জরায়ু সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। ডিম্বাশয়ের কোনো ডিম্বাণু শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত না হলে জরায়ু আবার মেন্সট্রুয়াল ফেজ-এ চলে যায়। এভাবেই পূর্ণ বয়স্ক মেয়েদের ঋতুচক্র চলতে থাকে।

নিফাস পরিচিতিঃ উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে পুরুষের বীর্যকীট আর নারীর ডিম্ব একীভূত হয়ে নারী জড়ায়ুতে তৈরি হয় মানব ভ্রূণ। এ ভ্রূণ ক্রমে ক্রমে মানব শিশুতে রূপান্তরিত হয় এবং এক সময় মায়ের পেট থেকে দুনিয়ায় জন্ম নেয়। আর এ জন্ম নেওয়াকে আমরা বলি সন্তান প্রসব।
সন্তান প্রসবের পর মায়ের জড়ায়ু থেকে এক প্রকার রক্তস্রাব শুরু হয়। সন্তান প্রসবের পর মায়ের জড়ায়ু থেকে বেরিয়ে আসা রক্তস্রাবকে বলা হয় নিফাস।

নিফাসের সময়কালঃ নিফাসের সময়কাল নিয়েও পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। হাদীছেও বিষয়টি নিয়ে নির্ধারিত তেমন কোনো বক্তব্য নেই। তাই এ বিষয়টি নিয়েও ভিন্নমতের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং ইমামগণ থেকে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়াও যায়।
নিফাসের সর্বনিম্ন সময় নির্ধারিত নয়। সন্তান প্রসবের পর যখনই রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাবে তখনই ধরতে হবে যে নিফাস বন্ধ হয়ে গেছে। তবে নিফাসের সর্বউচ্চ সময়কাল নিয়ে ভিন্ন মত পাওয়া যায়। যেমন..

ক. হানাফী ও হাম্বলীদের মতে নিফাসের সর্বউচ্চ সময় ৪০ দিন। সন্তান জন্মের ৪০ দিন পরেও স্রাব বন্ধ না হলে এটাকে নিফাস হিসেবে না ধরে ইস্তিহাদ্বা হিসেবে গণ্য করতে হবে। উনাদের দলীল হচ্ছে একটি হাদীছ যেখানে বলা হয়েছে..

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً .رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ.

উম্মু সালামাহ (নবী সা.র স্ত্রী) বলেছেনঃ নবী সা.র সময়ে নিফাসের সময়ে মহিলারা ৪০ দিন অপেক্ষা করতেন। (আবু-দাউদ, তিরমিযী। ইমাম নববী বলেছেন হাদীছটি দ্বাইফ আর আলবানি বলেছেন সাহীহ)

খ. শাফিয়ী ও মালিকীদের মতে নিফাসের সর্বউচ্চ সময় ৬০ দিন।

ইস্তিহাদ্বা পরিচিতিঃ হাইদ্ব ও নিফাস ব্যতীত (নারী যোনি দিয়ে বের হওয়া) অন্য সকল রক্তস্রাবকে ইস্তিহাদ্বা বলা হয়। অর্থাৎ হাইদ্বের মিয়াদ বহির্ভূত স্রাব, নিফাসের মিয়াদ বহির্ভূত স্রাব এবং হাইদ্ব ও নিফাসের সময় ছাড়া অন্য সময়ে সাদা স্রাব ব্যতীত অন্য সকল স্রাবকে ইস্তিহাদ্বা বলা হয়।

হাইদ্ব ও নিফাসের বিধানঃ হাইদ্ব ও নিফাস চলাকালীন সময়ে কয়েকটি কাজ নারীর জন্য নিষিদ্ধ থাকে। যেমন..
ক. স্বামী সহবাসঃ হাইদ্ব ও নিফাস চলাকালীন দিনগুলোতে যৌন মিলন নিষিদ্ধ তাই এদিনগুলোতে স্বামী-স্ত্রী যৌন মিলন থেকে বিরত থাকবে। এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ **(222)**

পটভূমিঃ ইয়াহুদ সমাজে ঋতুবতী নারী সম্পর্কে নানা কুসংস্কারের প্রচলন ছিল। কিছু মানুষ তাদের সম্পূর্ণ আলাদা করে দিত আর কেউ কেউ মলদ্বারে সঙ্গম করত। সাহাবাগণ তাদের করণীয় সম্পর্কে জানতে চাইলে নাযিল হয়..
(হে নবী!) লোকজন তোমার কাছে ঋতুবতী নারী সম্পর্কে জানতে চায়, বলে দাওঃ এটা বড়ই নোংরা (অবস্থা।) সুতরাং স্রাব চলাকালীন সময়ে তোমরা নারী (সঙ্গম) থেকে বিরত থাকবে, (স্রাব থেকে) পবিত্র হওয়া পর্যন্ত (সঙ্গমের জন্য) তাদের কাছে যাবে না। তারা যখন (স্রাব থেকে) উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তাদের সাথে সঙ্গম করবে আল্লাহর নির্দেশিত পথে (তথা যোনি পথে, মলদ্বারে নয়। আর স্রাব অবস্থায় সঙ্গম করে ফেললে তাওবাহ করবে) নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা তাওবাহ করে, আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করে। (২ বাক্বারাহঃ ২২২)

আইন ও বিধানঃ ঋতুকালে নারীর যোনি নোংরা থাকে, এ অবস্থায় সঙ্গম করলে নানা রোগের সৃষ্টি হয়। ঋতুবতী নারীর সাথে সঙ্গম করা বৈধ নয়। তবে সঙ্গম ব্যতীত অন্য সব (যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন, ইত্যাদি) বৈধ আছে। স্রাব পরিপূর্ণ ভাবে বন্ধ হয়ে গেলে (তথা সাদা স্রাব দেখা গেলে) নারী প্রথমে গোসল করবে এবং এ গোসল নারীর ফরজ দায়িত্ব। গোসলের পর ওই নারীর সাথে সহবাস করা যাবে।

ঋতুবতী নারীর সাথে সহবাস করলে ১ দিনার (৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ বা সমমূল্য) বা আধা দিনার সাদাক্বাহ দিতে হয়। স্বামী-স্ত্রী সহবাসকালে ইচ্ছামত নানা পদ্ধতি গ্রহণ করে আনন্দ করা অবৈধ নয়। তবে সঙ্গম করতে হবে যোনি পথে, মলদ্বারে সঙ্গম করা বৈধ নয়।
বিঃ দ্রঃ = আয়াতে শুধু হাইদ্বের কথা বলা হয়েছে। তবে হাদীছের নিফাসের বেলায়ও হাইদ্বের বিধান কার্যকর করার কথা বলা আছে।

পর্যালোচনাঃ এখানে স্বামী সহবাস বলতে শুধুমাত্র যৌন সঙ্গম বুঝানো হয়েছে। সঙ্গম ব্যতীত অন্যসব বৈধ আছে। অর্থাৎ স্ত্রীর যোনি ব্যতীত আর সকল অঙ্গ ব্যবহার করে যৌবন উপভোগ করতে পারবে। এ ব্যাপারে বর্ণিত হচ্ছে..

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك : أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهن فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺالنَّبِيَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (البقرة 222) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، وَفِي لَفْظٍ :إِلَّا الْجِمَاعَ .رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ.

আনাস বিন মালিক রা. বর্ণনা করেন, ইয়াহুদ সমাজের প্রথা ছিলঃ কোনো নারীর হাইদ্ব শুরু হলে তারা ওই নারী সাথে খাবার খেত না, এমনকি একত্রে বসবাসও করত না।
সাহাবাগণ এ ব্যাপারে উনাদের করণীয় সম্পর্কে নবী সা.র কাছে জানতে চাইলে নাযিল হল "তারা হাইদ্বরত নারী সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করবে, তুমি বলে দাওঃ এটা হচ্ছে এক প্রকার অপরিচ্ছন্নতা /নোংরা অবস্থা। তোমরা এ অবস্থায় নারীসঙ্গম থেকে বিরত থাকবে। (বাক্বারাহঃ ২২২)
এ আয়াত নাযিলের পর নবী সা. ঘোষণা করলেনঃ তোমরা সঙ্গম ছাড়া আর সব করতে পারবে। (বুখারী ছাড়া বাকি অনেকেই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন)

وَعَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَجْدَعَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا لِلرَّجُلِ مِن امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ قَالَتْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْفَرْجَ "رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "تَارِيخِهِ."

(প্রসিদ্ধ তাবিয়ী') মাসরুক্ব বিন আজদা' রাহি. বলেনঃ একদা আমি (আমার শিক্ষিকা) আ'ইশাহ রা.কে জিজ্ঞেস করলামঃ স্ত্রীর যখন হাইদ্ব হয় তখন স্বামী তার সাথে কী কী করতে পারবে? তিনি বললেনঃ যোনিপথ ব্যবহার ব্যতীত সব করতে পারবে। (বুখারী ফী তারিখিহী)

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺأَنَّ النَّبِيَّ ﷺكَانَ إِذَا أَرَادَ مِن الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا شَيْئًا .رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

(প্রসিদ্ধ তাবিয়ী') ই'করামাহ রাহি. নবী সা.র কোনো এক স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেছেনঃ নবী সা. যখন হাইদ্বরত স্ত্রীর সঙ্গে কিছু করতে ইচ্ছা করতেন তখন উনার যোনির উপর কোনোকিছু রেখে দিতেন (অতঃপর অন্যঅঙ্গ নিয়ে খেলা করতেন) (আবু-দাউদ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺأَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাদের কারো হাইদ্ব হলে নবী সা. যদি তার সাথে মুবাশারাহ (মিলামিশা) করতে ইচ্ছা করতেন তখন তার হাইদ্বের নির্গমন স্থানে কোনো কাপড় রেখে দিতে বলতেন এবং (এ ছাড়া অন্যত্র) মুবাশারাহ (ঢলাঢলি/ঘষাঘষি/মর্দন) করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

হুঁশিয়ারিঃ তবে সাবধান! কখনো স্ত্রীর বায়ুপথে প্রবেশ করাবে না। কারণ এমন করা সর্বাবস্থায়-ই নিষিদ্ধ। যে কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারাহর ২২তম আয়াতে। এবং হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

عن أبي هريرة رضي الله عنه **قال: قال رسول الله** صلى الله عليه وسلم **ملعون من أتى امرأة في دبرها** .رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن.

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ যে ব্যক্তি পিছন দিয়ে (তথা বায়ুপথে) নারী সঙ্গম করল সে অভিশপ্ত। (আহমাদ, আবু-দাউদ। হাদীছটি হাসান)

খ. স্বালাতঃ শারীয়া'হ আইনে হাইদ্ব ও নিফাস চলাকালীন সময়ে মহিলাদের সালাত মাফ করে দেওয়া হয়েছে। তাই এ সময়ে তারা স্বালাত আদায় করবে না এবং এ স্বালাত পরেও পূর্ণ করতে হবে না। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে..

وقوله صلى الله عليه وسلم **فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي.** متفق عليه واللفظ للبخاري.

(হাইদ্ব অবস্থার বিধান দিতে গিয়ে) রাসূল সা. বলেছেনঃ যখন হাইদ্ব আসবে তখন স্বালাত ছেড়ে দেবে আর হাইদ্ব চলে যাবে তখন গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ আসলে হাইদ্ব বা মাসিক স্রাব শুরু হয়েছি কি না? এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনেক মহিলা নিজের যোনি পথে আঙ্গুল ঢুকিয়ে পরীক্ষা করেন আর অনেকে টিসু জাতীয় অন্য বস্তু ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। আসলে এমন করার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং যখন আপনার পেন্টিতে বা প্যাডে স্রাবের রক্ত লেগে থাকবে তখন থেকেই আপনি হাইদ্ব গণনা শুরু করবেন। এমনকি যে নারী রাতে পবিত্র অবস্থায় ঘুমিয়েছে আর সকালে ঘুম থেকে উঠে প্যাডে রক্ত দেখেছে উনি যখন রক্ত দেখেছে তখন থেকেই হাইদ্ব গণনা শুরু করবে। বিধান আসলে এমনই। (এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে "শারহ বিক্বায়াহ দেখে নিন।)

عن عائشة رضي الله عنها: **كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة** .رواه مسلم

আইশা'হ রা. থেকে বর্ণিত, (রাসূল সা.র সময়ে হাইদ্ব ও নিফাস অবস্থায় আমরা স্বালাত আদায় করতাম না এবং সাওম পালন করতাম না। তবে) আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যেন সাওমের কাযা আদায় করি তবে স্বালাতের কাযা আদায় করতে আমাদেরকে আদেশ করা হয়নি। (মুসলিম)

عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم **أليس اذا حاضت المرأة لم تصل و لم تصم ؟** (متفق عليه في حديث طويل)

আবু-সাঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছে রাসূল সা. বলেছেনঃ মেয়েদের যখন স্রাব হয় তখন কী তারা সালাত ও সাওম ছেড়ে দেয় না? (বুখারী ও মুসলিম)

গ. সাওমঃ হাইদ্ব ও নিফাস চলাকালীন সময়ে মহিলারা সাওম সাধন করবে না তথা রোজা রাখবে না। তবে হাইদ্ব বা নিফাস বন্ধ হওয়ার পর ছুটে যাওয়া এসব সিয়াম বা রোজা পূরা করতে হবে। দলীলস্বরূপ উপরে উল্লেখিত দুটি হাদীছ দেখে নিন।

ঘ. তাওয়াফঃ হাইদ্ব বা নিফাস অবস্থায় তাওয়াফ করা যাবে কী না? পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তবে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

روى البخاري (305)ومسلم (1211)عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها **أنها لما حاضت قبيل دخول مكة في حجة الوداع قال لها النبي ﷺافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي**

বিদায় হাজ্জের সফরে মাক্কাহ প্রবেশের আগেই আ'ইশাহ রা.র ঋতুস্রাব শুরু হলে রাসূল সা. বলেছেন অন্য হাজীগণ যা করে তুমিও তাই করবে। তবে (স্রাব থেকে) পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত তাওয়াফ করবে না। (বুখারীঃ ৩০৫, মুসলিমঃ ১২১১)

এমনকি হাজ্জের সময়ে যদি কোনো মহিলার হাইদ্ব শুরু হয় তখন উনি তাওয়াফ থেকে বিরত থাকবে এবং হাইদ্ব থেকে পবিত্র হওয়ার পর ইফাদ্বাহ (হাজ্জের ফরজ) তাওয়াফ করে হাজ্জ সম্পন্ন করবে। এ ব্যাপারে বর্ণিত হচ্ছে..

وروى البخاري (4401)ومسلم (1211)عن عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ فَقُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ** صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **فَلْتَنْفِرْ**

আইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, বিদায় হাজ্জের সময়ে নবী সা.র স্ত্রী স্বাফিয়্যাহ বিনত হু'ইয়াই রা.র হাইদ্ব শুরু হয়ে গেল (এ সংবাদ শুনার পর নবী সা. ভাবলেন স্বাফিয়্যাহ ইফাদ্বাহ তাওয়াফ করেননি তাই) তিনি বললেনঃ তবে কী সে আমাদেরকে (মদীনার পথে যাত্রা করা থেকে) বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে? আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে ইফাদ্বাহ (হাজ্জের ফরজ) তাওয়াফ করে ফেলেছে। তখন নবী সা. বললেনঃ সে যেনো (মদীনার পথে সফরে) বেরিয়ে পড়ে। (বুখারীঃ ৪৪০১, মুসলিমঃ ১২১১)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ উল্লেখিত বিধান হচ্ছে হাজ্জের সময়ের সাভাবিক বিধান। স্বাভাবিক অবস্থায় এবং সাধারণ সময়ে সবাইকে এ বিধান মেনে চলতে হবে। তবে একান্ত নিরোপায় ব্যক্তি পবিত্রতা ব্যতীত তাওয়াফ করে নিলে তার হাজ্জ সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং এ তাওয়াফ আদায় হয়ে যাবে। যেমন..

কোন মহিলা হাজ্জ করতে গিয়েছেন। মিনার দিনে তার ঋতু স্রাব শুরু হল। এখন তিনি দেখলেন তার স্রাব বন্ধ হবার আগেই তার কাফেলা ফিরে যাবে। তিনি একা থাকতে পারবেন না এবং থাকার কোনো সুযোগও নেই। আর একবার ফিরে গেলে পুনরায় এসে তাওয়াফ করাও তার জন্য খুবই কঠিন কাজ। এমত অবস্থায় ওই মহিলা ফরজ তাওয়াফ করে নেবেন এবং ওয়াজিব তাওয়াফ তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। এবং এজন্য তাকে কোনো প্রকার দিয়াত বা জরিমানাও দিতে হবে না। ইসলামী শারীয়া'হর বিধান সমূহের একটি মূল সূত্র হচ্ছে..

আল্লাহ সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপান না (বাক্বারাহঃ ৮৬)	**لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا**

৬. কুরআন পাঠঃ হাইদ্ব ও নিফাস অবস্থায় নারীদের জন্য কুরআন পাঠ নিষিদ্ধ বলে কোনো বিধান পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান দিয়ে নির্ভরযোগ্য তেমন কোনো হাদীছও পাওয়া যায় না। তাই বিষয়টি নিয়ে ভিন্নমতের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং ভিন্নমত পাওয়াও যায়। যেমন..

অনুমোদিতঃ কিছু কিছু ইমামগণের হাইদ্ব ও নিফাস অবস্থায় নারীরা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে। এক প্রশ্নের জবাবে একজন আরব শাইখ বলেছেন..

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشوكاني.

কোনো কোনো আলিমের মতে হাইদ্ব রত অবস্থায় কুরআন পাঠ করা যাবে। এটা হচ্ছে ইমাম মালিকের মযহাব, ইমাম আহমদ থেকেও এমন একটি রায় পাওয়া যায়। শাইখু-ল-ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এ মতটিকে পছন্দ করেছেন এবং ইমাম শাইকানী এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

وعند الحنابلة يباح للحائض أن تقرأ ما دون الآية القصيرة، أو قدره من الآية الطويلة ولها أن تأتي بذكر يوافق لفظ القرآن، كقولها عند ركوب الدابة أو السيارة "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين."

হাম্বলীদের মতে হাইদ্ব অবস্থায় কুরআনকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে পারবে। যেমন ছোট এক আয়াত অথবা বড় আয়াতকে সমান ভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে। এবং যিকর (তাসবীহ, দোয়া) হিসেবে পড়তে পারবে।

নিষিদ্ধঃ হাইদ্ব বা নিফাস অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কুরআন পড়বে না। যেমন..

وعند الحنفية يحرم على الحائض قراءة القرآن إلا إذا كانت معلمة، فإنه يجوز لها أن تلقن تلميذاتها كلمة كلمة .بحيث تفصل بينهما، كذلك يجوز لها أن تقرأ الآية القصيرة بقصد الدعاء، أو الثناء على الله.

হানাফীদের মতে হাইদ্ব অবস্থায় কুরআন পাঠ করা নিষিদ্ধ। তবে শিক্ষিকা নারী তার শিষ্যদেরকে শব্দ শব্দ করে বলে দিতে পারবে। এভাবেই দোয়ার জন্য অথবা তাসবীহ হিসেবে ছোট ছোট আয়াত পড়তে পারবে।

أما الشافعية فيقولون :يحرم على الحائض قراءة القرآن ولو حرفًا واحدًا إن قصدت تلاوته أما إذا قصدت الذكر مثل أن تقول عند الأكل "بسم الله الرحمن الرحيم " أو جري لسانها بالقرآن من غير قصد لتلاوته فلا يحرم.

শাফিয়ীদের মতে হাইদ্ব অবস্থায় কুরআন পাঠ করা নিষিদ্ধ। এমনকি তিলাওয়াতের জন্য অক্ষর অক্ষর করেও পড়তে পারবে না। তবে যিকর বা দোয়া হিসেবে পড়তে পারবে এবং তিলাওয়াতের ইচ্ছা ব্যতীত মুখ দিয়ে কুরআনের আয়াত বের হয়ে এলেও কোনো সমস্যা নেই। (সূত্রঃ উল্লেখিত অভিমতগুলো "ইসলাম অনলাইন" থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে)

যারা হাইদ্ব বা নিফাস অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেন উনাদের কেউ কেউ দলীল হিসেবে আবু-দাউদে বর্ণিত একটি হাদীছ পেশ করে থাকেন। বর্ণিত হচ্ছে..

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺأنه قال :لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة.

ইবনু উ'মার রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেনঃ হাইদ্ব ওয়ালী নারী এবং জুনুবী ব্যক্তি কুরআন থেকে সামান্য কিছুও পাঠ করবে না। (আসলে হাদীছটি দ্বাইফ। তাই কোনো বিধান প্রমাণের জন্য দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়)

ইস্তিহাদ্বার বিধানঃ ইস্তিহাদ্বা আসলে শারীরিক অপবিত্রতা নয় বরং স্বাভাবিক অসুস্থতা। তাই ইস্তিহাদ্বা অবস্থায় মহিলারা সালাত আদায় করবে, সাওম পালন করবে, স্বামী সহবাস করতে পারবে, কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে, তাওয়াফ করতে পারবে তথা পবিত্র অবস্থায় যা যা করা যায় ইস্তিহাদ্বা অবস্থায় এসকল কাজ করা যাবে।
তবে এ অবস্থায় যেহেতু যৌনি পথ দিয়ে রক্ত বের হয় তাই অযু নষ্ট হয়ে যায়। আর এ রক্ত স্রাব আকারে বের হওয়ার কারণে চলমান রোগ হিসেবে ধরা হয় এবং এটাকে "হাদাছ আসগর" তথা ছোট অপবিত্রতা হিসেবে ধরা হয়। যে কারণে গোসল করতে হয় না বরং শুধু অযু নষ্ট হয়ে যায়।
আর এ অবস্থায় পবিত্রতা হাসিলের বিধান কয়েক ভাবে হতে পারে। যেমন..

১. প্রত্যেক ফরজ সালাতের জন্য অযুঃ ইস্তিহাদ্বা অবস্থায় ওই মহিলা প্রত্যেক ফরজ সালাতের জন্য অযু করবে এবং এ অযু দিয়ে ওই ওয়াক্তের মধ্যে (সুন্নত ও নফল সালাত, তিলাওয়াতসহ) অন্যান্য ইবাদাত সম্পাদন করতে পারবে। এমন বিধান দিয়ে বর্ণিত হচ্ছে..

عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عن النَّبِيِّ ﷺقَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ :تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ :حديثٌ حَسَنٌ.

আ'দী বিন ছাবিত উনার বাবা থেকে এবং বাবা দাদা থেকে বর্ণনা করেন, ইস্তিহাদ্বারত নারী সম্পর্কে নবী সা. বলেছেনঃ সে তার স্রাবের দিনগুলোতে সালাত ছেড়ে দেবে। অতঃপর গোসল করবে এবং প্রত্যেক (ফরজ) সালাতের সময়ে অযু করবে। এভাবেই সে সালাত আদায় করবে এবং সাওম পালন করবে। (আবু-দাউদ, ইবনু মাজা, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেছেনঃ হাদীছটি হাসান।)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ :جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺفَقَالَتْ :إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ لَهَا :لَا، اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ.

আ'ইশাহ রা. বলেনঃ একদা ফাতিমাহ বিনত আবু-হুবাইশ নবী সা.র কাছে এসে বললঃ আমার ইস্তিহাদ্বা হতেই থাকে, আমি পবিত্র হতে পারি না। আমি কী সালাত ছেড়ে দেবো? নবী সা. বললেনঃ না, তুমি তোমার স্রাবের দিনগুলোতে সালাত ছেড়ে দেবে। অতঃপর গোসল করবে এবং প্রত্যেক সালাতের জন্য অযু করবে। এভাবেই তুমি সালাত আদায় করবে যদিও রক্তের ফোটা তোমার ছাটাইয়ে প্রবাহিত হয়। (আহমাদ, ইবনু মাজা)

২. একত্রে দুই সালাতঃ ইস্তিহাদ্বারত অবস্থায় মহিলা দুই সালাত (জোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা) একত্র করে আদায় করবে। এমন বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

عن حَمْنَة بنت جَحش رضي الله عنها قالت كنت أُسْتَحَاض حَيْضَة كثيرة شَدِيدة فأتيت رسول اللهﷺ أسْتَفْتِيه وأُخْبِرُه فَوجدْتُه في بيت أختي زينب بنت جَحش فقلت :يا رسول الله إني امرأة أُسْتَحَاض حَيْضَة كثيرة شديدة، فما تَرى فيها قد مَنَعَتْنِي الصلاة والصوم فقال :أنْعَتُ لك الكُرْسُف فإنه يُذهِبُ الدَّم .قالت هو أكثر من ذلك قال فاتَّخِذِي ثوبا .فقالت :هو أكثر من ذلك إنما أَثُجُّ ثَجًّا قال رسول اللهﷺ سَآمُرُك بأمْرَين أيهما فَعَلْتِ أجْزَأ عَنْكِ من الآخر، وإن قَوِيتِ عليهما فأنتِ أعْلَم .قال لها :إنما هذه رَكْضَةٌ من رَكَضَات الشيطان فَتَحَيَّضِي ستَّة أيام أو سبعة أيَّام في عِلْم الله، ثم اغْتَسِلِي حتى إذا رأيت أنك قد طَهُرْتِ، واسْتَنْقَأْتِ فصلِّي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يُجْزِيكِ، وكذلك فافْعَلِي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يَطْهُرْن مِيقَاتُ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وإن قَوِيت على أن تُؤَخِّرِي الظهر وتُعَجِّلِي العصر فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بين الصلاتين الظهر والعصر، وتُؤَخِّرِين المغرب وتُعَجِّلين العشاء، ثم تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بين الصلاتين فافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مع الفجر فافْعَلِي، وصُومي إن قَدِرت على ذلك، قال رسول اللهﷺ وهذا أعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إليَّ . حسن - [رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه]

(রাসূল সা.র শালিকা) হা'মনাহ বিনত জাহাশ রা. বলেনঃ একদা আমার খুব বেশী পরিমাণে ইস্তিহাদ্বা শুরু হল। আমি তখন ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে রাসূল সা.র কাছে এলাম। আমি আমার বোন যাইনাব বিনত জাহাশের ঘরেই রাসূল সা.কে পেয়ে গেলাম।

আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার খুব অধিক পরিমাণে ইস্তিহাদ্বা শুরু হয়েছে এবং এতে আমার সালাত ও সিয়ামে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন?

রাসূল সা. বললেনঃ "কুরসুফ" (তূলা) ব্যবহার কর। এটা রক্ত চুষে নেবে।

আমি বললামঃ (এতে কাজ হবে না) এটা এরচেয়ে অনেক বেশী।

তিনি বললেনঃ তবে আলাদা কাপড় ব্যবহার কর।

আমি বললামঃ এটা এরচেয়ে অনেক বেশী। অধিকহারে প্রবাহিত হচ্ছে।

তিনি বলেনঃ আমি তোমাকে দুটি কথা বলছি (তথা দুটি পদ্ধতি বাতলে দিচ্ছি।) এর যে কোনো একটি পালন করাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে আর তুমি যদি উভয়টি করতে সক্ষম হও তবে যে কোনো একটি বেছে নেবে। আসলে এটা (হাইদ্ব নয় বরং) সাধারণত শয়তানের আঘাতের ফলে এমনটি হয়ে থাকে। (আর এ ব্যাপারে তোমার জন্য পালনীয় বিধান হল) তুমি প্রতি মাসে ৬ দিন অথবা ৭ দিন হাইদ্ব গণ্য করবে (আসলে আল্লাহই ভালো জানেন তোমার হাইদ্ব কত দিন) অতঃপর যখন মনে করবে (তোমার গণ্য করা হাইদ্বের দিন শেষ হয়ে গেছে এবং) তুমি (হাইদ্ব থেকে) পাক হয়ে গেছো তখন গোসল করে পবিত্র হয়ে যাবে। এভাবেই মাসে ২৩ দিন অথবা ২৪ দিন সালাত আদায় করবে এবং সাওম পালন করবে। প্রতি মাসে তুমি এমনই করবে। যেভাবে মহিলাদের হাইদ্ব হয় এবং পবিত্র হয় তুমিও তাই করবে (তোমার জন্য পবিত্রতার প্রথম পদ্ধতি হচ্ছেঃ তুমি প্রত্যেক সালাতের জন্য অযু করবে) আর এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

আর (পবিত্রতা অর্জনের ২য় পদ্ধতি হচ্ছে) যদি পারো তবে জোহরকে একটু দেরী করে আর আসরকে একটু এগিয়ে এনে একবার গোসল করে দুই সালাতকে একত্রিত করে জোহর ও আসর একত্রে আদায় করবে। এভাবেই মাগরিবকে দেরী করে আর ইশাকে একটু এগিয়ে এনে একবার গোসল করবে মাগরিব ও ইশাকে একত্রিত করে দুই সালাত একত্রে আদায় করবে। আর ফজরের জন্য আলাদা গোসল করবে। আমি মনে করিঃ উল্লেখিত দুটি পদ্ধতির মাঝে এটাই তোমার জন্য উত্তম হবে। আর যথারীতি সিয়াম পালন করবে। (আবু-দাউদ, আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজা)

স্রাব চলাকালীন সময়ের জন্য স্বাস্থ্যগত কয়েকটি উপদেশঃ

১. আসলে হাইদ্ব ও নিফাস তথা রক্তস্রাব একটি নুংরা বিষয় বা কষ্টদায়ক বিষয়।

২. হাইদ্ব ও নিফাস অবস্থায় অনেকের মনমানসিকতা খিটখিটে থাকে, পেটে ব্যথাসহ নানা উপসর্গ দেখা দেয়।

৩. তাই এমতাবস্থায় শরীরকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রেখে সুগন্ধি ব্যবহার করে উত্তম পোশাক পরিধান করে একটু সাজগোজ করা ভালো। এসময়ে সুগন্ধি ব্যবহারের কথা হাদিছে বর্ণিত হয়েছে।

৪. স্রাবের সময় যোনিপথে এবং যনিমুখে নুংরা রক্ত লেগে থাকে এবং এর থেকে নানা রোগব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই স্রাবের রক্ত এবং রক্ত লেগে থাকা অংশ এ্যান্টিসেপ্টিক দিয়ে উত্তমরূপে পরিষ্কার কথা উচিত। কারণ এসব নুংরা রক্ত থেকে নানা ধরণের ব্যাক্টেরিয়া তৈরি হয় এবং এসবের প্রভাবে নানা প্রকার যৌনরোগ, চর্মরোগ, ইত্যাদি হয়ে থাকে।

৫. স্রাবের চলাকালীন সময়ে কোনো প্রকার সেন্যাটারী প্যাড ব্যবহার করা নিরাপদ।

৬. যাদের প্যাড ব্যবহার করার সাধ্য নেই এবং যারা পুরাতন কাপড় ব্যবহার করেন তাদের উচিত স্রাবের সময় ব্যবহৃত কাপড়কে সাবান বা ডিটারজেন দিয়ে ধোয়ে উত্তমরূপে পরিষ্কার করা এবং ধোয়ার পর ডেটল, স্যাভলন বা যে কোনো প্রকার এ্যান্টিসেপ্টিক মিশ্রিত পানিতে ভিজিয়ে উত্তমরূপে শুকিয়ে পুনরায় ব্যবহার করা। ব্যবহৃত কাপড় ধোয়ে কোনো প্রকার আবদ্ধ স্থানে বা সেতসেতা জায়গায় রেখে দিলে এতে ব্যাক্টেরিয়া তৈরি হয় এবং এসব কাপড় পুনরায় ব্যবহার করলে রোগব্যাধি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৭. বালিগাহ মেয়েদের জন্য সব সময় পেন্টি পরিধান করা উত্তম এবং বিবাহিতা নারীদের জন্য এটা মুস্তাহাব বলে শারহি বিক্বায়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩য় সেমিষ্টার **৭ম দিন**

কুফর ও কুফরের পরিনতি

ঈমান বিনষ্টকারী অন্যতম একটি মহাপাপ হল কুফর। কোনো মুসলিম যে কোনো ভাবে কুফরে জড়িয়ে পড়লে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল নিস্ফল ও আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে (কুফর অধ্যায়ে) আমরা জেনেছিঃ কুফর দুই প্রকারঃ ইসলাম পরিপন্থী কুফর আর ঈমান পরিপন্থী কুফর।

যারা মুসলিম নয়, যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, যারা কুরআন মানে না, দ্বীন মানে না; তারা কাফির। তাদের এ কুফর সম্পষ্ট কুফর তথা ইসলাম পরিপন্থী কুফর। এমন কুফর করলে মানুষকে কাফির বলা হয়। সমাজে তারা কাফির (অমুসলিম) হিসেবে-ই পরিচিত। তারা যেহেতু ঈমান আনেনি। তাই তাদের ঈমান নষ্ট হবার প্রশ্নই আসে না।

পক্ষান্তরে যারা মুসলিম, যারা বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করেছে, মুসলিম হয়েও যারা কুফর করে, যারা বলেঃ তারা দ্বীন মানে, কুরআন মানে, ইসলাম মানে, আবার কুফরও করে; তাদের এই কুফর অস্পষ্ট কুফর তথা ঈমান পরিপন্থী কুফর।

এমন কুফর করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। যেহেতু এরা নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়। তাই ইসলামী পরিভাষায় এদের কাফির না বলে মুনাফিক বলা হয়।
মুনাফিক মানব সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। তারা ঈমানশূন্য। কারণঃ ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ (শিরক বা কুফর) করার কারণে তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে।

বর্তমান বিশ্বের সাধারণ গতি ও সমাজের স্রোত কুফর শিরকের দিকে ধাবমান। তাই কালের স্রোতে গা ভাসাতে গিয়ে অনেক মানুষই কুফর শিরকে জড়িয়ে পড়ে। নিম্নের উদাহরণ সমূহ থেকে বিষয়টি আরো সহজে বোঝা যাবে, ইন শা-আল্লাহ।

উদাহরণঃ ১ = ঈমান বিনষ্টকারী কুফর সমূহের অন্যতম একটি নাস্তিক্যবাদ। যারা এই মতবাদে বিশ্বাস রাখে তাদের বলা হয় নাস্তিক। নাস্তিকদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনের নাম সমাজতন্ত্র। নাস্তিকরা সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস করে না। তারা মনে করেঃ প্রকৃতিই সবকিছুর স্রষ্টা অর্থাৎ সবকিছু সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক ভাবে, প্রাকৃতিক নিয়মে। তাই নাস্তিকরা নিজেদেরকে প্রকৃতিবাদী হিসেবে প্রকাশ করে।
নাস্তিকদের মূল বিশ্বাস ও দর্শনের উল্লেখ যোগ্য কয়েকটি হচ্ছে.. তারা মনে করে..

- এ মহাবিশ্বের কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। সব সৃষ্টি হয়েছে প্রাকৃতিক ভাবে, প্রাকৃতিক নিয়মে।
- তাদের বিশ্বাস প্রকৃতিই সবকিছুর স্রষ্টা, প্রকৃতি হল মহাক্ষমতাধর।
- তারা মনে করেঃ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, পৃথিবী, সবই প্রকৃতির সৃষ্টি।
- তাদের ধারনাঃ জীবন, মরণ, সুস্থতা, অসুস্থতা, খাদ্য, পানীয়, সবই প্রকৃতির দান।
- তারা মনে করেঃ জোয়ার, ভাটা, ঝড়, তোফান, জলোচ্ছ্বাস, সোনামী, ভূমিকম্প, এসব প্রকৃতির খেলা।

আসলে নাস্তিক্যবাদী চিন্তা ও ধারনা অনেক পুরাতন। আদিম যুগেও কিছু মানুষ এমন ধারনা পোষণ করত। প্রকৃতিকে আরবিতে বলা হয় "দাহর" এবং প্রকৃতিবাদকে বলা হয় "দাহরিয়্যাহ"। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে "দাহর" ও "দাহরিয়্যাহ" সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয়েছে। যেমনঃ ইরশাদ হচ্ছে..

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23)

পটভূমিঃ মানুষ বাস্তব জীবনে যার প্রভূত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলে তিনিই খোদা। সে মতে আল্লাহই একমাত্র খোদা। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা শুধু এক আল্লাহর প্রভূত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলব, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রভূত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলে। তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছেঃ

২৩. তাকে দেখেছঃ যে ব্যক্তি "হাওয়াকে" (মনগড়া নীতি /মানব রচিত বিধান /নিজের বা অন্যের মন মানসিকতাকে) খোদা বানিয়ে নিয়েছে। (যে এমন করে) আল্লাহ জ্ঞাতসারে-ই তাকে বিভ্রান্ত করেন, তার কানে ও মনে মোহর লাগিয়ে দেন, চুখে এটে দেন পর্দা (সে হয়ে যায় চরম বিভ্রান্ত।) কে তাকে হেদায়াত করবে আল্লাহ ছাড়া? (একথা স্পষ্ট ভাবে জানা সত্ত্বেও) তোমরা কি (আল্লাহর বিধান) মেনে নেবে না?
ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে কারো মনগড়া বিধান মেনে নেওয়া চরম বিভ্রান্তি, ঈমান বিনষ্টকারী কুফর।

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (24)

তারা বলেঃ দুনিয়ার জীবন ছাড়া কিছুই নেই। আমরা জীবিত হই, মরে যাই (এসবই প্রাকৃতিক নিয়ম) প্রকৃতিই আমাদের সমাপ্তি ঘটায়। (আল্লাহ্ বলছেন) আসলে এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই, তারা শুধু ধারনা করে থাকে। (৪৫ জাছিয়াহঃ ২৪)
ঈমান ও আক্বীদাহঃ কিছু মানুষ মনে করে প্রকৃতিই সবকিছুর উৎস। মানুষ জন্ম নেয়, বড় হয়, মরে যায়, সবই প্রকৃতির খেলা। এরা নিজেদেরকে প্রকৃতিবাদী বা প্রকৃতিপূজারী বলে দাবী করে এবং সমাজতান্ত্রিক বলে পরিচয় দেয়। আসলে এরা নাস্তিক, আরবীতে এদের বলা হয় দাহরিয়্যাহ আর ইংরেজীতে এইতিষ্ট।

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ(94) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (95)

আমি যে জনপদে রাসূল পাঠাই (তারা অবাধ্য হলে) সেখানে দুঃখকষ্টের আযাব দেই, যেন তারা (ক্ষমার জন্য আমার কাছে) মিনতি করে, পরে (মিনতি না করলে) তাদের দুঃখকষ্টকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বদলে দেই। এতে বিভোর হয়ে তারা বলেঃ বাপ-দাদার সময়েও দুঃখকষ্ট এসেছে (এসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়) তখন হঠাৎ পাকড়াও করি, তারা বোঝতেই পারে না। (৭ আ'রাফঃ ৯৪-৯৫)

উদাহরণঃ ২ = আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এমন আছেন যারা নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেন কিন্তু ইসলামী আদর্শ, শারীয়া'হ আইন এবং আল-কুরআনের বিধান পরিপূর্ণ ভাবে মেনে চলেন না। তাদের জানা উচিত ছিল ইসলামী আদর্শ /শারীয়া'হ আইন অথবা কুরআনের কোনো বিধান অমান্য করা বা অবজ্ঞা করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (25) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (26)

তারা তোমাকে অবজ্ঞা করলে (দুঃখ কর না। কারণ) এদের পূর্বসূরিরাও (তাদের নবীকে) অবজ্ঞা করেছে। অথচ রাসূলগণ তাদের কাছে এসেছিল সুস্পষ্ট প্রমান, লিখিত (বিধান) ও আলোকিত কিতাব নিয়ে। পরে (রাসূলকে না মানার কারণে) কাফিরদের পাকড়াও করেছি। (খোঁজ নিয়ে দেখ) না মানার পরিণতি কেমন ছিল। (৩৫ ফাতিরঃ ২৫-২৬)
পর্যালোচনাঃ কুফর করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। যেব্যক্তি এমন করে সে আর মুঅমিন থাকতে পারে না, হয়ে যায় মুনাফিক।

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (34)

কোনো জনপদে যখনই রাসূল পাঠিয়েছি সেখানকার নেতারা বলেছেঃ "তোমাদের আনিত বিধান আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম"(৩৪ সাবাঃ ৩৪)

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51)

তারা (মুনাফিকরা) বলে আমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছি, আমরা তাদের অনুগত, তথাপিও কিছু মানুষ অন্যপথে ফিরে যায়। আসলে এরা মুঅমিন নয়। (কারণ) বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের (কুরআন সুন্নাহর) প্রতি আহ্বান করা হলে এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর (কোনো আয়াত বা হাদীছে) ব্যক্তিগত ফায়দা হলে অনুগত হয়ে ছুটে আসে। (এরা কেন এমন করছে? তোমরা কী মনে কর?) এদের অন্তর রোগাক্রান্ত? না এরা সন্দিহান, নাকি আল্লাহ ও রাসূল থেকে অবিচারের আশংকা করছে? আসলে এরাই অবিচারী (এরা অবিচার করে আল্লাহর বিধানের উপর। যা কোনো মুঅমিন করতে পারে না) বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের (শারীয়া'হ আইনের) প্রতি আহ্বান করা হলে মুঅমিনদের কথা হবে একটাইঃ শোনলাম আর মেনে নিলাম। যারা এমন করে তারাই সফল। (২৪ নূরঃ ৪৭-৫১)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুঅমিন হতে হলে ইসলামের যাবতীয় বিষয়ে অবিচল থাকতে হয় এবং বাস্তব জীবনে মেনে চলতে হয়। জীবনের কিছু বিষয়ে ইসলাম আর কিছু বিষয়ে অন্যতা করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আজকাল আমাদের সমাজের অনেক মানুষ ইবাদাতের বেলায় আল্লাহর বিধান মেনে নিলেও বিচার ও শাসনের বেলায় মেনে চলে অন্য বিধান। উক্ত আয়াতে এদের কথাই বলা হয়েছে। এরা আসলে মুঅমিন নয়, মুনাফিক।

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85)

...তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু মান আর কিছু মান না? তোমাদের যারা এমন করবে তাদের পরিণতি হল দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখেরাতে কঠিন আযাব। আল্লাহ বে-খবর নন তোমাদের কাজ সম্পর্কে। (২ বাক্বারাহঃ ৮৫)

উদাহরণঃ ৩ = আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এমন আছেন যারা নিজেকে মুসলিম মনে করেন আবার বাস্তব জীবনের অনেক বিষয়ে মানব রচিত বিধান মেনে চলেন। কেউ সমাজ ও সংস্কৃতির নামে, কেউ মতবাদ ও রাজনীতির নামে আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে মানুষের মনগড়া বিধান ও নীতিমালা মেনে চলেন।
আর কেউ মসলক, মিনহাজ ও তরীকার নামে অতি বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ্ রাসূলের নির্ধারিত নীতিমালা ও বিধানের বাইরে দলীয় আলিম উলামা ও পীরদের বাতানো মিশ্র বিধান মেনে চলেন। এভাবে নানাজনে নানাভাবে মানবরচিত ও মনগড়া বিধান মেনেই চলছেন। অথচ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে যত বিধান, যত মতবাদ, নীতিমালা বা তরীকা রয়েছে সব মনগড়া, মানব রচিত। এসবের কোনো একটি মেনে নেয়া কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ।

কেউ এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল হয়ে যায়। সে হয়ে যায় মুনাফিক। আখেরাতে তার জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য দয়া করাও নিষিদ্ধ। ইরশাদ হচ্ছে..

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61)

তাদের দেখনি? যারা মনে করেঃ তারা তোমার প্রতি এবং ইতিপূর্বে নাযিল কৃত কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছে আর বিচার নিয়ে যেতে চায় ত্বাগূ'তের কাছে? অথচ তাদের আদেশ দেয়া হয়েছিল ত্বাগূত্বকে প্রত্যাখ্যান করতে। শয়তান তাদেরকে পরিপূর্ন ভাবে বিভ্রান্ত করে দিতে চায়। যদি বলা হয় আসো! (জীবন বিধান হিসেবে) আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের আদর্শ মেনে চলি। দেখবে মুনাফিকরা তোমা থেকে কেটে পড়ছে। (৪ নিসাঃ ৬০-৬১) (মুসলিম ৩ প্রকার। মুঅমিন, ফাসিক ও মুনাফিক।)

জ্ঞাতব্যঃ ত্বাগূ'ত এর মূল শব্দ ত্বুগ'ইয়ান অর্থ অবাধ্যতা। আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও অশুভ শক্তিকে ত্বাগূ'ত বলে। সবচেয়ে বড় ত্বাগূ'ত শয়তান। বিভ্রান্তির মাধ্যম হিসাবে মূর্তিকেও ত্বাগূ'ত বলা হয়।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ ত্বাগূ'তকে মেনে নেওয়া কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। ত্বাগূ'তকে মেনে নিলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। স্বেচ্ছায় বা সন্তুষ্ট চিত্তে ত্বাগূ'তের কাছে বিচার প্রার্থী হওয়াও কুফর।

উদাহরণঃ ৪ = আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এমন আছেন যারা নিজেকে মুসলিম মনে করেন কিন্তু আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করেন না। মুঅমিন হতে হলে অবশ্যই আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করতে হয়। আল্লাহর বিধানের কাছে সম্পূর্নরূপে আত্মসমর্পন না করলে কেউ মুঅমিন হতে পারবে না। যে মুসলিম আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করল না সে মুনাফিক। তার ইসলাম গ্রহণ ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। ইরশাদ হচ্ছে..

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(14)

বেদুইনরা বলেঃ "আমরা ঈমান এনেছি"। বলঃ "তোমরা ঈমান আননি"। বরং বলঃ "ইসলাম গ্রহণ করেছি"। কারণ এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করলে (সঠিকভাবে ঈমান আনলে) আল্লাহ্ তোমাদের আ'মাল নিস্ফল করবেন না। (অন্যথায় সব বরবাদ হয়ে যাবে) নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (৪৯ হুজরাতঃ ১৪)

رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ،لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ. وقال الترمذي حسن غريب

ইবন উমর রাঃ বলেনঃ একদা রাসূল সাঃ মিম্বরে আরোহণ করে উচ্চস্বরে বললেনঃ হে লোকেরা! যারা শুধু মুখ দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছ, ঈমান এখনো তাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। তোমরা মুসলিমদের কষ্ট দিও না, তাদের অপদস্থ কর না, তাদের দোষ অন্বেষন কর না। কারণ যে তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ অন্বেষন করে আল্লাহ্ তার দোষ অন্বেষন করবেন। আর আল্লাহর কারো দোষ অন্বেষন করলে তাকে অবশ্যই অপদস্থ হতে হবে, যদিও সে ঘরে বসে থাকে। (তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেছেনঃ হাদীছটি হাসান গারীব)

আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পন না করে কেউ মুঅমিন হতে পারবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)

না..! তোমার প্রভুর কসম! তারা মুঅমিন হতে পারবে না। যতক্ষণ না তাদের যাবতীয় বিষয় মীমাংসার জন্য তোমার কাছে আসবে, তোমার ফয়সালা বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে এবং সম্পূর্নরূপে আত্মসমর্পন করবে। (৪ নিসাঃ ৬৫)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ উক্ত আয়াত থেকে বোঝা যায়ঃ মুঅমিন হতে হলে

- যাবতীয় বিচার ফয়সালা আল্লাহর বিধান মত করতে হবে,
- আল্লাহর বিধান বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে হবে
- আল্লাহর বিধানের কাছে সম্পূর্ন রূপে আত্মসমর্পন করতে হবে। এই তিন শর্তের কোনো একটি পূরন না করলে মুঅমিন হওয়া যাবে না।

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

যে বা যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মত "হুকম" (বিচার শাসন আইন আদেশ) করে না তারা কাফির। (মাইদাহঃ ৪৪)

উদাহরণঃ ৫ = আমাদের সমাজের অনেক মানুষ নিজেকে মুসলিম মনে করেন কিন্তু কুরআনে বর্নিত কিছু তথ্য বা বিধানে সংশয়ে ভোগেন। অথচ কুরআনের আয়াত বা মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমানিত কোনো বিষয়ে সন্দেহ করা বা সংশয়ে থাকা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। এমন করলে ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। সকল রাসূলের সকল শারীয়া'হ মতেই এই বিধান কার্যকর ছিল। ইরশাদ হচ্ছে..

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (9)

নূহের জাতি, আ'দ, ছামূদ এবং পরবর্তি জাতি সমূহের সংবাদ তোমাদের কাছে পৌছায়নি? যারা অতীত হয়ে গেছে, আল্লাহ এদের ব্যাপারে অবগত। রাসূলগণ তাদের কাছে প্রমান নিয়ে এসেছিলেন। (তথাপিও তারা বিরোধিতা করেছে) তারা (গুস্বায়) দাঁত কামড়িয়ে বলেছেঃ তোমাদের আনিত বিধান আমরা প্রত্যাখ্যান করি, তোমরা যে পথে ডাকছ এব্যাপারে আমরা যথেষ্ট সন্দিহান। (১৪ ইবরাহীমঃ ৯)

উদাহরণঃ ৬ = আল্লাহ, রাসূল বা দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে ঠাট্টা-মশকারা করাও কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ অথচ আমাদের সমাজের অনেক মানুষ এমনটি করে থাকেন। ইরশাদ হচ্ছে.

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (66)

(তারা আল্লাহ, রাসূল, আল্লাহর কালাম ও মুঅমিনদের সম্পর্কে কটু কথা বলে। আর) তুমি জিজ্ঞেস করলে তারা বলবেঃ ঠাট্টা করেছি। বলঃ তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত (কিতাব, বিধান) ও রাসূল নিয়ে ঠাট্টা কর? বাহানা বানিও না। তোমরা ঈমানের পর কুফর করেছ। তোমাদের কাউকে মাফ করা হলেও অন্যদের সাজা দেয়া হবে। কারন তারা পাপিষ্ঠ। (৯ তাওবাহঃ ৬৫-৬৬)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুনাফিক্বী আসলে কুফরেরই নামান্তর। মুনাফিক মানুষের দৃষ্টিতে মুসলিম হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। মুনাফিক চির জাহান্নামী। (মুনাফিক সম্পর্কে জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা" দেখে নিন)

উদাহরণঃ ৭ = আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এমন আছেন যারা নিজেকে মুসলিম মনে করেন অথচ সামাজিক, রাজনৈতিক সহ অনেক বিষয়ে মুঅমিনদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ইসলামের শত্রুদের সমর্থন করেন, সাহায্য সহযোগিতা করেন। আসলে এমন করাও ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যারা এমন করে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। তারা হয়ে যায় ঈমান শূন্য মুসলিম তথা মুনাফিক। ইরশাদ হচ্ছে..

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28)

মুঅমিনরা যেন মুঅমিন ছাড়া কোনো কাফিরকে ওয়ালী না বানায়। কেউ এমন করলে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না। তবে প্রতিরক্ষা হিসাবে তাক্বিয়্যাহ করতে পারবে। (আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পর্ককে তাক্বিয়্যাহ বলে) আল্লাহ তাঁর (আযাবের) ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছেন। আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ২৮)

উদাহরণঃ ৮ = ইসলামী বিধান সাধারণত দুই ধরনের হয়ঃ ঐচ্ছিক এবং আবশ্যকীয়। ইসলামী বিধানে আবশ্যকীয় করনীয়কে বলা হয় "ফারদ্ব" (ফরজ) আর আবশ্যকীয় বর্জনীয়কে বলা হয় হারাম।

ইসলামী বিধানে যেসব বিষয় "দালীল ক্বাত্বয়ী" তথা অকাট্ট দলীল (আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত বা মুতাওয়াতির হাদীছ) দ্বারা প্রমানিত ফিক্বহী বিন্যাসে ইহা ফারদ্ব (ফরজ) বা হারাম হয়। আর যেসব বিষয় তোলনা মূলক ভাবে দুর্বল দলীল (যথাঃ আল-কুরআনের ইঙ্গিত পূর্ন আয়াত, মুতাওয়াতির ছাড়া সাধারন সাহীহ হাদীছ বা ইজমা অথবা কিয়াস) দ্বারা প্রমানিত কোনো বিষয় ফরজ বা হারাম হয় না। বরং সুন্নত, মুস্তাহাব বা মাকরুহ হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব বিষয় নিয়ে ইমামগণের মাঝে ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়।

পর্যালোচনাঃ যেসব বিষয় "দালীল ক্বাত্বয়ী" (আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত বা মুতাওয়াতির হাদীছ) দ্বারা প্রমানিত নয় বরং তোলনা মূলক দুর্বল দলীল (আল-কুরআনের ইঙ্গিত পূর্ন আয়াত, মুতাওয়াতির ছাড়া সাধারন সাহীহ হাদীছ বা ইজমা অথবা কিয়াস) দ্বারা প্রমানিত প্রাথমিক যুগের ফাক্বীহগণ সাধারণত এসব বিষয়কে সরাসরি ফরজ বলতেন না বা হারাম বলতেন না। উনাদের সাধারন পরিভাষা ছিলঃ

- এমন করা উত্তম,
- এটা না করা উচিত,
- এমন করলে সমস্যা নেই,
- এমন করা যেতে পারে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আর এভাবে মতামত প্রকাশ করাকে বলা হত ফিক্বহ তথা উনাদের অনুধাবন। কারণঃ ফিক্বহী বিন্যাসে "শুধুমাত্র দালীল ক্বাত্বয়ী' দ্বারা প্রমাণিত বিষয়সমূহকে ফরজ বলা হয়"। তাই ক্বাত্বয়ী' নয় এমন দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ে উনারা সাধারণত ফরজ বা হারাম শব্দ এড়িয়ে চলতেন, যা আজো ফিক্বহ, হাদীছ ও তাফসীরের কিতাবাদিতে বিদ্যমান আছে। কারন ফরজ বা হারাম ইসলামী শারীয়াহর কঠিনতম পরিভাষা এবং এটা নির্ধারন করার বৈধ অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ তায়া'লা আর আল্লাহর অনুমোদনক্রমে রাসূল সা., আল্লাহ ও রাসূল ছাড়া অন্যকেউ এমন করলে অনাধিকার চর্চা হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116)

"ইহা হালাল আর ইহা হারাম" এমন বলে যবান দরাজ করে মিথ্যাচার কর না। এতে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ হয়। আল্লাহর উপর মিথ্যারোপকারীরা সফল হতে পারে না। (১৬ নাহ'লঃ ১১৬)

কিন্তু বর্তমান সময়ে খুব কম লোকই দলীলের মান বিচার করে থাকেন কারণঃ আমাদের সমাজের প্রায় সকল আলীমই কোনো না কোনো দলের সাথে সম্পৃক্ত এবং উনাদের অনেকেই নিজেদের দলীয় মতাদর্শকে শারীয়া'হ হিসাবে আখ্যায়িত করে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেন। তাদেরই কিছু অতি উৎসাহী মানুষ এসব বিষয়াদি নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করে নিজেদের খেয়াল খুশী মত ফরজ বা হারাম আখ্যা দিয়ে থাকেন। যা মোটেই কাম্য ছিল না এবং গ্রহণযোগ্যও নয়।

পর্যালোচনাঃ দলীল বিবেচনায় শারীয়া'হ আইন দুই ধরনের হয়ঃ মানস্বয়ম্ভ এবং মুজাতাহাদ।

- যেসব আইন কুরআন বা হাদীছ থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমানিত ইহা হল মানস্বয়ম্ভ।
- আর যে আইন কুরআন বা হাদীছ দ্বারা প্রমানিত নয় বরং ইমামগণের ইজতিহাদ দ্বারা প্রমানিত ইহা হল মুজতাহাদ।

ইখতিলাফ বা ভিন্ন মতঃ ইসলামী শারীয়া'হর যেসব বিষয় ও বিধান অকাট্ট দলীল (কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত বা মুতাওয়াতির হাদীছ) দ্বারা প্রমানিত এসব মেনে নেয়া ফরজ এবং অমান্য বা অবজ্ঞা করা কুফর, এসব বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণের কোনো সুযোগ নেই। আর যেসব বিধান ইজতিহাদ দ্বারা বা অস্পষ্ট আয়াত (যার একাধিক অর্থ রয়েছে) দ্বারা বা সাধারন সাহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমানিত এতে ভিন্ন মত হতে পারে এবং দলীল ভিত্তিক ভিন্নমতের সুযোগ রয়েছে। তাই দলীল ভিত্তিক এসব মতের যে কোনো একটি বা একাধিক মত মেনে নেয়া যেতে পারে। তবে বাস্তব অনুশীলনীর জন্য একটি অভিমত মেনে নিলেও নীতিগত ভাবে দলীল ভিত্তিক অন্য সকল মতামত মেনে নিতে হবে। এসব মতের কোনোটিকে নীতিগত ভাবে অমান্য করা বা বিভ্রান্ত বলা যাবে না। এমন করলে এই ভিন্নমতকে ভিন্ন পথে রূপান্তরিত করা হবে। আর ইসলামে দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত অনুমোদিত হলেও ভিন্ন পথ বানানো নিষিদ্ধ এবং বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ।

উদাহরণঃ ৯ = ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহ্ বা রাসূল নির্দেশিত কোনো ফরজ বিধানকে ঐচ্ছিক মনে করা ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। অর্থাৎ এমন মনে করা যে, "দ্বীন পালনে বাধ্যবাধকতা নেই। যার খুশী দ্বীন পালন করবে, যার খুশী করবে না"। যে এমন মনে করবে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36)

আল্লাহ্ ও রাসূল কোনো ফয়সালা করে ফেললে মুঅমিন পুরুষ বা নারী কারো কোনো এখতিয়ার থাকে না (বরং সবাই এটা মেনে নিতে বাধ্য।) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের অবাধ্য হবে সে চরম ভাবে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। (৩৩ আহযাবঃ ৩৬)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট হলঃ ইসলামী বিধানকে দুই ভাবে বিভক্ত করা হয়েছেঃ বাধ্যতা মূলক বিধান আর ঐচ্ছিক বিধান। শারীয়া'হ পরিভাষায়..

- বাধ্যতা মূলক করনীয় বিধানকে বলা হয় ফরজ।
- বাধ্যতা মূলক বর্জনীয় বিধানকে বলা হয় হারাম।
- ঐচ্ছিক করনীয় বিধানকে বলা হয় তাত্বাওয়্যু।
- ঐচ্ছিক বর্জনীয় বিধানকে বলা হয় মাকরুহ।

গুরুত্ব বিবেচনায় তাত্বাওয়্যু'কে আবার তিন ভাবে বিভক্ত করা হয়েছেঃ সুন্নত, মুস্তাহাব, নফল। এবং মাকরুহকে দুই ভাবে বিভক্ত করা হয়েছেঃ মাকরুহ তানযিহী তথা সাধারন মাকরুহ আর মাকরুহ তাহরিমী তথা কঠিন মাকরুহ।

ইসলামী বিধানে ফরজ পালন করা এবং হারাম বর্জন করা অত্যাবশ্যক। এর ব্যতিক্রম করা মহাপাপ, যা করলে মানুষ ফাসিক হয়ে যায়। এজন্য দুনিয়ার বিচারেও সাজা পেতে হয় এবং আল্লাহ্ মাফ না করলে আখেরাতেও সাজা পেতে হবে। আর অকাট্ট দলীল (আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত বা মুতাওয়াতির হাদীছ) দ্বারা প্রমানিত কোনো ফরজ বা হারামকে নীতিগত ভাবে অমান্য, অবজ্ঞা বা অবহেলা করা কুফর, যা করলে মানুষের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। মানুষ তখন মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়।

হুঁশিয়ারিঃ উল্লেখিত কোনো ফরজ আদায় করাকে বা হারাম বর্জন করাকে ঐচ্ছিক মনে করাও কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। এমন করলেও মানুষের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।

একটি ভুল সংশোধনঃ= আমাদের সমাজে প্রচলিত একটি ভুল কথা হল "দ্বীন পালনে বাধ্যবাধকতা নেই"। কথাটি যে ভুল উপরের আলোচনা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে। আসলে কথাটি হবে "দ্বীন গ্রহণে বাধ্যবাধকতা নেই"। যে কথাটি বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ২৫৬ তম আয়াতে। ইরশাদ হচ্ছে..

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)

দ্বীন গ্রহনে বাধ্যবাধকতা নেই। (আল-কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ননার দ্বারা) বিভ্রান্তি আর হেদায়াত সম্পূর্নরূপে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। যেব্যক্তি সকল ত্বাগূত্বকে বর্জন করল এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনল সে এক মজবুত আদর্শ আঁকড়ে ধরল যা থেকে আর বিচ্ছিন্ন হতে নেই। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (২ বাক্বারাহঃ ২৫৬)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুসলিম হতে বা ইসলাম গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। তবে মুসলিম হবার পর অবশ্যই ফরজ কাজ করতে হবে এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

উদাহরণঃ ১০ = ঈমান বিনষ্টকারী অন্যতম আরেকটি মহাপাপ হলঃ জীবনের কোনো ক্ষেত্রে শারীয়া'হ বহির্ভুত বিধান বা নীতিমালা মেনে নেওয়া। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا(115)

হেদায়াত সুস্পষ্ট হওয়া সত্বেও যেব্যক্তি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, মুঅমিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে, সে যেদিকে ফিরে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেই, নিক্ষেপ করি জাহান্নামে যা জঘন্যতম আবাস। (৪ নিসাঃ ১১৫)

জ্ঞাতব্যঃ আজকাল অনেকেই নেতা মানা, আইন মানা, পীর মানা, আলিম মানা বা ইমাম মানার নামে রাসূল সাঃর হাদীছকে অবজ্ঞা করে থাকেন। অথচ হেদায়াতের একমাত্র পথ রাসূল সাঃর অনুকরণ। যে পথ আঁকড়ে ধরে ছিলেন সাহাবাগণ। রাসূল সাঃর অনুকরণ ছেড়ে অন্য পথে গেলে বা অন্য পথ ধরলে বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যায়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (22)

তার চেয়ে বড় পাপিষ্ঠ আর কে যার সামনে আমার বিধান পেশ করা হল আর সে এটা অমান্য করল? আমি অবশ্যই পাপিষ্ঠদের থেকে (তাদের অবাধ্যতার) বদলা নেব। (৩২ সাজিদাহঃ ২২)

উদাহরণঃ ১১ = ঈমান বিনষ্টকারী অন্যতম আরো একটি মহাপাপ হলঃ যাদু। সকল প্রকার যাদুই কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম যাদু করলে সে আর মুঅমিন থাকতে পারবে না। তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সে মুনাফিক হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ(102)

পটভূমিঃ অনেক ইয়াহুদ আলিম যাদুকে বৈধ বলত। তারা মনে করতঃ জীবরাঈল ও মিকাঈল দুই ফিরিস্তা বাবিল শহরে প্রেরিত হয়ে হারুত মারুত পরিচয়ে মানুষকে যাদু শিখিয়েছেন। যে যাদু দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন সুলাইমান বিন দাউদ। তারা বিশ্বাস করত সুলাইমান যাদুগর ছিলেন। রাসূল সাঃ যখন বললেনঃ সুলাইমান আঃ নবী ছিলেন। তখন ইয়াহুদ আলিমরা বললঃ মুহাম্মাদ মনে করে সুলাইমান নবী ছিল। দাউদের ছেলে যাদুগর বৈ কিছুই ছিল না। (কুরতুবী) এতে নাযিল হলঃ

সুলাইমানের রাজ্যে শয়তানরা যা (যাদুমন্ত্র) পাঠ করত তারা (ইয়াহুদ উলামা) এটা মেনে নিয়েছে। আসলে সুলাইমান কুফর (যাদু) করেনি। বরং শয়তানরাই কুফর করেছে, তারাই লোকজনকে যাদু শিখিয়েছে। (ইয়াহুদ বলেঃ ইরাকের বাবিল শহরে যাদু নিয়ে নাযিল হয়েছিল দুইজন ফিরিস্তা। যারা লোকজনকে যাদু শিখিয়েছে। আসলে এই তথ্যও ভুল। বরং) বাবিল শহরে হারুত মারুত (নামী) দুই ফিরিস্তার উপর এটা (যাদু) নাযিল হয়নি। (আয়াতের এই অংশের অর্থ একাধিক ভাবে করা যায়। ইমাম কুরতুবী এই অর্থকে উত্তম বলেছেন)

(বরং হারুত মারুত নামী দুইজন জিন্ন বাবিল শহরে লোকজনকে যাদু শিখিয়েছে।) কাউকে শিখানোর আগে তারা বলতঃ আমরা তোমাদের জন্য ফিতনাহ (তথা পরীক্ষা।) তাই (যাদু শিখে) কুফর কর না। তথাপিও মানুষ এদের থেকে শিখেছে (যাদু) যা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেগ সৃষ্টি করে। তবে তারা কারো ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া। তারা এমন শিক্ষা গ্রহণ করল, যা তাদের ক্ষতি করে, উপকার করে না। তারা অচিরেই জেনে যাবেঃ আখেরাতে তাদের জন্য কিছুই নেই। তারা নিজ সত্তা (কে জাহান্নামে ঠেলে দিয়ে) এর বিনিময়ে যা গ্রহণ করছে এটা বড়ই জঘন্য, যদি তারা বুঝত। (২ বাক্বারাহঃ ১০২)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ আজকাল অনেকেই যাদু ব্যবহার করেন। কেউ আনন্দ উপভোগের জন্য যাদুর খেলা করেন। অনেকে বশীকরণের জন্য যাদুর আশ্রয় নেন। এভাবে নানা জনে নানা ভাবে যাদু করে থাকেন। আর নিশ্চিত ফল পাবার আশায় অনেক আলিমকেও তাবিজের নামে যাদু ব্যবহার করতে দেখা যায়। আক্বীদাহ বিষয়ে পরিপক্ষ জ্ঞানের অভাবে অনেকেই যাদু ও তাবিজের পার্থক্য বুঝেন না। তারা তাবিজ মনে করে যাদু করেন। তাই নিম্নে যাদু চিনার কিছু আলামত পেশ করা হলঃ

- যাদু আরবী সহ যে কোনো ভাষায় হতে পারে।
- যাদুর মন্ত্র সহজে বোধগম্য নয়।
- যাদু লিখতে নানা ধরনের নকশা বা নম্বর ব্যবহার করা হয়।
- যাদুর জন্য কুরআনের আয়াতকে অন্য ভাবে লিখা হয়।
- প্রতারণার জন্য মধ্যখানে কুরআনের আয়াত ও চার পাশে যাদু লিখা হয়।
- যাদুর জন্য মানুষ, জিন্ন, শয়তান সহ অনেকের নাম ব্যবহার করা হয়।
- যাদুর জন্য পশু পাখির রক্ত, চামড়া বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করা হয়।
- যাদুর জন্য মানুষের নখ, চুল বা ব্যবহৃত কাপড় ব্যবহার করা হয়।
- যাদুকৃত তাবিজ বা বস্তু মাটিতে পুতে রাখা হয় /পানিতে ফেলে দেয়া হয় /পশু পাখিকে খাবানো হয় বা গাছে বেঁধে রাখা হয়।

বিঃ দ্রঃ= আমাদের সমাজে রোগব্যাধি থেকে মুক্তি ও সুরক্ষার জন্য তাবিজ ও ঝাড়ফুঁকের রেওয়াজ রয়েছে। তাই এবিষয়ে শরীয়তের বিধান জেনে রাখা আবশ্যক। কথাটি বিবেচনায় রেখে ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ সম্পর্কে জরুরী কিছু বিধান পেশ করা হলঃ

- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে ঝাড়ফুঁক করা শিরক। এমন করলে ঈমান নষ্ট হয়ে সকল ইবাদাত বরবাদ হয়ে যায়। তাই এমন ঝাড়ফুঁক করা ও করানো থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।
- কারো নাম ব্যবহার না করে আজিবাজি কথা বলে যে ঝাড়ফুঁক করা হয় ইহা শিরক না হলেও পরিত্যাজ্য।
- কুরআনের আয়াত বা মাসনুন দোয়া ব্যবহার করে ঝাড়ফুঁক হাদিছে প্রমাণিত, এর নাম রুকিয়াহ। রুকিয়াহ করা সুন্নত।
- অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য গাছের জড়ি, মাছের কাটা, পশুর হাড় ইত্যাদি ব্যবহার করা শারীয়া'হ অনুমোদিত নয়। এসব কাজ শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এসব বস্তুকে অসিলা হিসাবে ব্যবহার করা ছোটশিরক আর কার্যকরশক্তি হিসাবে ব্যবহার করা বড় শিরক।
- তাবিজ ব্যবহার ইসলামী সংস্কৃতি নয়। নবী সাঃ বা সাহাবাগণ তাবিজ লিখেননি বা তাবিজ ব্যবহারকে পছন্দ করেননি। তখনকার সময়ে ইয়াহুদ সমাজে তাবিজের প্রচলন ছিল। ইয়াহুদ আলিমগণ তাবিজ লিখত।
- কুরআনের আয়াত বা মাসনুন দোয়া ছাড়া অন্যকিছু দিয়ে তাবিজ ব্যবহার করা সাহাবী, তাবিয়ীগণের সর্বসম্মত মতে বৈধ নয়।

কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবিজ ব্যবহার করা অনেকের মতে অবৈধ। কারন ইহা ইসলামী সংস্কৃতি নয়। আর আ'ইশাহ, আব্দুল্লাহ বিন আমর রাঃ সহ অনেকের মতে অবৈধ নয়। কারন কুরআনের আয়াত লিখে সঙ্গে রাখা অবৈধ হবার কোনো নিদৃষ্ট দলীল নাই।

(২ বাকারাহঃ ১০২)

উদাহরণঃ ১২ = ঈমান বিনষ্টকারী আরো একটি মহাপাপ হচ্ছে আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত বা মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা প্রমানিত কোনো হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল মনে করা। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)

মুঅমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সব পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন ইহাকে হারাম বানিও না। (আল্লাহর বিধান অমান্য করে) সীমালঙ্ঘন কর না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘন কারীদের পছন্দ করেন না। (৫ মাইদাহঃ ৮৭)

বিঃ দ্রঃ = তবে যেসব বিষয় হালাল বা হারাম বলে আল-কুরআনে সরাসরি উল্লেখ হয়নি বা নির্ভর যোগ্য হাদীছে বর্নিত হয়নি, শুধু ফিক্বহী নিয়মের আওতায় এনে বিধান জারি করা হয়েছে; এমন বিষয় দ্বিমত করলে ঈমানের ক্ষতি হবে না। যেমনঃ কচ্ছপ খাওয়া, কাকড়া খাওয়া, ডলফিন খাওয়া, ইত্যাদি। হানাফী মাযহাবের সূত্র মতে এগুলো খাওয়া অনুচিত হলেও অন্য ঈমানগণের মতে বৈধ আছে।

উদাহরণঃ ১৩ = ঈমান বিনষ্টকারী আরো একটি কুফর হচ্ছে দ্বীনি ব্যাপারে কাউকে তিরস্কার করা বা গালি দেয়া। যে ব্যক্তি দ্বীনি কোনো ব্যাপার নিয়ে কাউকে তিরস্কার করল বা গালি দিলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে গেল। সে হয়ে গেল চির জাহান্নামী মুনাফিক। ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12)

তারা চুক্তি ভঙ্গ করলে, দ্বীনি ব্যাপারে তোমাদের তিরস্কার করলে আর চুক্তি মানা হবে না। তোমরা তখন কাফির নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যেন তারা (এসব কাজ থেকে) বিরত থাকে। (৯ তাওবাহঃ ১২)

উদাহরণঃ ১৪ = ঈমান বিনষ্টকারী কুফর সমূহের আরো একটি তাক্বদীর অমান্য করা। তাক্বদীর অমান্য করলে বা অস্বীকার করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। যেব্যক্তি তাক্বদীর অমান্য করবে সে ঈমান শূন্য মুসলিম তথা মুনাফিক হয়ে যাবে এবং তার সকল আ'মাল ও ই'বাদাত বরবাদ হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156)

মুঅমিনগণ! তোমরা তাদের মত হইও না, যারা কুফর করে (যুদ্ধ থেকে পালিয়ে থাকে) আর তাদের যেসব ভাই অভিযানে বা যুদ্ধে (মারা) যায় তাদের সম্পর্কে বলেঃ আমাদের সঙ্গে থাকলে এভাবে মরত না বা নিহত হত না। (এমন করার কারন) যেন আল্লাহ তাদের মনে পরিতাপ সৃষ্টি করেন। আসলে জীবন মৃত্যুর মালিক আল্লাহ। আল্লাহ প্রত্যক্ষ করেন তোমাদের সকল কাজ। (আ-ল ই'মরানঃ ১৫৬)

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (154)

(অহুদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে) মুসীবতের পর তিনি নাযিল করেছেন প্রশান্তি ও তন্দ্রা, যা তোমাদের অনেককে আচ্ছাদিত করেছিল আর অনেকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আল্লাহ সম্পর্কে ভূল ও কুফরি ধারনা পোষণ করেছিল। তারা বলছিলঃ (আমরা মদীনায় থেকে প্রতিরোধের কথা বলে ছিলাম) আমাদের কথার কি মূল্য দেয়া হয়েছে? বলঃ সকল সিদ্ধান্তের মালিক আল্লাহ। তাদের অন্তরে যা গোপন রয়েছে তারা ইহা প্রকাশ করতে পারছে না। তারা (মনে মনে) বলছেঃ আমাদের কথা মানা হলে এভাবে মরতে হত না। বলঃ (তাক্বদীরে) **যাদের মৃত্যু নির্ধারিত ছিল তারা ঘরে বসে থাকলেও মৃত্যুর স্থানে ছুটে আসতে হত।** (আল্লাহ এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন) তোমাদের অন্তরের বিষয় পরীক্ষা করার জন্য, তোমাদের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য। আল্লাহ অন্তর্জামি। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৫৪)

উদাহরণঃ ১৫ = ঈমান বিনষ্টকারী কুফর সমূহের আরো একটি হচ্ছে আল-কুরআনে বর্নিত কোনো বিধান সমূহের কিছু মানা আর কিছু না মানা অথবা কখনো মেনে চলা আর কখনো অমান্য করা। ইরশাদ হচ্ছে..

ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85)

তথাপিও তোমরা পরস্পরে যুদ্ধ কর, একদল অন্যদলকে ঘর ছাড়া কর, পাপের পথে অন্যায় ভাবে পরস্পরের বিরোদ্ধে সাহায্য কর, আবার কেউ বন্দি হলে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়েও আন। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু মান আর কিছু মান না? যারা এমন করে তাদের পরিণতি দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখেরাতে কঠিন আযাব। আল্লাহ বেখবর নন তোমাদের কাজ সম্পর্কে। (২ বাক্বারাহঃ ৮৫)

জ্ঞাতব্যঃ বানী-ইসরাঈল তথা ইয়াহুদ জাতি আল্লাহর বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। জাতীয় ঐক্য ভঙ্গ করে..

- তারা দলাদলি করত, যা আল্লাহর কিতাবে সুস্পষ্ট ভাবে নিষিদ্ধ ছিল,
- তারা পরস্পরে বিবাদ করত, যা আল্লাহর কিতাবে সুস্পষ্ট ভাবে নিষিদ্ধ ছিল,
- তাদের একদল কাফিরদের এক গোত্রের সাথে এবং অন্যদল অন্য গোত্রের সাথে জোট বেঁধে লড়াই করত, অথচ এটাও নিষিদ্ধ ছিল,
- এতেকরে কখনো একদল ইয়াহুদ এইপক্ষ এবং অন্যদল ওইপক্ষ হয়ে যুদ্ধ করত, এটাও নিষিদ্ধ ছিল,
- যুদ্ধে প্রতিপক্ষের কোনো ইয়াহুদ বন্দি হয়ে এলে (আল্লাহর বিধান মানার জন্য) তারা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে দিত।
- এভাবে তারা কোনো বিষয়ে আল্লাহর বিধান মেনে চলত আর কোনো বিষয়ে জোটের বা মিত্রের বিধান।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর কিতাবের কিছু মানা আর কিছু না মানা কুফর। এমন করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। কোনো মুসলিম এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে যায়। হাদীছের ভাষ্য মতেঃ ইয়াহুদ যত পথে বিভ্রান্ত হয়েছে থিক তত পথে বিভ্রান্ত হবে এই উম্মত। হাদীছের কথা আসলেই সত্য। তখন এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ। আর এখন একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ।

আমাদের যারা এমন করে তারা মুনাফিক হয়ে যায় এবং তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। মুনাফিক চির জাহান্নামী। বিচার দিনে মুনাফিকের জন্য কেউ শাফায়াত করতে পারবে না। মুনাফিক মারা গেলে তার জন্য দোয়া করা এবং তার জানাযায় শরীক হওয়াও নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

উদাহরণঃ ১৬ = ঈমান বিনষ্টকারী কুফর সমূহের আরো একটি হচ্ছে গণক বা জ্যোতিষীর কাছে যাওয়া এবং তাদের কথা বিশ্বাস করা। বর্নিত হচ্ছে..

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ .رواه أبو داود.

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ যেব্যক্তি কোনো কাহিন (জ্যোতিষী) এর কাছে গেল এবং তার কথা বিশ্বাস করল সে মুহাম্মাদের উপর নাযিলকৃত (বিধান ও দ্বীন) এর সাথে কুফর করল। (আবু-দাউদ। হাদীছটি সাহীহ)

উদাহরণঃ ১৭ = ঈমান বিনষ্টকারী কুফর সমূহের আরো একটি কুফর হচ্ছে দ্বীনের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া। যে ব্যক্তি দ্বীনের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেবে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর ঈমান বিনষ্ট হয়ে গেলে আমল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়, তখন এই আমলের বদলে আখেরাতে কিছুই পাওয়া যায় না। ইরশাদ হচ্ছে..

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ (37) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38)فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ(39)

যে ব্যক্তি (আল্লাহ ও রাসূলের) অবাধ্য হবে, দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেবে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (দ্বীনের উপর বা আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া কুফর, বিভ্রান্তির অন্যতম কারন) (৭৯ নাযিয়া'তঃ ৩৭-৩৯)

৩য় সেমিষ্টার **৮ম দিন**

শিরক ও শিরকের পরিনতি

ঈমান বিনষ্টকারী অন্যতম একটি মহাপাপ **শিরক**। অনেকের ধারনা: যারা মুর্তি-পূজা করে কেবল তারাই শিরক করে, শুধু তারাই মুশরিক হয় আর মুসলিমরা সর্বদাই শিরক মুক্ত। বিষয়টি কিন্তু এমন নয়। বরং অনেক মুসলমানও শিরকের সাথে জড়িত। অনেকেই কোনো না কোনো ভাবে শিরকে জড়িয়ে পড়ে। ইসলাম সম্পর্কে যথাযত জ্ঞানের অভাবে বা দলীয় প্রভাবে অথবা অন্য কোনো কারণে মানুষ নিজের ঈমানকে নষ্ট করে ফেলে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ (106)

অনেক মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান আনে তথাপিও মুশরিক থেকে যায় /মুশরিক হয়ে যায়। (১২ ইউসুফ: ১০৬)

মুর্তিপূজা না করেও মানুষ কি ভাবে মুশরিক হয়? নিম্নের উদাহরণ সমূহ থেকে বিষয়টি সহজেই বুঝা যাবে।

উদাহরণঃ ১ = *আল্লাহর উপর ঈমান আনার পরও অনেকে আল্লাহর জাতিসত্তায় শিরক করে। আল্লাহর ছেলে আছে, মেয়ে আছে বলে বিশ্বাস করে। যেমন ইয়াহুদ ও নাসারা। ইরশাদ হচ্ছেঃ*

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

ইয়াহুদ বলে উজাইর আল্লাহর ছেলে আর নাসারা বলে মাসীহ (ঈসা) আল্লাহর ছেলে। এসবই তাদের মুখের কথা। আগেকার কাফিররাও এমন বলত। আল্লাহ ধ্বংস করুক। তারা কিসব রটনা করছে। (৯ তাওবাহ: ৩০)

পর্যালোচনাঃ উজাইর আঃ মরার একশত বছর পর পুনরায় জীবিত হয়েছিলেন (দেখুনঃ সুরাহ বাকারাহ: ২৫৯) এমন আশ্চর্য ঘটনার পর ইয়াহুদ ভাবল উজাইর সাধারন মানুষ নন, তিনি অসাধারন। আর এই অসাধারনতার থিউরী প্রতিষ্ঠিত করতে তারা বলে ফেলল: উজাইর আল্লাহর ছেলে।

ঈসা আঃ বিনা বাপে জন্ম গ্রহন করেছেন। আল্লাহর হুকুমে তিনি মৃতকে জীবিত করতে এবং মাটির মুর্তিতে প্রাণ সঞ্চালন করতে পরতেন। আবার হাওয়ারীদের চুখের সামনেই তিনি আকাশে আরোহন করেছেন। এসব কারণে নাসারা ভেবেছে ঈসা সাধারন মানুষ নন। আর এই অসাধারনতার থিউরী প্রতিষ্ঠিত করতে বলে ফেলছে: ঈসা আল্লাহর ছেলে।

এসবই নবী-রাসুল নিয়ে বাড়াবাড়ির ফল। ইয়াহুদ ও নাসারা তাদের কাছে প্রেরিত নবীকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। নিজেদের খেয়াল খুশিমত মর্যাদা বাড়াতে গিয়ে নবীকে আল্লাহর ছেলে বানিয়ে ফেলেছে। তাইতো হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

عن أبي هريرة عبدالرحمن بن صخر قال :سمعتُ رسول الله ﷺ يقول :ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتُم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرةُ مسائلهم واختلافُهم على أنبيائهم .رواه البخاري ومسلم.

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ আমি যেসব বিষয়ে নিষেধ করি ইহা থেকে বিরত থাকো আর যেসব আদেশ করি যথাসাধ্য মেনে চলার চেষ্টা কর। (অধিক প্রশ্ন বা বাড়াবাড়ি কর না) কারণঃ অধিক প্রশ্ন এবং নবীদের নিয়ে (বাড়াবাড়ির ফলে সৃষ্ট) মতবিরোধ পুর্ববর্তিদের ধ্বংস করে দিয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

কিন্তু দুঃখের বিষয়ঃ নবী সাঃর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা স্বত্বেও আজকাল অনেক মুসলমান ওই নিষিদ্ধ পথেই এগুচ্ছে। তারা নবী সাঃকে নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করছে। নিজেদের খেয়াল খুশিমত মর্যাদা বাড়াতে গিয়ে নবীকে আল্লাহর সমমানে আসীন করে ফেলছে।

ধীরে ধীরে তারা যেন একত্ববাদের বদলে দ্বিত্ববাদে বিশ্বস্থ হয়ে পড়ছে। তারা যেন বলতে যাচ্ছে মুহাম্মাদ আল্লাহর সম্পূরক। তাই যেখানে আল্লাহর নাম সেখানেই মুহাম্মাদ সাঃর নাম যুক্ত করা হচ্ছে। কোথাও **"ইয়া আল্লাহ্"!** লিখলে পাশেই লিখা হচ্ছে **"ইয়া মুহাম্মাদ"!** এভাবেই তারা ধীরে ধীরে দ্বিত্ববাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ইয়াহুদ নাসারাদের মত আল্লাহর ছেলে না বললেও তারা বলছেঃ মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহর নূরেরই অংশ। মানে আল্লাহ থেকেই মুহাম্মাদ, আল্লাহ ও মুহাম্মাদের মূলউৎস একই। এর অর্থ দাড়ায় মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহর অংশ। যা ইয়াহুদ নাসারাদের ছেলে তত্বের চেয়ে আরো জঘন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ ইয়া আল্লাহ্ ও ইয়া মুহাম্মাদ বলার বিধান

বিধানঃ ১ = মুহাম্মাদ সাঃকে খোদা মনে করে এমন করলে শিরক হবে।
বিধানঃ ২ = মুহাম্মাদ সাঃকে খোদার অংশ বা সমমানের মনে করে এমন করলে শিরক হবে।
বিধানঃ ৩ = মুহাম্মাদ সা. হাজির নাযির, তিনি সব জানেন, সব দেখেন। এমন মনে করে ইয়া মুহাম্মাদ লিখলে বা বললে শিরক হবে।
বিধানঃ ৪ = মুহাম্মাদ সাঃ আমাদের কথা শোনে আমাদের প্রয়োজন মিটাবেন; এমন মনে করলেও শিরক হবে।
বিধানঃ ৫ = মুহাম্মাদ সাঃকে মর্যাদা দিতে গিয়ে এমন করলেও শিরক হবার সম্ভাবনাই বেশী।
বিধানঃ ৬ = এসব উদ্দেশ্য না থাকলে শুধু সুন্দর্যের জন্য বা এমনি এমনি লিখলে বা বললে শিরক হবে না তবে ইহাকে ধর্মীয় রূপ দিলে শিরকের দিকে ধাবিত করবে।

উদাহরণঃ ২. আমাদের সমাজের একদল লোক আল্লাহর বৈশিষ্টে অন্যকে শরীক করে ফেলছে। তারা মনে করে: মুহাম্মাদ সাঃ হাজির নাযির তথা সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বদ্রষ্টা। মুহাম্মাদ সাঃ আলিমু-ল-গাইব তথা অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী।

আসলে হাজির নাযির, আলিমু-ল-গাইব, ইত্যাদি একান্তই আল্লাহর বৈশিষ্ট। পবিত্র কুরআনে পরিস্কার ভাষায় বলা হয়েছে: কেউ গাইব জানে না আল্লাহ ছাড়া। ইরশাদ হচ্ছে..

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65)

বলে দাও! আসমান ও যমীনে যারা আছে তাদের কেউ গাইব জানে না আল্লাহ ছাড়া। কেউ জানে না কখন হবে পুনরুত্থান।

(২৭ নামল: ৬৫)

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

বলঃ আমি (নবী মুহাম্মাদ) উপকার, ক্ষতি কিছুই করতে পারি না। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। আমি গাইব জানলে অধিক হারে লাভবান হতাম। কোনো মন্দই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি মুঅমিনদের তরে সুসংবাদ দাতা ও (কাফিরদের তরে) সাবধানকারী বৈ কিছুই নয়। (৭ আ'রাফ: ১৮৮)

আল্লাহর কোনো বৈশিষ্টে অন্যকে বিশেষিত করা বা অন্যকে এমন বৈশিষ্টের অধিকারী মনে করা শিরক, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। এমন পাপ করলে মানুষের ঈমান, ইবাদাত সব নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।

উদাহরণঃ ৩. আমাদের সমাজের অনেকে আল্লাহর প্রভুত্বে শিরক করে থাকেন। তারা আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্যের মনগড়া বিধান মেনে চলেন। আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অন্নদাতা, রিজক দাতা, আশ্রয় দাতা, সুরক্ষা দাতা, বিধান দাতা, নিরাময় দাতা (ইত্যাদি প্রভুত্বের বৈশিষ্টের অধিকারী) মনে করেন। এমন মনে করলে আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ তথা প্রভুত্বে শিরক হয়, যা ঈমান বিনষ্টকারী অন্যতম মহাপাপ। ইরশাদ হচ্ছে..

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

তারা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের হিবর ও রাহিব (উলামা ও পীর)কে রাব্ব (বিধান দাতা) বানিয়ে নিয়েছে এবং মাসীহ বিন মারইয়াম(নবী)কেও (রাব্বের আসনে বসিয়েছে।) অথচ তাদের আদেশ দেয়া হয়েছিল এক ইলাহ মেনে নিতে, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি সকল শিরকের উর্দ্ধে। (৯ তাওবাহ: ৩১)

পর্যালোচনাঃ আহলে কিতাবের যারা ঈমান এনেছিলেন আয়াতটি নাযিলের পর তারা বল*লঃ* ইয়া রাসূলাল্লাহ*! আমরাতো* উনাদের *ইবাদাত করিনি*। রাসুল সাঃ বললেন তাদের বর্নিত বিধান আল্লাহর বিধানের বিপরিত হলেও *তে*মরা মেনে নিতে। (দেখুন তাফসীর কুরতুবী)

আজকাল অহরহ এমনটি করা হচ্ছে। মানুষের মনগড়া বিধান ও নীতিমালা *(*কুরআন সুন্নাহর বিপরিত হলেও*) লো*কজন মেনে নিচ্ছে। ইমাম, দলীয় উলামা, পীর *ও নেতা* মানতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে কুরআন হাদীছ লংঘিত হচ্ছে। আর এভাবে*ই মানুষকে বিধানদাতা রবের আসনে বসিয়ে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক করে যাচ্ছে। ফলে* ঈমান বিনষ্ট হয়ে সবকিছু বরবাদ হয়ে যাচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ নবী-রাসূল, আলিম-উলামা ও পীর-আউলিয়া নিয়ে বাড়াবাড়ি

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যথাযত জ্ঞানের অভাবে আমাদের সমাজের কিছু মানুষ নবীরাসূল, আলিম উলামা ও পীর-আউলিয়া নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করে ফেলেন। আর এই বাড়াবাড়ি শুধু যে এখনই হচ্ছে তাই নয় বরং আগেকার উম্মতের অনেক দল উপদলও এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছে। তাই তো আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাঃ এ বিষয়ে বারবার সাবধান করে গেছেন। বর্নিত হয়েছে..

عن أبي هريرة عبدالرحمن بن صخر قال سمعتُ رسول الله ﷺ يقول :ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتُم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرةُ مسائلهم واختلافُهم على أنبيائهم .رواه البخاري ومسلم.

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: আমি যা নিষেধ করি ইহা থেকে বিরত থাক। আর যা আদেশ করি যথা সম্ভব করে ফেল (অহেতুক প্রশ্ন কর না।) কারণ অধিক প্রশ্ন ও নবীদের নিয়ে (বাড়াবাড়ি এবং এর ফলে সৃষ্ট) বিরোধ আগেকার জাতি সমূহকে ধ্বংস করে দিয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ

হে আহলে কিতাব! দ্বীনি ব্যাপারে অবৈধ বাড়াবাড়ি করো না। এমন লোকদের মনগড়া নীতির অনুকরণ কর না যারা ইতিমধ্যেই বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এবং অনেক মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। (৫ মাইদাহঃ ৭৭)

পর্যালোচনাঃ দ্বীনি ব্যাপারে দলীলহীন বাড়াবাড়ি বিভ্রান্তির পথ। এ পথে বিভ্রান্ত হয়েছিল আগেকার আহলে কিতাব। মহান আল্লাহ্ আল-কুরআনে কথাটি উল্লেখ করে আমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন; আমরা যেন তাদের মত না হই। কিন্তু বর্তমানে অনেক মানুষ আল্লাহ ও রাসূলের হুঁশিয়ারির তোয়াক্কা না করে নিজেদের খেয়ালখুশি মত বাড়াবাড়ি করেই যাচ্ছে।

আজকাল অনেকেই মুহাম্মাদ সাঃকে শাহে দু-আলম (দু-জাহানের অধিপতি) সরকারে দু-আলম (দু-জাহানের কর্তৃত্বশীল) শাহেন শাহে আলম (রাজাধিরাজ) ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করে থাকেন।

অনেকে মনে করে: পীর আউলিয়াগণ মরেন না। তারা কবরে থেকেও মানুষের হাজত পুরা করতে পারেন। তাই তাদের কবরকে মাজার মনে করে হাজিরা দেয়া, সিন্নি দেয়া, নজর ও মান্নত করা, দোয়া চাওয়া ইত্যাদির প্রচলন করা হয়েছে।

কিছু মানুষ বিশ্বাস করে: হাশরের কঠিন বিপদে নবী ও পীর আউলিয়াগণ তাদের উদ্ধার করবেন, আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাবেন। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আসলে এসবই বাড়াবাড়ি। মুহাম্মাদ সাঃ হাশরের অধিপতি নন। হাশরের কর্তৃত্বও তার হাতে থাকবে না। হাশরের একক অধিপতি আল্লাহ তায়া'লা। তাঁর হাতেই সকল কর্তৃত্ব। ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (67) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ((68)

তারা আল্লাহকে সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে পারেনি। কিয়ামতের দিন তিনি সমগ্র পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে নেবেন, আকাশ সমূহ ভাজ করা থাকতে ডান হাতে, (সকল কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব শুধুই তাঁর) তিনি মহান, সকল শিরকের উর্দ্ধে। সিঙ্গা ফুকা হলে আসমান-যমীনের

সব মরে যাবে। তবে আল্লাহ যাদের (বাঁচিয়ে রাখতে) চান (তারা মরবে না।) তারপর আবার সিঙ্গা ফুকা হলে সবাই উঠে দেখতে থাকবে। (৩৯ যুমার: ৬৭,৬৮)

জ্ঞাতব্যঃ ১ম শিঙ্গা ফুকার সময় সবাই মরে গেলেও জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফীন ও মালাকু-ল-মাউত এই চার ফিরিস্তার মৃত্যু হবে না। পরে পর্যায়ক্রমে তিন জনের মৃত্যু হবে। (এ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ হাদীছ আছে, হাদীছটি বর্নিত হয়েছে তাফসীর কুরতুবী, তাবারী এবং তিরমিযীর তাফসীর অধ্যায়ে। আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৩য় বই "যেভাবে ঈমান আনতে হয়" এর ফিরিস্তাদের উপর ঈমান অধ্যায়েও হাদীছটি উল্লেখ আছে)

অন্য হাদীছে বর্নিত হয়েছে..

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্ পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে নেবেন। আকাশ সমূহ ভাজ করে ডান হাতে তুলে নেবেন। তারপর ঘোষণা করবেনঃ আমিই একক অধিপতি। দুনিয়ার মুলুক (রাজা বাদশারা আজ) কোথায়.? (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল সাঃ যেভাবে দু-জাহানের অধিপতি বা রাজা নন, দু-জাহানের কর্তৃত্বশীল নন। ঠিক তেমনি ভাবে শাহেন শাহে আলম (রাজাধিরাজ, সম্রাট) ও নন। উল্লেখ্য শাহেন শাহে আলম ফার্সি শব্দ। এর আরবী হচ্ছে মালিকু-ল-আমলাক। যা আল্লাহর কাছে সব চেয়ে ঘৃনিত নাম। বর্নিত হচ্ছে..

تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺأَخْنَعُ الأَسْمَاءِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الأَمْلاَكِ. [أخرجه البخاري في: 78 كتاب الأدب: 114 باب أبغض الأسماء عند الله]

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃনিত নাম হচ্ছে মালিকু-ল-আমলাক (শাহেন শাহ, রাজাধিরাজ, সম্রাট) (বুখারীঃ ১৩৮৫, মুসলিমঃ ২১৮৩)

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়ঃ যে নাম আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃনিত আজকাল কিছু মানুষ সেই নাম দিয়েই রাসূল সাঃকে বিশেষিত করছে এবং মনে করছে তারা রাসূল সাঃকে মর্যাদা দিচ্ছে, রাসূল সাঃ শান বা না'ত বয়ান করা হচ্ছে, এগুলোকে বলা হচ্ছে না'তে রাসূল। এসবই মানুষের অজ্ঞতা এবং জ্ঞানহীন বাড়াবাড়ির ফসল।

এভাবে যোগে যোগে লোকজন নবী-রাসুল নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে। আর যারাই বাড়াবাড়ি করছে তারাই বিভ্রান্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যেমনঃ নাসারাগণ ঈসা আঃকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا (171) لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (172)

হে আহলে কিতাব! দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। আল্লাহর ব্যাপারে সত্য কথা বল। ঈসা বিন মারইয়াম রাসূল বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ তদীয় বাণী মারইয়ামের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন (এতেই তার জন্ম হয়েছে) সে আল্লাহর পক্ষ থেকে মহাশক্তি (নিয়ে এসেছিল।) সুতরাং তোমরা এক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনো, তৃত্ববাদের কথা বলো না। (এমন ধারনা থেকে) বিরত থাকো, এতেই তোমাদের কল্যাণ। আল্লাহই একক ইলাহ। তিনি সন্তান গ্রহণের উর্দ্ধে। আসমান যমীনের সবকিছুর সার্বিক মালিকানা তাঁর। অবিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। মাসীহ আল্লাহর দাস হতে অস্বীকার করেনি, অস্বীকার করেনি সম্মানিত কোনো ফিরিস্তাও। যে আল্লাহর দাসত্ব অস্বীকার করে, দম্ভ করে (তার জানা উচিত) তিনি সবাইকে তার কাছে জমা করবেন। (৪ নিসাঃ ১৭১-১৭২)

জ্ঞাতব্যঃ "আল্লাহ, ঈসা এবং পবিত্র আত্মা; এই তিনে মিলে খোদা" এমন ধারনাকে বলা হয় তৃত্ববাদ। দ্বীন নিয়ে বা দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে বাড়াবাড়ি করা বিভ্রান্তির পথ। নবী, রাসূল, পীর, উলামা, ইমাম, ফিক্বহ, মিনহাজ, মযহব, দল, ইত্যাদি সবকিছুকেই তার সঠিক অবস্থানে রাখতে হয়। এসব নিয়ে বাড়াবাড়িও বিভ্রান্তি ডেকে আনতে পারে। তাই সকল প্রকার বাড়াবাড়ি থেকে সাবধান থাকা আবশ্যক।

ইয়াহুদ ইবরাহীম আঃকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। তারা বলছেঃ ইবরাহীম আঃ ছিলেন ইয়াহুদ তথা তাদের আদর্শে বিশ্বাসী। তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (65) هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (66)

হে আহলে কিতাব! ইবরাহীম (ইয়াহুদ ছিল, না নাসারা? এ) নিয়ে কেন তর্ক করছ? (ইবরাহীম কি করে ইয়াহুদ বা নাসারা হবে?) তাওরাত ও ইনজিল তার পরে নাযিল হয়েছে। তোমরা কি কিছুই বোঝ না?

তোমরা যা জানো তা নিয়ে তর্ক করতে পার, কিন্তু যা জান না তা নিয়ে কেন তর্ক করছ? (আসল ব্যাপার) আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৬৫-৬৬)

পীর আউলিয়া নিয়ে বাড়াবারিঃ শুধু নবী-রাসূলই নয়, আমাদের সমাজে পীর-আউলিয়া নিয়েও বাড়াবাড়ির অন্ত নেই। যেমন..

অনেকে বলেনঃ "কলন্দর হরকে গুয়দ দিদা গুয়দ"। মানে কলন্দর (ভন্ডদের ৭ম ক্যাডার) যা বলেন দেখে-ই বলেন। তাদের বিশ্বাস কলন্দর সব জানেন, সব দেখেন। বিষয়টি একটু খোলেই বলিঃ

তাদের বিশ্বাসঃ মহান আল্লাহ্ এই মহাবিশ্ব নিয়ন্ত্রনের দায়িত্ব একজন মানুষের উপর ন্যস্ত করে দেন। এই মানুষের উপাধি হলঃ অতদ। সব সময় বিশ্বে একজন অতদ থাকেন। তিনি ধ্যানে মগ্ন থেকে সারা বিশ্ব পরিচালনা করেন। তাদের ধারণা মতে অতদ হচ্ছে তাদের শীর্ষ নেতা তথা ৮ম ক্যাডার।

তারা বিশ্বাস করেঃ অতদ সারা বিশ্বকে ৪ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক ভাগের দায়িত্ব একজনের উপর ন্যস্ত করে দেন, উনাদের বলা হয় কলন্দর। এই পৃথিবীতে সদা ৪জন কলন্দর থাকেন। কলন্দরগণ অতদের অধিনে থেকে নিজ নিজ অঞ্চল (পৃথিবীর ২৫%) নিয়ন্ত্রণ করেন। কলন্দর ভন্ডদের ৭ম ক্যাডার।

কলন্দর আবার দেশে দেশে এবং শহরে শহরে একজন করে কুতুব নিয়োগ দেন। কুতুব নিজ নিজ দেশ ও শহর পরিচালনা করেন। কুতুব তাদের ৬ষষ্ঠ ক্যাডার।

এভাবে পূরা ভন্ডামী পদ্ধতিকে তারা ৮টি শ্রেণীতে বিন্যস্থ করেছে। যথাঃ পীর, মুরিদ, অলী, আবদাল, গৌছ, কুতুব, কলন্দর, অতদ।

কিছু মানুষ মনে করেঃ অলী-আওলিয়াদের অনেক ক্ষমতা। জীবিত বা মৃত সর্বাবস্থায়ই উনারা ক্ষমতাধর। মরার পরও উনারা মানুষের প্রয়োজন মিটাতে পারেন। উনারা পরকালে নিজ নিজ অনুসারীদের জন্য শাফায়া'ত করবেন।

এসব বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তারা জীবিত পীর আওলিয়াদের তাজিম তোয়াজ করেন এবং মরার পর উনাদের কবরকে মাজার বানিয়ে ভক্তির নামে অতি বাড়াবাড়ি করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ আমাদের সমাজ এখন কবরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে ফেলেছে। যথাঃ
ক. সাধারন মানুষের করব। আমাদের সমাজে এই করব গুলোকে করবই বলা হয়।
খ. মাজার বা তথাকথিত পীর আউলিয়াদের করব। আমাদের সমাজে এসব কবরকে মাজার নামে অভিহিত করে ভক্তি করা হয়।
গ. নবী রাসূলগণের করব। আমাদের সমাজে এসব করবকে বলা হয় "রওজা"।

পর্যালোচনাঃ আসলে করব করবই। করব সাধারণ মানুষের হক, পীর আউলিয়ার হক অথা নবী রাসূলের, সকল করবই করব। সকল করবকেই হাদীছে করব বলা হয়েছে। ইহাই ইসলামী বিধান, ইহাই ইসলামী শিষ্টাচার। তাই কোনো করবকে মাজার বা রওজা বলার অবকাশ ইসলামী শারীয়া'হ মতে অনুমোদিত নয়। এসবই করব নিয়ে বাড়াবাড়ির ফসল। আর করব নিয়ে বাড়াবাড়ি বিভ্রান্তির অন্যতম পথ। বর্নিত হচ্ছে..

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خُشي أن يتخذ مسجداً. رواه البخاري (1390) ومسلم.(529)

আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্নিত, মৃত্যু শয্যায় রাসূল সাঃ বলেছেনঃ ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের উপর আল্লাহর লা'নত। তারা (অতি বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে) নবীদের করবকে মাসাজিদ (ইবাদাতের স্থান) বানিয়ে ফেলেছে। আ'ইশাহ রাঃ বলেনঃ এমন আশঙ্কা না থাকলে রাসূলের করবকে উঁচু করা (আলাদা চিহ্নিত করা) হত, কিন্তু আশঙ্কা করা হয়েছে যে (পরবর্তিতে) এটাকে মসজিদ (ইবাদাতের স্থান) বানিয়ে ফেলা হবে।
(বুখারীঃ ১৩৯০, মুসলিমঃ ৫২৯)

عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله ﷺ لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تقول عائشة يُحذِّر مثل الذي صنعوا .رواه البخاري435) ،(436 ، ومسلم. (531).

আ'ইশাহ ও ইবন আ'ব্বাস রাঃ থেকে বর্নিত, মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলে রাসূল সাঃর চেহারা খামীস্বাহ (ছোট চাটাই) দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল। একটু অনুভুতি ফিরে এলে মুখ বের করে তিনি বলছিলেনঃ ইয়াহুদীদের উপর আল্লাহর লা'নত। তারা (অতি বাড়াবাড়ি করে) নবীদের করবকে মাসাজিদ (ইবাদতের স্থান) বানিয়ে নিয়েছে। আইশাহ রাঃ বলেছেনঃ তিনি আশঙ্কা করছিলেন তারা যেমনটি করেছে (তার করবকেও) এমনি করা হবে। (বুখারীঃ ৪৩৫, ৪৩৬, মুসলিমঃ ৫৩১)

عن عائشة رضي الله عنها **قالت لما كان مرض النبي** صلى الله عليه وسلم **تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة فذكرن من حسنها وتصاويرها قالت فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ثم صوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة .** رواه البخاري (427) ومسلم (528)

আ'ইশাহ রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ তখন অসুস্থ (মৃত্যু শয্যায়), তার স্ত্রীগণ হাবশাহর (আফ্রিকার) মারিয়াহ নামক একটি কানীসাহ (উপাসনালয়) নিয়ে আলোচনা করছিলেন। (রাসূলের স্ত্রীদের মাঝে) উম্মু সালামাহ এবং উম্মু হাবীবাহ হাবশাহ দেশে গিয়ে ছিলেন। উনারা এর সুন্দর্য এবং তাম্বাওয়ীর (ছবি, মুর্তি, ভাস্কর্য) এর কথা বর্ননা করলেন। (উনাদের কথা শোনে) নবী সাঃ মাথা তোলে বললেনঃ তাদের অভ্যাস হলঃ তারা নেক লোকদের করবকে মসজিদ (উপাসনালয়) বানিয়ে ফেলে। পরে স্বুওয়ার (ছবি, মুর্তি, ভাস্কর্য) বানিয়ে সেখানে স্থাপন করে। (যারা এমন করবে) কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হবে। (বুখারীঃ ৪২৭, মুসলিমঃ ৫২৮)

শিরকের সূত্র সমূহঃ পীর আউলিয়া বা নবীরাসূল নিয়ে বাড়াবাড়ি, কবর নিয়ে বাড়াবাড়ি, ছবি মুর্তি ও ভাস্কর্য সংস্কৃতি, ইত্যাদি বিষয়গুলোর মূলউৎস সনাতন ধর্ম। এমন সংস্কৃতি মূর্তি পূজাকে উৎসাহিত করে। "প্রতিকৃতি থেকে মুর্তি আর মুর্তি থেকে দেবদেবী" এমন সূত্র ধরেই মানব সমাজে মূর্তি পূজার প্রচলন হয়েছে এবং এমন ধারনা থেকেই হিন্দুরা মুর্তিপূজা করে থাকে।
আমাদের সমাজের হিন্দুরাও এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তারাও বিশ্বাস করে ইশ্বর এক। তবে তারা মনে করে..

- কিছু মহামানব পার্থিব জীবনে ঈশ্বরকে খুশী করে ফেলেছেন এবং ঈশ্বরের আশির্বাদ পেয়ে অমর হয়ে গেছেন,
- দুনিয়াতে এরা ঈশ্বরের অবতার,
- এরা তাদের অনুসারীদের জন্য ঈশ্বরের কাছে সুপারিশ করেন,
- ঈশ্বরও এদের কথা শোনেন,
- তাই দুনিয়াতে এরা দেবতূল্য,
- এদের খুশী করতে পারলে ঈশ্বরও খুশী হন।

আর এমন বিশ্বাস থেকেই তারা এদের মুর্তি বানিয়ে ভক্তি করে থাকে। আল-কুরআন এমন ধারনাকে মূর্তিপূজার উৎস হিসাবে উল্লেখ করেছে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (18)

তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের (মুর্তি, পাথর, গাছ, মানুষ, নদী, সূর্য, চন্দ্র বা অন্য বস্তুর) এবাদত করে এরা তাদের উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে পারবে না। তারা বলেঃ (আমরা এদের ভক্তি বা পূজা করি যেন) এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য শাফায়া'তকারী। বলঃ তোমরা কি আসমান যমীনের এমন কোনো ব্যাপারে আল্লাহকে জানাতে চাও যা তিনি জানেন না? তিনি মহান, সকল শিরকের উর্দ্ধে। (১০ ইউনুসঃ ১৮)

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (94)

(পরকালে বলা হবে) আজ সবাই একা একা এসেছ, যেমন প্রথম সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম সব ফেলে এসেছ। (তারপর আল্লাহ্ বলবেন) তোমাদের সঙ্গে তাদের দেখছিনা যে. যাদেরকে তোমরা শুরাকা ও শাফায়া'তকারী মনে করতে। তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল.?! তোমাদের ধারনা ব্যর্থ হয়ে গেল?! (৬ আনয়া'মঃ ৯৪)

জ্ঞাতব্যঃ ইসলামী আক্বীদাহ মতে "সকল মুঅমিনই আল্লাহর ওয়ালী। কুরআনের পথে অবিচল থাকা এবং তাকওয়া অনুপাতে মানুষ আল্লাহর কাছে সম্মানিত হয়।" (আক্বীদাহ আল-তাহা'বিয়্যাহঃ আক্বীদাহঃ নং ৬৫, পৃঃ ২৭)

পর্যালোচনাঃ আখেরাতের বিচার দিনে নবী রাসূল, শহীদ এবং সৎ মুঅমিনগণ পাপিষ্ঠ ফাসিকদের জন্য শাফায়া'ত করবে; একথা সত্য। কিন্তু এ শাফায়া'তের সম্পূর্ন কর্তৃত্ব থাকবে আল্লাহর হাতে। কে শাফায়া'ত করবে, কার জন্য শাফায়া'ত করবে ইহা শুধু আল্লাহই জানেন। তিনি যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার জন্য অনুমতি দেবেন কেবল সেই তার জন্য শাফায়া'ত করতে পারবে। আর ইহা আমরা জানতে পারব পরকালে, উপস্থিত সময়ে। তাই দুনিয়ার জীবনে নিজের জন্য শাফায়া'ত কারী ঠিক করে তাদের ভক্তি করা বা তোয়াজ করা ইসলামী সংস্কৃতি বিরোধী, আল্লাহর কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপের শামিল। বরং ইহা শিরকের সূত্র সমূহের একটি। যেসব সূত্র ধরে মানব সমাজে শিরক শুরু হয়েছে এটা হচ্ছে এর অন্যতম।

উল্লেখ্য মানুষের মাঝে একই সাথে পরস্পর বিরোধী দুটি প্রবণতা কাজ করে। যেমনঃ মানুষের ভিতরে আছে দাম্ভিকতা এবং আত্মসর্পনের প্রবণতা। একই ব্যক্তি একই সময়ে কারো সাথে দম্ভ দেখায় আবার কারো কাছে আত্মসমর্পন করে। তাই মানুষের এই পরস্পর বিরোধী প্রবনতাকে কাজে লাগাতে মহান আল্লাহ্ এক সুন্দর ব্যবস্থা দিয়েছেন। মানুষ সদা সর্বদা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করবে এবং শয়তানের সাথে দম্ভ দেখাবে, শত্রুতা রাখবে।

মহান আল্লাহ্ মানুষের সুবিধার জন্য কতকিছু সৃষ্টি করেছেন, দিয়েছেন কত নিয়ামত। তাই মানুষের উচিত ছিল আল্লাহর নিয়ামত অনুধাবন করে আল্লাহর শোকর আদায় করা এবং আল্লাহর প্রতি ধাবিত হওয়া।
কিন্তু কিছু মানুষ উলটা পথে চলে। তারা উপকারী বস্তু সমূহকে আল্লাহর নিয়ামত হিসাবে না দেখে প্রাকৃতিক শক্তি হিসাবে বিবেচনা করে এবং এই শক্তির কাছে আত্মসমর্পন করে ইহাকে দেব তূল্য আখ্যা দিয়ে ভক্তি বা তোষণ করে। যেমনঃ তারা মনে করে..

- চন্দ্র আলো দেয়। তাই চন্দ্র একটি দেবতা চন্দ্র দেবতা।
- সূর্য তাপ দেয়। তাই সূর্য একটি দেবতা, সূর্য দেবতা।
- গাভী দুধ দেয়। তাই গাভী একটি দেবতা, গো-দেবী বা গো-মাতা।
- গাছ ছায়া দেয়। তাই (গাছের প্রতিনিধি হিসেবে) বট গাছ একটি দেবতা।
- নদী পানী দেয়। তাই নদী (গঙ্গা) একটি দেবতা।
- দেশ খাদ্য দেয়, আশ্রয় দেয়। তাই দেশ একটি দেবী, দেশ মাতা, দেশ মাতৃকা। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এসব দেবতত্ব হিন্দুদের ধর্মীয় বাণী। তারা দেবতাকে মাতা বলে অভিহিত করে। তাই দেশকে দেব-মর্যাদা দিয়ে বলে "ভারত মাতা"। রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর এক গানে লিখেছেন "ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা"।

অন্যত্র লিখেছেনঃ "...তুমি সব মাতার মাতা"। মানে তুমি সকল দেবীর বড় দেবী। কুদিরামের গানে ভারতকে মা হিসেবে সম্বোধন করে বলা হয়েছে "একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি"। এভাবে আরো অনেক গানে, কবিতায় ও গল্পে দেশকে "মা" বলা হয়েছে।

আর এরই ধারাবাহিকতায় দেশকে মাতা বা দেবী আখ্যা দিয়ে তৈরি হয়েছে দেশ মাতৃকার দর্শন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঈমান আক্বীদাহ সম্পর্কে পরিপক্ক জ্ঞানের অভাবে অনেক মুসলিমও এমন কথা বলে থাকেন। আর এমন মন মানসিকতা থেকেই সমাজে প্রচলিত হয়েছে নানা উক্তি। যেমনঃ মানুষ সুন্দর্যের পূজারী। মানুষ অভ্যাসের দাস। মনি ইস গড। ইত্যাদি।

যেসব সূত্র ধরে মানব সমাজে শিরকের প্রচলন হয়েছে এর অন্যতম কয়েকটি হল..

- প্রতিকৃতি থেকে মুর্তি, মুর্তি থেকে দেবদেবী। (এই সূত্র ধরে মানুষ মুর্তি পূজায় জড়িয়ে পড়ে)
- কারো প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধা নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি। (এই সূত্র ধরে শুরু হয় পীর পূজা, মাজার পূজা ও নবী পূজা)
- ধর্মীয় ব্যাপারে দলীল বিহীন বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্ঘন। (এই সূত্র ধরেই উলামা ও পীরদেরকে রাব্বের আসনে বসানো হয়)
- ধর্মীয় বিষয়াদির মনগড়া বিশ্লেষণ। (নবী হাজির নাযির, নবী আলিমু-ল-গাইব, ইত্যাদি শিরক শুরু হয়েছে এই সূত্র ধরে)
- আক্বীদাহ প্রমানের জন্য উস্বূলের (দালিলিক নীতিমালার) তোয়াক্কা না করা। (এর মূলকারণ দলাদলি ও দলীয় দর্শন প্রমানে অতি উৎসাহী হওয়া। এই সূত্র ধরে শুরু হয়েছে "নবী নূরের তৈরি" এর মত শিরক)
- ঈমান আক্বীদাহ সম্পর্কে পরিপক্ক জ্ঞানের অভাব। (এই সূত্র ধরে মেনে নেওয়া হয়েছে "জনগণের সার্বভৌমত্ব" "জনগণ ক্ষমতার উৎস" "আইন বানাতে সার্বভৌম" ইত্যাদি বিশ্বাস)

উদাহরণঃ ৪. ঈমান বিনষ্টকারী আরো একটি শিরক হল আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করা বা অন্যকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী মনে করা। আসলে শুধু আল্লাহর মালিকানা-ই সার্বভৌম এবং শুধু আল্লাহর ক্ষমতা-ই নিরঙ্কুশ। আল্লাহ ছাড়া অন্যকারো মালিকানা সার্বভৌম নয়, অন্য কারো ক্ষমতা নিরঙ্কুশ নয়।

উল্লেখ্য মালিকানা দুই প্রকার। বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।

- যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় নিয়ম বা বিধান মেনে চলতে হয়, ইহা হচ্ছে বিধিবদ্ধ মালিকানা। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ।
- পক্ষান্তরে যে মালিকানা কোনো আইন বা নিয়মের আওতাধীন নয়, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায়, ইহা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা। একমাত্র আল্লাহর মালিকানাই সার্বভৌম।

আল্লাহ ছাড়া অন্যকারো মালিকানা সার্বভৌম নয়, অন্যকারো ক্ষমতাও নিরঙ্কুশ নয়। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবাই নিজ নিজ মালিকানা ও ক্ষমতা প্রয়োগে রাষ্ট্র, সমাজ, বিবেক এবং সর্বোপরি মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ (6)

আসমানে যা আছে, যমীনে যা আছে, আসমান যমিনের মধ্যে যা আছে এবং পাতালপুরীতে যা আছে সবকিছুর সার্বিক মালিকান আল্লাহর (২০ ত্বাহাঃ ৬)

فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ	তিনি (আল্লাহ্) যা ইচ্ছা তাই করেন। (৮৫ বুরুজঃ ১৬)

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

তাকে (আল্লাহকে) কোনো কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয় না। কিন্তু তাদেরকে (আল্লাহ্ ছাড়া বাকি সবাইকে নিজ নিজ কাজের জন্য) জবাবদিহি করতে হয়। (২১ আনবিয়াঃ ২৩)

উদাহরণঃ ৫. আল্লাহর ইবাদাত করতে যেসব কাজ করা হয় আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য এমন কিছু করা শিরক, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যেমন..

নামাযঃ নামাযে আমরা আল্লাহর সামনে বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকি বা বসে থাকি, বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কিছু পাঠ করি, মাথা নত করি, সিজদাহ করি। তাই আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য এমন কিছু করলে শিরক হবে এবং ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

নিশ্চয় সকল ইবাদাতের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্। তাই আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না। (৭২ জিন্নঃ ১৮)

যাকাত ও সাদাকাতঃ আমরা উৎপাদিত ফসল, উপার্জিত সম্পদ ও নিয়ন্ত্রণাধীন পশুপাখি আল্লাহর রাহে দান করি, আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করি, বিসর্জন দেই। সুতরাং আল্লাহর ছাড়া অন্যের জন্য এমন কিছু করা শিরক, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। বর্নিত হচ্ছে..

وعن طارق بن شهاب أن رسول الله ﷺ قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب .قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال :ليس عندي شيء أقرب .قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله؛ فدخل النار .وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه؛ فدخل الجنة رواه أحمد.

তারিক বিন শিহাব থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ একটিমাত্র মাছির কারণে একব্যক্তি জান্নাতে গিয়েছে এবং একটিমাত্র মাছির কারণে একব্যক্তি জাহান্নামে গিয়েছে। লোকজন বললঃ কী ভাবে ইয়া রাসূলাল্লাহ!? তিনি বললেনঃ এক জনপদে একটি মুর্তি ছিল। (এলাকা বাসী এই মুর্তির পূজারী ছিল। মুর্তিটি তারা রাস্তার ধারে স্থাপন করেছিল।) মুর্তিকে কিছু উৎসর্গ না করে কেউ এটা অতিক্রম করতে পারত না। একদা দুইজন (মুসলিম) ব্যক্তি এটা অতিক্রম করছিল। একালাবাসী ১ম জনকে বললঃ মুর্তিকে কিছু দিয়ে যাও। লোকটি বললঃ দেয়ার মত আমার কাছে কিছু-ই নেই। লোকজন বললঃ একটি মাছি হলেও দিয়ে যাও। লোকটি একটি মাছি উৎসর্গ করল। লোকজন তার পথ ছেড়ে দিল। (আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য মাছি উৎসর্গ করার কারণে লোকটি মুশরিক হয়ে গেল।) সে জাহান্নামী হয়ে গেল। তারপর ২য় ব্যক্তিকে বললঃ কিছু উৎসর্গ কর। সে বললঃ আমি আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য কোনোকিছু উৎসর্গ করি না। (একথা শোনে এলাকাবাসী ক্ষেপে উঠল। তারা ইহাকে খোদার অবমাননা হিসাবে আখ্যায়িত করে) লোকটির গর্দার কেটে ফেলল। (এভাবে শহীদ হয়ে) সে জান্নাতে চলে গেল।

সূত্রঃ আহমদ। শব্দগত সামান্য পরিবর্তণ সহ সালমান ফার্সি রাঃ থেকে হাদীছটি অন্য ভাবেও বর্নিত হয়েছে এবং এ বর্ননাটি সাহীহ। অর্থ প্রায় সমানই, তাই পুনরায় লিখা হল না। তবে সাহীহ সনদসহ আরবী ইবারাত নীচে দেয়া হল..

هذا الأثر إنما يصح من قول سلمان رضي الله عنه؛ كما رواه الإمام أحمد في "الزهد" (84) قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ. قَالُوا وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لَا يَجُوزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا قَرِّبْ! قَالَ لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ فَقَالُوا لَهُ قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا! فَقَرَّبَ ذُبَابًا فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ. قَالَ فَدَخَلَ النَّارَ. وَقَالُوا لِلْآخَرِ قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا! قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: فَضَرَبُوا عُنُقَهُ قَالَ: فَدَخَلَ الْجَنَّةَ . وصححه الألباني موقوفا على سلمان رضي الله عنه، كما في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (12 / 722)؛ حيث قال: " وبالجملة؛ فالحديث صحيح موقوفا على سلمان الفارسي رضي الله عنه " انتهى

উপরের হাদীছ এবং নীচের হাদীছ একই হাদীছ। উপরের বর্ননায় বলা হয়েছে "রাসূল সাঃ বলেছেন" আর নীচের বর্ননায় বলা হয়েছে "সালমান (ফার্সি) রাঃ বলেছেন"। হাদীছের ভাষ্য এবং অর্থ প্রায় সমান। তবে সনদ ভিন্ন হবার কারনে উপরের সনদটি দ্বাইফ এবং নীচের সনদটি সাহীহ।

রোজাঃ আমরা আল্লাহর জন্য সাওম সাধন করি তথা রোজা রাখি এবং রোজা রাখতে গিয়ে নির্ধারিত সময়ের জন্য খাদ্য, পানীয়, যৌন সম্ভোগ বর্জন করে থাকি। সুতরাং আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য এমন ভাবে কিছু বর্জন করা শিরক হিসেবে গন্য হবে।

হাজ্জঃ আমরা আল্লাহর জন্য হাজ্জ করি এবং হাজ্জ করতে গিয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ (নির্ধারিত নিয়মে প্রদক্ষিণ) করি, স্বাফা মারওয়া সায়ী' (নির্ধারিত পদ্ধতিতে গমন) করি, নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত সময়ে আরাফাত, মুজদালিফা ও মিনায় **অবস্থান** করি। উচ্চস্বরে (নির্ধারিত) তালবিয়্যাহ পাঠ করি। সুতরাং আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য এমন কিছু করা শিরক হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (69)إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (70)قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (71)قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72)أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73)قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ (74)قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75)أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (77)الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79)وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (81) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ

(হে নবী!) তাদের কাছে ইবরাহীমের ঘটনা বর্ণনা কর, যখন সে পিতাকে এবং সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা কিসের ইবাদাত কর? তারা বললঃ আমরা প্রতিমা পূজা করি, (নির্ধারিত দিনে) তাদের কাছে অবস্থান করি। (নির্ধারিত দিনে কোনো মুর্তি, প্রতিমা, স্থান বা স্থাপনার কাছে হাজির হয়ে এটাকে সম্মান জানানো ইবাদাতের শামিল। এমন করা শিরক)
ইবরাহীম বললঃ তোমরা ডাকলে তারা কি শোনে? অথবা তোমাদের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে? তারা বললঃ পূর্ববর্তিদের এমন করতে দেখেছি (যুগযুগ ধরে চলে আসা জাতীয় সংস্কৃতির অংশ হিসেবে আমরাও করছি)
ইবরাহীম বললঃ তোমরা ও তোমাদের পূর্ববর্তিরা যাদের ইবাদাত করছ এদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? এরা (কত অলিক ও অক্ষম। এই অলিক খোদারা) আমার শত্রু, শুধু রাব্বু-ল-আ'লামীন ছাড়া। তিনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন, হেদায়াত করেছেন। তিনি আমাকে খাদ্য দান করেন, পানীয় দান করেন। আমি অসুখ হলে তিনিই আরোগ্য করেন (একমাত্র আল্লাহই আরোগ্য দাতা, ঔষধ বা ডাক্তার আরোগ্যের মাধ্যম হতে পারে, আরোগ্য দাতা নয়) তিনিই আমাকে মৃত্যু দেবেন এবং পুনরায় জীবিত করবেন। আমি আশা করি বিচার দিনে আমার পাপ সমূহও তিনি মাফ করে দেবেন। (২৬ শুয়া'রাঃ ৬৯-৮২)

পর্যালোচনাঃ আমরা আল্লাহর ইবাদাত করতে যা করি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য এমন করলে যেমন শিরক হয়, তেমনি ভাবে অন্য লোকেরা তাদের দেবতার জন্য যা করে (এসব যদি ইসলামে নিষিদ্ধ হয় তবে) আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য এমন কিছু করলেও শিরক হবে।
ঈমান ও আক্বীদাহঃ নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করাও ইবাদাতের অংশ। তাই আল্লাহর অনুমোদন ব্যতীত কোনো স্থান, স্থাপনা বা অন্যকিছুকে কেন্দ্র করে এমন করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩য় সেমিষ্টার ৯ম দিন

হিজাব

আমাদের নারী সমাজের উপর আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হলো হিজাব করা। হিজাব আসলে ব্যক্তিগত ফরজ হলেও সমাজের উপর এর প্রভাব অনেক বেশী। তাই এটাকে সামাজিক ফরজও বলা চলে। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)

আর মুঅমিনাহ নারীদের বলে দাওঃ

- তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে আর
- তারা যেন (মাহরাম নয় এমন পুরুষের সামনে) নিজেদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ না করে তবে যতটুকু (সাধারণত) প্রকাশ হয়ে যায় (ততটুকু প্রকাশ করা দোষের নয়।)
- আর তারা যেন তাদের বক্ষদেশ ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখে
- এবং তারা যেন (অন্য লোকদের কাছে) নিজের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন না করে। তবে আপন স্বামী, নিজের বাপদাদা, স্বামীর বাপদাদা, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে (যারা অন্য স্ত্রীর গর্ভ থেকে জন্মেছে) নিজের ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, নিজের মালিকানাধীন দাস, যৌন কামনাহীন পুরুষ এবং এমন বালক যারা নারীদের গোপন বিষয় বুঝে না (এসব পুরুষের সামনে সৌন্দর্য্য প্রকাশে পাপ হয় না।)
- আর (নারীরা যেন পথ চলার সময়) তাদের গোপন সৌন্দর্য সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্য পা দিয়ে (জমীনে সজোরে) আঘাত না করে।

হে মুঅমিনগণ! তোমরা সবাই (পাপের পথ ত্যাগ করে) আল্লাহর দিকে ফিরে আসো, এতে তোমরা সফল হতে পারবে। (২৪ নূরঃ ৩১)

জ্ঞাতব্যঃ এখানে মুঅমিনাহ নারীদের বলা হয়েছে..

- তারা যেন নিজের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে মানে এর অবৈধ ব্যবহার থেকে নিজের যৌনাঙ্গকে বাঁচিয়ে রাখে।
- তারা যেন (মাহরাম ব্যতীত অন্য) পুরুষদের কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।

সুতরাং যৌনাঙ্গের হেফাজত করা তথা অবৈধ যৌন সঙ্গম থেকে বিরত থাকা পুরুষ ও নারী সকলের উপর-ই ফরজ। আর নারীদের জন্য বিশেষ ফরজ হচ্ছে অনুমোদিত মাহরাম পুরুষ ছাড়া অন্য সকল পুরুষের সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ না করা। এ দুটি বিষয়ে আয়াতের বাণী সুস্পষ্ট। তাই এ ব্যাপারে দ্বিমতের কোনো সুযোগ নেই। ফলে কোনো দ্বিমত সৃষ্টি হয়নি।
তবে এরপর বলা হয়েছে **"যতটুকু সাধারণত প্রকাশ হয়ে যায়"**। (ইল্লা মা যাহারা মিনহা) মানে নারী সৌন্দর্যের যতটুকু সাধারণত প্রকাশ হয়ে যায় ততোটুকু প্রকাশের অনুমোদন। তবে কোন কোন অঙ্গ বা কতটুকু প্রকাশ করা যাবে; একথাটি স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তাই এখানে দ্বিমতের অবকাশ তৈরি হয়েছে এবং দ্বিমত সৃষ্টি হয়েছে। এবার আসুন এ দ্বিমত সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জেনে নেই।
"যতটুকু সাধারণত প্রকাশ হয়ে যায়"। (ইল্লা মা যাহারা মিনহা) এর মর্ম বুঝাতে তাফসীর জালালাইনে লিখা হয়েছেঃ মুখমন্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত। (অর্থাৎ সাধারণ ভাবে নারীর মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত পরপুরুষের সামনে উন্মুক্ত থাকতে পারবে।)
বিষয়টি উল্লেখ করে ইমাম কুরতুবী তদীয় তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন এ বিষয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। যেমন..
১. ইবন মাসউদ রাঃ বলেছেঃ সাধারন সৌন্দর্য মানে পোশাকের সৌন্দর্য।
২. আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাঃ বলেছেনঃ মুখমণ্ডল।
৩. আ'ত্বা ও আওযায়ী বলেছেনঃ মুখমণ্ডল, হাত ও পোশাক।
৪. ইবন আব্বাস রাঃ, ক্বাতাদাহ গং বলেছেনঃ মেকআপ, হাতের বালা, মধ্যহাত পর্যন্ত লাগানো মেহদী, কানের দুল, আল-ফাতাখ (মেয়েদের হাতে বা পায়ে লাগানো অলংকার) এবং এ জাতীয় অলংকারাদী। এসব (অলংকার পরিহিত অবস্থায়) আগত পুরুষকে দেখানো বৈধ।

এতোটুকু বর্ণনা করার পর ইমাম কুরতুবী একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতে ইমান রাখে সে যেন বালিগাহ হয়ে যাবার পর তার মুখমণ্ডল এবং হাতের এতোটুকু (মধ্যহাত ধরে দেখিয়েছেন) ব্যতীত অন্য সৌন্দর্য্য প্রকাশ না করে।

তারপর ইমাম কুরতুবী বলেছেনঃ এটা-ই হাসান বসরীর মত। তিনি বলেছেনঃ মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত খুলে রাখা মানুষের সাধারণ অভ্যাস এবং সালাত ও হাজ্জের মত ইবাদাতেও এতোটুকু খুলে রাখার বিধান রয়েছে। তাই আয়াতের এ অর্থ বুঝাই উত্তম।

আবু-দাউদে বর্ণিত এক হাদীছে আ'ইশা রাঃ বলেনঃ একদা (আমার বোন) আসমা বিনত আবু-বাকর আমার কাছে এলেন। তার পড়নে দাসীদের মত (সর্ট) কাপড় ছিল। রাসূল সাঃ এটা অপছন্দ করলেন এবং বললেনঃ আসমা! মেয়েদের ঋতুস্রাব (বালিগাহ) হয়ে গেলে তার এতোটুকু ছাড়া অন্য অঙ্গ খোলা রাখা উচিত নয়। একথা বলে তিনি মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম কুরতুবী বলেছেনঃ সাবধানতার জন্য এটা-ই সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা।

বর্ণিত আছে একদা উম্মু মাকতুমের ছেলে অন্ধ সাহাবী রাসূল সাঃর কাছে এলেন। তখন সেখানে রাসূল সাঃ'র দুজন স্ত্রী উম্মু সালামাহ ও মাইমূনাহ উপস্থিত ছিলেন। রাসূল সাঃ তাদের হিজাব করতে বললেন। তারা উত্তর দিলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! উনি তো অন্ধ। রাসূল সাঃ বললেনঃ তোমরা তো অন্ধ নও, তোমরা তো দেখতে পাও। (হাদীছটি বর্ণনা করার পর ইমাম কুরতুবী বলেছেনঃ (অধিকাংশ) মুহাদ্দিছগণের মতে হাদীছটি সাহীহ নয়। (তবে কারো কারো মতে সাহীহ।)

সূত্রঃ উল্লেখিত মতামতসমূহ তাফসীর কুরতুবী থেকে আনা হয়েছে এবং তাফসীত তাবারীতেও অনুরূপ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ফিক্বহ বিশ্লেষনঃ

১. (আবু-হানীফাহ রাহিঃ'র বিশিষ্ট শিষ্য) মুহাম্মাদ বিন হাসান আল-শাইবানী তদীয় কিতাব "আল-আসল" এ লিখেছেন..

يقول محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الأصل (٢ /٢٣٥-٢٣٦) أما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ، ولا حرمة ، ممن يحل له نكاحها : فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا ؛ إلا الوجه والكف ، ولا بأس أن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ، ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها. وهذا قول أبي حنيفة.
وقال الله تبارك وتعالى وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، ففسر المفسرون أن ما ظهر منها : الكحل والخاتم ، والكحل زينة الوجه ، والخاتم زينة الكف ، فرخص في هاتين الزينتين . ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها ؛ إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها . فإن كان ذلك ، فليس ينبغي له أن ينظر إليه

"একজন স্বাধীন নারী তার স্বামী ও মাহরাম পুরুষ ব্যতীত অন্য পুরুষের সামনে তার মুখমণ্ডল আর হাত ছাড়া অন্য অঙ্গ খোলা রাখবে না এবং পুরুষরাও স্বাধীন নারীর মুখ আর হাত ছাড়া অন্য অঙ্গের দিকে (ওই অঙ্গ খোলা অবস্থায়) দৃষ্টি দেবে না তবে মুখ ও হাতের দিকে দৃষ্টি দিতে সমস্যা নেই। এটাই আবু-হানীফাহর মাযহাব।

কারণঃ আল্লাহ্ তায়া'লা বলেছেন মুঅমিনাহ নারীদের বলে দাওঃ তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজ নিজ যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ না করে তবে যতটুকু (সাধারণত) প্রকাশ হয়ে যায়..। এখানে "যতটুকু সাধারণত প্রকাশ হয়ে যায়" এর বিশ্লেষণে মুফাসসীরগণ বলেছেনঃ কুহুল (মেকআপ) আর আংটি। মেকআপ মুখের সুন্দর্য আর আংটি হাতের সুন্দর্য। তাই এ দুই অঙ্গ খুলে রাখা অনুমোদিত এবং মুখ ও হাতের দিকে দৃষ্টিপাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু দৃষ্টিপাতে যদি ওই নারীর প্রতি কামভাব এসে যায় তবে তাকানো উচিত নয়। (আল-আসলঃ ২/২৩৫ ও ২৩৬)
উল্লেখ্যঃ ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃ'র নিজের লেখা তেমন কোনো কিতাব নেই। উনার মাযহাবের মূল কিতাব সমূহের অধিকাংশই উনার শিষ্য মুহাম্মাদ বিন হাসান আল-শাইবানীর লিখা।

২. ইমাম মালিক রাহিঃ'র মাযহাব সম্পর্কে উনার শিষ্যদের বক্তব্য হচ্ছে..

حيث هناك نصوص ظاهرة عن الإمام مالك منقولة عنه في المدونة والعتبية على أن الوجه والكفين ليسا بعورة ، لكن يمكن أن يكابر فيها هؤلاء المعاندون بغرور ، وقد فهمها علماء المالكية على وجهها ، أنها تدل على جواز كشف الوجه والكفين . وهو مذهب مالك الذي ينقله عنه أتباع مذهبه المتقدمون منهم والمتأخرون في مدرستيهم المشرقية والمغربية : كإسماعيل القاضي و ابن أبي زيد القيرواني و القاضي عبد الوهاب البغدادي و ابن عبد البر و ابن رشد الجد والحفيد و المازري و القاضي عياض وغيرهم

অর্থাৎ ইমাম মালিক রাহিঃর প্রথম সারির ও পরবর্তী সময়ের শিষ্যদের মাঝে কাজী ইসমাইল, ইবনু আবী-যাইদ, কাজী আব্দুল ওয়াহহাব, ইবনু আব্দু-ল-বিরর, ইবনু রুশদ, আল-মাযুরী, কাজী ইয়াদ্বসহ আরো অনেকেই ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম মালিকের মাযহাব হলঃ মুখ আর হাত সতর নয় বরং মুখ আর হাত খোলা রাখা বৈধ।

সূত্রঃ কথাগুলো বর্ণিত হয়েছে মালিকী মাযহাবের দুটি প্রসিদ্ধ কিতাব "আল-মুদাউওয়ানাহ এবং আল-আ'তাবিয়্যাতে।

৩. ইমাম শাফিয়ী রাহিঃ তদীয় কিতাব "আল-উম্ম" এ লিখেছেন..

قال الشافعي في الأم : (109 /1) **وعورة الرجل ما دون سرته إلى ركبتيه ، ليس سرته ولا ركبتاه من عورته وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل بدنها ما عدا كفها ووجهها** . «وقال أيضا» : (1/109) **وعورة الرجل ما وصفت ، وكل المرأة عورة ؛ إلا كفيها ووجهها ، وظهر قدميها عورة .**
ونقل المزني عن الشافعي أنه فسر الآية { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } ، بأنها الوجه والكفان

অর্থাৎঃ পুরুষের সতর হল নাভির নীচ থেকে হাটু পর্যন্ত। নাভী আর হাটু সতরের অন্তর্গত নয়। আর নারী তার হাত আর মুখ ছাড়া সমস্ত শরীর ঢেকে রাখবে। (আল-উম্মঃ ১/১০৯)
ইমাম শাফিয়ী' আরো লিখেছেনঃ পুরুষের সতর হল যা আমি বলেছি আর নারীর সমস্ত দেহটাই সতর, শুধু কব্জি পর্যন্ত হাত, মুখমণ্ডল আর পায়ের পাতার উপরের অংশ ছাড়া। (আল-উম্মঃ ১/১০৯)
ইমাম মুযানী ইমাম শাফিয়ী' থেকে বর্ণনা করেছেন উক্ত আয়াতে "যতটুকু সাধারণত প্রকাশ হয়ে যায়" এ বাক্যের তাফসীরে ইমাম শাফিয়ী বলেছেনঃ মুখমণ্ডল আর হাত।

সূত্রঃ ফিক্বহ বিশ্লেষণের মতামতগুলো আনা হয়েছে ডঃ শরীফ হাতিম বিন আরিফ আল-আউনী হাফিঃর ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট থেকে।

৪. আর হাম্বলী মাযহাব সম্পর্কে ইসলাম ওয়েব (ফতোয়া নঃ ৫০৭৯৪) এ লিখা হয়েছে.. (ইমাম) ইবনু কুদামাহ বলেছেনঃ নারীদেহ পুরুটাই সতর।

পর্যালোচনাঃ এই হল সাহাবী, তাবিয়ী' এবং মুজতাহিদ ইমামগণের মতামত এবং উনাদের ভিন্নমতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। কিন্তু যত দিন যেতে থাকে এ বিষয়ে আলিমগণ অধিক হারে কঠিন মতের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাই পরবর্তী আলিমগণের অনেকেই মুখ এবং হাত না খোলার পক্ষে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এর কারণ হিসেবে উনারা বলেছেনঃ দিনে দিনে নারী ঘটিত ফিতনাহ বেড়েই চলছে। তাই..

হানফী মাযহাবের ৩য় সারির ফাক্বীহ শামসুল আইম্মা 'সারাখসি' এ বিষয়ে লিখেন.. মুখমন্ডল ও হাতের তালুর দিকে দৃষ্টিপাতের বৈধতা কেবল তখন, যখন কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাত না হয়। পক্ষান্তরে যদি সে জানে যে, দেখলে কুধারনা সৃষ্টি হতে পারে, তবে তার জন্য নারীর কোনো অঙ্গের দিকেই দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়। (আল-মাবসূত)

আল্লামা শামী 'রুদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে লিখেন.. যদি কামভাবের আশঙ্কা অথবা সন্দেহ হয়, তবে নারীর মুখ মন্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ হবে। কেননা কামভাব না হওয়ার শর্তে দৃষ্টিপাত করা হালাল। তাই শর্তটি অনুপস্থিত হলে দৃষ্টিপাত হারাম হবে। এ বিধানটি পূর্ববর্তীদের সময়কালেও ছিল।

আল্লামাহ ইবনু নুজাইম ফতোয়া ক্বাদীখানে লিখেছেনঃ মহিলারা প্রয়োজন ছাড়া পরপুরুষের সামনে মুখ খুলবে না।

মালিকীদের মাঝে কাদ্বী ইবনু-ল-আরাবী "আহকামু-ল-কুরআন" গ্রন্থে লিখেছেনঃ নারীদেহ পুরাটাই সতর...।

শফিয়ীদের মাঝে ইমাম বাইদ্বাওয়ী তদীয় গ্রন্থে লিখেছেন.. নারীদেহ পুরাটাই সতর...

ইমাম নবওয়ী "আল-মিনহাজ" নামক কিতাবে লিখেছেনঃ নারীরা পরপুরুষের সামনে মুখ খুলবে না..।

পরিশেষে এবিষয়ে হানাফী মাযহাবের কিছু বিধান উল্লেখ করে আলোচনার ইতি টানতে চাই..

হানাফী মাযহাবের একটি প্রসিদ্ধ "মাতান" গ্রন্থ "মুখতাস্বার আল-কুদুরী" (মাযহাব বর্ণনার মূল কিতাবকে মাতান বলা হয়।) হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব "আল-হিদায়াহ" হচ্ছে মুখতাস্বার আল-কুদুরীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ। হানাফী মাযহাবের রীতিনীতি মতে মাতান গ্রন্থের গুরুত্ব ব্যাখ্যা গ্রন্থের চেয়ে বেশী আর ব্যাখ্যা গ্রন্থের গুরুত্ব ফতোয়ার কিতাবের চেয়ে বেশী। নিম্নে মুখতাস্বার আল-কুদুরী থেকে এ বিষয়ের কিছু বিধান উল্লেখ করা হল..

আইন ও বিধানঃ পুরুষের জন্য আজনবী (যাদেরকে বিয়ে করা স্থায়ী ভাবে হারাম নয়) নারীর মুখমণ্ডল ও কব্জা পর্যন্ত হাত দেখা বৈধ। তবে কামভাব এসে গেলে বিনা প্রয়োজনে মুখ দেখবে না।

- পুরুষ বিচারক কোনো নারীর বিচার করলে তার মুখমণ্ডল দেখতে পারবে যদিও কামভাব এসে যায়।
- পুরুষ সাক্ষী কোনো নারীর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলে তার মুখমণ্ডল দেখতে পারবে যদিও কামভাব এসে যায়।
- পুরুষ চিকিৎসক নারীর শরীরের রুগ্ন অংশ দেখতে (এবং স্পর্শ করতে) পারবে
- এক পুরুষ অন্য পুরুষের নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত দেখবে না, বাকি অংশ দেখতে পারবে।
- মহিলারা পুরুষের এতোটুকু দেখতে পারবে যতটুকু অন্য পুরুষ দেখতে পারে।
- এক নারী অন্য নারীর নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত দেখবে না। বাকি অঙ্গ দেখতে পারবে।
- পুরুষ তার স্ত্রীর বা দাসীর সব দেখতে পারবে, এমনকি গোপনাঙ্গও দেখতে পারবে।
- মাহরাম পুরুষ তার মাহারিম (যাদের বিয়ে করা চিরতরে হারাম) নারীর মুখমণ্ডল, মাথা, বুক (স্তনের উপরের অংশ) হাটুর নীচ ও বাহু দেখতে পারবে। তবে পিট, পেট, উরু দেখবে না।
- পুরুষের জন্য নারীর যে অঙ্গ দেখা বৈধ এটা স্পর্শ করাও বৈধ। (দেখুনঃ মুখতাস্বার আল-কুদুরী বৈধ অবৈধ অধ্যায়)
- আর মাহরাম পুরুষগণ নারীর মাথা, চুল, হাত, গলা, বুক (স্তনের উপরের অংশ) হাটু পর্যন্ত পা, ইত্যাদি দেখতে পারবে।

পর্যালোচনাঃ

- আল্লাহর কিতাবে সুস্পষ্টভাবে হিজাবের কথা বলা হয়েছে তাই হিজাব করা ফরজ। হিজাব না করলে মহাপাপ হবে এবং ওই নারী ফাসিক হয়ে যাবে আর হিজাবের বিধানকে অমান্য বা অবজ্ঞা করা কুফর। কোনো মুসলিম এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে যাবে।
- মুখ মণ্ডল এবং হাত ঢেকে রাখার কথা বা খুলে রাখার কথা কোনোটাই আল-কুরআনে স্পষ্ট করে বলা হয়নি এবং ঢেকে রাখার ব্যাপারে মুতাওয়াতির মানের কোনো হাদীছও নেই তাই এটা ফরজ হবে না এবং এজন্য কাউকে বাধ্য করা বা সাজা দেওয়া যাবে না। তবে এ ব্যাপারে অনেক হাদীছে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাই ঢেকে রাখা উত্তম হবে।
- আল-কুরআনের বিশ্লেষণে যেসব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে এসবের অনেকটিতেই মুখ মণ্ডল ও হাত খুলে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাই বিষয়টিকে মন্দকাজ হিসেবে উপস্থাপনের অবকাশ নেই।
- অধিকাংশ সাহাবী, তাবিয়ী' এবং ইমামগণের ভাষ্যমতেও মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত খুলে রাখা অনুমদিত। তাই বিষয়টি নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।
- কিন্তু পরবর্তীতে ফিতনাহ ফাসাদ বেড়ে যাবার কারণে আলীমগণ এ বিষয়ে কঠিন থেকে কঠিন হয়ে পড়েছেন এবং কঠোর মতামত দিয়েছেন। আসলে এসবই সময়ের কারণে উলামা সমাজের পরামর্শ। তাই এগুলো মেনে চলা উত্তম হবে তবে ফরজ হবে না।

৪র্থ সেমিষ্টার ১০ম দিন

মুনাফিক ও মুনাফিকী

শিরক এবং কুফর ছাড়াও ঈমান বিনষ্টাকারী আরো একটি মহাপাপ হচ্ছে নিফাক্ব বা মুনাফেকী। জাগতিক স্বার্থ, দুনিয়ার মোহ, পরিপক্ক জ্ঞানের অভাব সহ নানা কারনে মানুষ নিফাক্বে জড়িয়ে পড়ে। আর যেকনো ভাবে নিফাক্বে জড়িয়ে পড়লেই ঈমান বিনষ্ট হয়ে মানুষ মুনাফিক হয়ে যায়, তখন তার আ'মাল ইবাদাত সব নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়।

নিফাক বা মুনাফিক্বী আসলে কুফরেরই ভিন্নরূপ। একজন মুসলিম যখন নিজেকে কোনো কুফর বা শিরকের সাথে জড়িয়ে ফেলে তখনই সে মুনাফিক হয়ে যায়। সহজ ভাবে বোঝার জন্য কথাটি আমরা এভাবে বলতে পারি..

- যে মুসলিম কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়ল সে মুনাফিক,

- যে মুসলিম ঈমান বিনষ্টকারী কোনো পাপ করে ফেলল সে মুনাফিক
- যে মুসলিম জীবনের কোনো ক্ষেত্রে ইসলাম আর কোনো ক্ষেত্রে অন্যথা করল সে মুনাফিক
- যে মুসলিম ইসলামের বিপরীতে অন্যকোনো মতবাদ, আদর্শ, বিধান বা নীতিমালা মেনে নিল সে মুনাফিক
- যে মুসলিম তার বাস্তব জীবনে ইসলাম আর কুফরকে মিশিয়ে নিল সে মুনাফিক

মোটকথা আমাদের সমাজের অনেক মানুষ নানা ভাবে কুফর বা শিরকে জড়িয়ে মুনাফিক হয়ে যাচ্ছে। নিম্নে এর কিছু উদাহরণ দেয়া হল। আশাকরি এর মাধ্যমে বিষয়টি আর সহজে বোঝা যাবে, ইন শা-আল্লাহ।

উদাহরণঃ ১ = আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এমন আছেন যারা নিজেকে মুসলিম মনে করেন। নামায পড়েন, রোজা রাখেন, হজ্ব করেন, যাকাত দেন। কিন্তু ইসলামী আইন বা বিধান পছন্দ করেন না।
আসলে এমন করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যে বা যারা এমন করেন তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। তারা হয়ে যান মুনাফিক। ইরশাদ হচ্ছে..

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ(9)

কারণঃ তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান পছন্দ করে না। তাই তিনি তাদের সকল আ'মাল বরবাদ করে দেন। (৪৭ মুহাম্মাদঃ ৯)

উদাহরণঃ ২ = আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা জোরগলায় ঈমান ও ইসলামের কথা বলেন কিন্তু ইসলামী বিচার, ইসলামী শাসন, ইসলামী সংস্কৃতি, ইত্যাদি পছন্দ করেন না। আসলে ইহাও ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যে বা যারা এমন করেন তারাও মুনাফিক হয়ে যান। ইরশাদ হচ্ছে..

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47)وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48)وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49)أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50)إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51)

তারা বলে "আমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছি, আমরা তাদের অনুগত" তথাপিও কিছু মানুষ অন্যপথে ফিরে যায়। (কারণ) এরা মুঅমিন নয়। বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের (কুরআন সুন্নাহর) প্রতি আহ্বান করা হলে এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর (কুরআনের কোনো আয়াত বা হাদীছে) ব্যক্তিগত ফায়দা হলে অনুগত হয়ে ছুটে আসে। (এরা কেন এমন করছে?) তবে কি এদের অন্তরে বিমার, না এরা সন্দিহান, নাকি আল্লাহ ও রাসূল থেকে অবিচারের আশংকা করছে? আসলে এরাই অবিচারী (বিচার ও শাসন থেকে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে এরা মহা অবিচার করেছে। কারণ যার অন্তরে ঈমান আছে সে এমন করতেই পারে না। কারণ) বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের (শারীয়া'হ আইনের) প্রতি আহ্বান করা হলে মুঅমিনদের কথা হবে একটাইঃ শোনলাম আর মেনে নিলাম। যারা এমন করে (শুধু তারাই মুঅমিন এবং) তারাই সফল। (নূরঃ ৪৭-৫১)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুঅমিন হতে হলে ইসলামের যাবতীয় বিষয়ে অবিচল থাকতে হয় এবং বাস্তব জীবনে মেনে চলতে হয়। জীবনের কিছু বিষয়ে ইসলাম আর কিছু বিষয়ে অন্যতা করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আজকাল আমাদের সমাজের অনেক মানুষ ইবাদাতের বেলায় আল্লাহর বিধান মেনে নিলেও বিচার ও শাসনের বেলায় মেনে চলে অন্য বিধান। উক্ত আয়াতে এদের কথাই বলা হয়েছে। এরা আসলে মুঅমিন নয়, মুনাফিক।

অন্য আয়াতে এসেছে..

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)

না..! তোমার প্রভুর কসম! তারা মুঅমিন হতে পারবে না। যতক্ষণ না তাদের যাবতীয় বিষয় মীমাংসার জন্য তোমার কাছে আসবে, তোমার ফয়সালা বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে এবং সম্পূর্নরূপে আত্মসমর্পন করবে। (৪ নিসাঃ ৬৫)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়ঃ মুঅমিন হতে হলে
- যাবতীয় বিচার ফয়সালা আল্লাহর বিধান মত করতে হবে,
- আল্লাহর বিধান বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে হবে

আল্লাহর বিধানের কাছে সম্পূর্ন রূপে আত্মসমর্পন করতে হবে। এই তিন শর্তের কোনো একটি পূরন না করলে মুঅমিন হওয়া যাবে না।

উদাহরণঃ ৩ = আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা নিজে মুসলিম হয়েও কাফিরদের মিত্রতা করেন, বর্তমান সমাজের ভাষায় বলতে গেলে ইসলাম পন্থীদের বাদ দিয়ে অন্যদের সাথে জোট বাঁধেন।
আসলে এমন করাও মুনাফিকী তথা ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যারা এমন করবে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে। তারা হয়ে যাবে মুনাফিক তথা চিরজাহান্নামী। ইরশাদ হচ্ছে..

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28)

মুঅমিনরা যেন মুঅমিন ছাড়া কোনো কাফিরকে ওয়ালী (মিত্র, অভিভাবক) না বানায়। কেউ এমন করলে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না। তবে প্রতিরক্ষা হিসাবে তাক্বিয়্যাহ করতে পারবে। (আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পর্ককে তাক্বিয়্যাহ বলে) আল্লাহ তাঁর (আযাবের) ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছেন। আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ২৮) (ওয়ালী সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ১০৭)

ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85)

তথাপিও তোমরা পরস্পরে যুদ্ধ কর, একদল অন্যদলকে ঘর ছাড়া কর, পাপের পথে অন্যায় ভাবে পরস্পরের বিরোদ্ধে সাহায্য কর, আবার কেউ বন্দি হলে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়েও আন। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু মান আর কিছু মান না? যারা এমন করে তাদের পরিণতি দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখেরাতে কঠিন আযাব। আল্লাহ বেখবর নন তোমাদের কাজ সম্পর্কে। (২ বাক্বারাহঃ ৮৫)

জ্ঞাতব্যঃ বানী-ইসরাঈল তথা ইয়াহুদ জাতি আল্লাহর বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। জাতীয় ঐক্য ভঙ্গ করে..
- তারা দলাদলি করত, যা আল্লাহর কিতাবে সুস্পষ্ট ভাবে নিষিদ্ধ ছিল,

- তারা পরস্পরে বিবাদ করত, যা আল্লাহর কিতাবে সুস্পষ্ট ভাবে নিষিদ্ধ ছিল,
- তাদের একদল কাফিরদের এক গোত্রের সাথে এবং অন্যদল অন্য গোত্রের সাথে জোট বেঁধে লড়াই করত, ইহাও নিষিদ্ধ ছিল,
- এতে করে কখনো কখনো একদল ইয়াহুদ এই পক্ষ এবং অন্যদল ওই পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করত, ইহাও নিষিদ্ধ ছিল,
- যুদ্ধে প্রতি পক্ষের কোনো ইয়াহুদ বন্দি হয়ে এলে (আল্লাহর বিধান মানার জন্য) তারা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে দিত।
- এভাবে তারা কোনো বিষয়ে আল্লাহর বিধান মেনে চলত আর কোনো বিষয়ে জোটের বা মিত্রের বিধান।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আল্লাহর কিতাবের কিছু মানা আর কিছু না মানা কুফর। এমন করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। কোনো মুসলিম এমন করলে সে মুনাফিক হয়ে যায়। হাদীছের ভাষ্য মতেঃ ইয়াহুদ যত পথে বিভ্রান্ত হয়েছে থিক তত পথে বিভ্রান্ত হবে এই উম্মত। হাদীছের কথা আসলেই সত্য। তখন এমন করে বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহুদ। আর এখন একই পথে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ।
আমাদের যারা এমন করে তারা মুনাফিক হয়ে যায় এবং তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যায়। মুনাফিক মানুষের দৃষ্টিতে মুসলিম হলেও আসলে কাফির। মুনাফিক চির জাহান্নামী। বিচার দিনে মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। মুনাফিক মারা গেলে তার জন্য দোয়া করা এবং তার জানাযায় শরীক হওয়াও নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

উদাহরণঃ ৪ = ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন আদর্শ। প্রতিটি মানুষ এবং জিন্ন তাদের জীবনের আদর্শ হিসাবে মেনে চলতে হবে শুধুই ইসলাম। ইহাই আল্লাহর আদেশ, ইহাই মালিকের হুকুম। কিন্তু আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এমন আছেন যারা মুসলিম হয়েও বাস্তব জীবনের নানা বিষয়ে ইসলাম ছাড়া অন্য মতবাদ, অন্য আদর্শ বা অন্য নীতিমালা মেনে চলেন।
আসলে এটাও কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যে বা যারা এমন করবে সে মুনাফিক হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ(85)

যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন (আদর্শ, নীতিমালা, বিধান, মতবাদ) এর সন্ধান করল তার (সব বরবাদ হয়ে যায়) কিছুই কবুল করা হয় না। আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্থ। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৮৫)

উদাহরণঃ ৫ = ত্বাগূ'ত বর্জন না করা বা ত্বাগূ'তকে মেনে নেওয়া ঈমান বিনষ্টকারী আরো একটি মহাপাপ। আমাদের সমাজে এমন মানুষের অভাব নেই যারা নিজেকে মুসলিম বা ইসলামপন্থী পরিচয় দিয়েও নানা ভাবে নানা অযুহাতে ত্বাগূ'তকে মেনে নেন। যারা এমন করেন তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। তারা হয়ে যায় মুনাফিক। ইরশাদ হচ্ছে..

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60)

তাদের দেখনি? যারা মনে করেঃ তারা তোমার প্রতি এবং ইতিপূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছে। আর বিচার নিয়ে যেতে চায় ত্বাগূত্বের কাছে? অথচ তাদের আদেশ দেয়া হয়েছিল ত্বাগূতকে প্রত্যাখ্যান করতে। শয়তান তাদেরকে পরিপূর্নভাবে বিভ্রান্ত করে দিতে চায়। (নিসাঃ ৬০)

উদাহরণঃ ৬ = ঈমান বিনষ্টকারী আরো একটি মহাপাপ হচ্ছে ব্যক্তি বা সামাজিক জীবনে মেনে চলার জন্য ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রণে নতুন পথ তৈরি করা। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150)أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151)

যারা আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়, যারা আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে বিভাজন তৈরি করে এবং বলেঃ কিছু মানি আর কিছু মানি না। তারা ঈমান ও কুফরের মাঝে নতুন পথ বানাতে চায়।(যারা এমন করে) এরা আসল কাফির। এসব কাফিরদের তরে (জাহান্নামের) যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৪ নিসাঃ ১৫০-১৫১)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুঅমিন হতে হলে পরিপূর্ন ভাবে ইসলাম মেনে চলতে হয়। জীবনের কিছু ক্ষেত্রে ইসলাম আর কিছু ক্ষেত্রে অন্যথা করলে মুঅমিন হওয়া যায় না। ইসলামের সাথে অন্য কিছু মিশ্রিত করে নতুন পথ তৈরী করা কুফর, ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। যারা এমন করে তারা মুনাফিক হয়ে যায়। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিক জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে পতিত হবে। মুনাফিক মারা গেলে তাদের জানাজা পড়া বা তাদের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুনঃ সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪) মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না।

উদাহরণঃ ৭ = ঈমান বিনষ্টকারী আরো একটি মহাপাপ হচ্ছে মুঅমিনদের নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা। যে বা যারা এমন করবে তারা মুনাফিক হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14)

মুঅমিনদের সাক্ষাতে এরা বলে "আমরা মুঅমিন"। আর শয়তান(নেতা)দের সাথে গোপন সাক্ষাতে বলে "আমরা তোমাদের সঙ্গী" (ঈমানের কথা বলে) তাদের সাথে উপহাস করছি মাত্র। (২ বাক্বারাহঃ ১৪)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (66)

(তারা আল্লাহ, রাসূল, আল্লাহর কালাম ও মুঅমিনদের সম্পর্কে কটু কথা বলে। আর) জিজ্ঞেস করলে বলে ঠাট্টা করেছি। বলঃ তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত (কিতাব বিধান) ও রাসূল নিয়ে ঠাট্টা কর? বাহানা বানিও না। ঈমানের পর তোমরা কুফর করেছ। তোমাদের কাউকে মাফ করা হলেও অন্যদের সাজা দেয়া হবে। কারন তারা পাপিষ্ঠ।(তাওবাহঃ ৬৫-৬৬)

ঈমান ও আক্বীদাহঃ মুনাফিক্বী আসলে কুফরেরই নামান্তর। মুনাফিকরা মানুষের দৃষ্টিতে মুসলিম হলেও আল্লাহর তালিকায় কাফির। মুনাফিক চির জাহান্নামী।

উদাহরণঃ ৮ = ঈমান বিনষ্টকারী আরো একটি মহাপাপ হচ্ছে কোনো মুসলিমকে ধর্মীয় কোনো ব্যাপারে তিরস্কার করা। (যেমনঃ যারা ইসলামের জন্য সংগ্রাম রত তাদেরকে, চরমপন্থী, ধর্মান্ধ, মৌলবাদী, সন্ত্রাসী, জঙ্গি, ইত্যাদি বলা।) যারা এমন করে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। তারা হয়ে যায় মুনাফিক। ইরশাদ হচ্ছে..

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (49)

(বদরে যখন মাত্র ৩১৩ জন নিরস্ত্র প্রায় মুসলিম আল্লাহর সাহায্য এবং রাসূলের কথার আশ্বস্ত হয়ে ১০০০ সুসজ্জিত সৈন্যের বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিল) তখন মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের লোকেরা বললঃ এদের ধর্ম এদেরকে প্রতারিত করেছে (এরা ধর্মান্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেনঃ) যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে (তারা জেনে রাখুক) আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাকৌশলী। (৮ আনফালঃ ৪৯)

উদাহরণঃ ৯ = ঈমান বিনষ্টকারী আরো একটি মহাপাপ হল ইসলাম বা মুসলিমের বিজয়ে ব্যথিত হওয়া। যারা এমন করে তাদের ঈমান বিনষ্ঠে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। তারা হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (50) قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51)

তোমাদের কল্যাণে (বিজয়ে) তাদের খারাপ লাগে আর তোমাদের বিপদে (পরাজয়ে) বলেঃ আমরা আগেই (অবস্থা বুঝতে পেরে) সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলাম। (তোমাদের ক্ষয়ক্ষতির কথা শোনে) তারা খুশী হয়ে ফিরে যায়। বলে দাওঃ আমরা তাই পাব যা আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। তিনিই আমাদের মাওলা। মুঅমিনদের উচিত শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করা। (৯ তাওবাহঃ ৫০-৫১)

উদাহরণঃ ১০ = ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী প্রাধান্য দেয়া বিনষ্টকারী আরো একটি মহাপাপ। মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যে বা যারা এমন করবে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে, তারা হয়ে যাবে মুনাফিক। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (177)

যারা ঈমানের বদলে কুফরকে বেছে নেয় তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। (বরং তারা নিজেরাই মুনাফিক হয়ে যাবে) তাদের তবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৭৭)

উদাহরণঃ ১০ = ঈমান বিনষ্টকারী আরো একটি মহাপাপ হচ্ছে কুফরের দিকে ধাবমান হওয়া। আমাদের সমাজে এমন মানুষের অভাব নেই মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও যারা কুফর করে, কুফরকে সমর্থন, কুফরের দিকে ধাবমান হয়। যে বা যারা এমন করে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (176)

যারা কুফরের দিকে ধাবমান হয়ে (মুনাফিক হয়ে) যাচ্ছে এদের নিয়ে ভেব না। এরা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ চানঃ আখেরাতে এদের জন্য কিছুই না থাকুক। (তাই এদের নেক কাজের বিনিময় দুনিয়াতেই দিয়ে দেন, যেমন দেন কাফিরদের) এদের তরে কঠিন আযাব। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৭৬)

وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

ঈমান আনা সত্ত্বেও যে (বা যারা) কুফর করবে তাঁর সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যাবে, আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থ। (৫ মাইদাহঃ ৫)

সারকথাঃ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মানুষ কিভাবে কুফর, শিরক ও নিফাক্বে জড়িয়ে নিজের ঈমান ও আ'মাল বরবাদ করে চির জাহান্নামের পথে ধাবিত হয় এর সামান্য কিছু নমুনা আপনাদের সামনে পেশ করা হল। এছাড়াও আরো অনেক পথ ও পদ্ধতি আছে যে পথে বা যে পদ্ধতিতে মানুষ কুফর, শিরক ও নিফাকে জড়িয়ে পড়ে। এসবের মূল কারণ দুনিয়ার মোহ, ব্যক্তি বা গোষ্টি স্বার্থ, ঈমান আক্বীদাহ সম্পর্কে পরিপক্ক জ্ঞানের অভাব, ইত্যাদি।

কোনো মুসলিম যখন যে কোনো কারনে বা যে কোনো ভাবে কোনো কুফর অথবা কোনো প্রকার শিরক বা নিফাকে জড়িয়ে পড়লে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। তখন সে হয়ে যায় মুনাফিক। আখেরাতে তার ক্ষমার আর কোনো সম্ভাবনাই থাকে না।

মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জন্য নিম্নতম জাহান্নাম। মুনাফিক ব্যক্তি আখেরাতে তারকৃত নেক কাজের সামান্যতম ফলও ভোগ করতে পারবে না। মুনাফিককে ক্ষমা করা হবে না। মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10)

কিছু মানুষ বলেঃ আমরা আল্লাহ ও আখেরাত বিশ্বাস করি, আসলে এরা মুঅমিন নয়। (বরং মুনাফিক) এরা আল্লাহ ও মুঅমিনদের সাথে প্রতারণা করে। আসলে এরা নিজেকেই প্রতারিত করছে কিন্তু এই অনুভুতিও এদের নাই। এদের অন্তর রোগাক্রান্ত। আল্লাহ এই রোগ (মুনাফিকী) আরো বাড়িয়ে দেন। এদের তরে যন্ত্রনাদায়ক আযাব, মিথ্যার পরিণতিতে। (২ বাক্বারাহঃ ৮-১০)

আসলে মুনাফিক্বী একটি অবক্ষয় জাতীয় ব্যধি, ইহা হচ্ছে আদর্শিক বিচ্যুতি। এসব অবক্ষয় ও বিচ্যুতি থেকে বাঁচতে হলে প্রয়োজন সঠিক জ্ঞান, মজবুত অবস্থান এবং আল্লাহর সাহায্য।

হে আল্লাহ্! আমাদের সঠিক জ্ঞান দান কর, আমাদের অবস্থানকে মজবুত কর এবং দ্বীনের পথে ঈমানের উপর অবিচল থাকতে আমাদের সাহায্য কর। আমীন!

আজকাল আমরা যে সমাজে বাস করছি এর মূলভিত্তি শিরক এবং মূলস্রোত কুফরের দিকে ধাবমান। বর্তমান বিশ্বে এমন কিছু মতবাদ, আদর্শ ও নীতিমালা তৈরি হয়েছে যা ঈমানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এসব মতবাদ, আদর্শ ও নীতিমালা আমাদের সমাজ ও জীবনের সাথে একেবারে মিশেগেছে। এসব যেন আমাদের জীবনে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। এসবের প্রভাবে আমাদের জীবনটা ইসলাম ও কুফরের কানামাছি খেলায় পরিণত হয়েছে। মানুষ কুরআন হাদীছে কাছে এসে ঈমান গ্রহণ করছে আবার এসবের প্রভাবে ঈমান হারা হয়ে মুনাফিক হয়ে যাচ্ছে। আমাদের জিবীবনটা যেন আজ সেই হাদীছেরি বাস্তব রূপ, যেখানে বলা হয়েছেঃ অচিরেই এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ সকালে মুঅমিন হবে আর বিকালে কাফির, বিকালে মুঅমিন হবে আর সকালে কাফির। সবকিছু মিলিয়ে আমরা এক নাজুক সময় অতিক্রম করছি। তাই আসুন! এসব ব্যাপারে সতর্ক হই, নিজের ঈমান ও আক্বীদাহর বাঁচাতে সচেষ্ট হই, বিষয়গুলো নিয়ে একটু ভাবি, চিন্তা করি এবং এব্যাপারে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করি।

আত্মীয়তা ও আম্বাবিয়্যাহ

প্রারম্ভিক কথাঃ মানব জীবনে আত্মীয়তার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম যেহেতু মানবতার আদর্শ। তাই ইসলামী শারীয়া'হ বিষয়টিকে খুব গুরুত্ব দিয়েছে। তবে বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। কারণ এতে হেরফের হলে ফাসিক বা মুনাফিক হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন..

- আত্মীয়তা রক্ষা করা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ এবং মুঅমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট। পক্ষান্তরে আত্মীয়তা নষ্ট করা মহাপাপ, এমন পাপ করলে মানুষ ফাসিক হয়ে যায়।
- অনেক মানুষ শুধু আত্মীয়তার কারণে অন্যায় ভাবে কাউকে সমর্থন করে থাকেন বা পক্ষ নিয়ে থাকেন। ইসলামী পরিভাষায় এটাকে বলা হয় "আ'স্বাবিয়্যাহ"।
- আম্বাবিয়্যাহ একটি জঘন্যতম মহাপাপ। এমন পাপ করলে মানুষ ফাসিক্ব হয়ে যায়।
- আত্মীয়দের কেউ ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করলে তাকে ওয়ালী বানানো নিষিদ্ধ। এমন কাউলে ওয়ালী (আপন বা সামাজিক মিত্র) বানালে কুফর হয়, এতে মানুষ মুনাফিক হয়ে যায়।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন। বিষয়টি কত স্পর্শকাতর। তাই এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। আসলে আত্মীয়তা রক্ষা করা এবং বাস্তব জীবনে আত্মীয়তা রক্ষা করে চলা সহজ কাজ নয়। এ ব্যাপারে পরিপক্ক জ্ঞান না থাকলে বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তির সম্ভাবনাই বেশী থাকে। তাই তো দেখা যায়..

- কেও কেও আত্মীয়তার নামে অতি বাড়াবাড়ি করে আম্বাবিয়াহ করে থাকেন,
- কেও কেও আত্মীয়তার নামে কুফর শিরকে সমর্থন দিয়ে মুনাফিক হয়ে যান
- আর কেও কেও বিষয়টিকে অবজ্ঞা করে ফাসিক হয়ে যান।

আর এসব বিষয় থেকে নিজেকে রক্ষা করে সঠিক পথে ঠিকে থাকতে হলে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। আর আবশ্যকতার কথা বিবেচনায় রেখেই আমাদের আজকের আয়োজন আত্মীয়তা রক্ষার সীমারেখা। বিষয়টিকে আমরা ৮টি অনুচ্ছেদে বিন্যস্থ করেছি।

১ম অনুচ্ছেদঃ আত্মীয় পরিচিতি ও আত্মীয়তা রক্ষার গুরুত্ব
২য় অনুচ্ছেদঃ আত্মীয়তা ছিন্ন করার পরিণতি
৩য় অনুচ্ছেদঃ অভদ্র আত্মীয়দের সাথে করণীয়
৪র্থ অনুচ্ছেদঃ আম্বাবিয়্যাহ (অবৈধ স্বজন প্রীতি)
৫ম অনুচ্ছেদঃ যে সব আত্মীয় ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করে
৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ আত্মীয়তা রক্ষায় করণীয়
৭ম অনুচ্ছেদঃ দ্বীন ও আত্মীয়তা
৮ম অনুচ্ছেদঃ আত্মীয়তা রক্ষার নীতিমালা

এবার আসুন! প্রতিটি বিষয়ে একটু বিস্তারিত জেনে নেই।

১ম অনুচ্ছেদঃ আত্মীয় পরিচিতি ও আত্মীয়তা রক্ষার গুরুত্ব

আত্মীয় পরিচিতিঃ যেসব ব্যক্তি একই গর্ভ অথবা একই ঔরস তথা একই মা অথবা একই বাবার সাথে সম্পৃক্ত তাদেরকে যাওয়ী-ল-আরহাম বা যাওয়ী-ল-ক্বুরবা বলা হয়। বাংলাতে যাদেরকে আমরা আত্মীয় বা নিকট আত্মীয় বলে থাকি। সে মতে

- বাবা-মা হলেন আমাদের আত্মীয়তার মূল শিকড়
- ছেলে-মেয়েরা ও তাদের সন্তানরা হল আমাদের আত্মীয়তার মূল শাখা-প্রশাখা
- আপন বা সৎ ভাইবোন হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে নিকটতম আত্মীয়।
- চাচা-ফুফু আর মামা-খালারা হলেন আমাদে ২য় ধাপের নিকট আত্মীয়।
- আর যাদের সাথে গর্ভজাত বা ঔরসজাত সম্পর্ক নেই বরং অন্যভাবে সম্পর্ক রয়েছে তারা হলেন আমাদের কুটুম বা বন্ধু।

ইসলামী বিধান মতে আত্মীয়তা রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আত্মীয়তা রক্ষা করার তাগিদ দিয়ে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। নীচে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হল। যেমন..

১. আত্মীয়তা রক্ষা করা ঈমানের দাবী। বর্ণিত হচ্ছে..

حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ

- যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান রাখে সে যেন মেহমানকে সম্মান করে,
- যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান রাখে সে যেন আত্মীয়তা রক্ষা করে,
- যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান রাখে সে যেন কল্যাণকর কথা বলে নতুবা চুপ থাকে। (বুখারীঃ ৪৮৩০, মুসলিমঃ ১৯৮০, ২৫৫৪)

২. আত্মীয়তা রক্ষা করলে হায়াতে বরকত হয়, সম্পদে বরকত হয়। বর্ণিত হচ্ছে..

عن أنس أن رسول الله ﷺ قال من أحب أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه.

আনাস থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ যেব্যক্তি রিজিকে সচ্ছলতা আর হায়াতে বরকত কামনা করে সে যেন আত্মীয়তা রক্ষা করে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩. যে ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষা করে মহান আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন। বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي هريرة قال قال رسولُ اللهِ ﷺ إنَّ اللهَ تَعالى خَلَقَ الخَلْقَ حَتَّى إذا فَرَغَ مِنْهُمْ قامَتِ الرَّحِمُ فَقالَتْ هَذا مقامُ العائذِ بِكَ مِنَ القَطيعَةِ قالَ نَعَمْ أما تَرْضَيْنَ أنْ أصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قالَتْ بَلَى قال فذلِكَ لَكِ ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اقْرَؤوا إنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إنْ تَوَلَّيْتُمْ أنْ تُفْسِدُوا في الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ] محمد [23 -22:متفقٌ عَلَيه.

আবু-হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ "আল্লাহ্ই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। সব সৃষ্টি সমাপ্ত হবার পর আত্মীয়তা দাঁড়িয়ে বললঃ বিচ্ছিন্নতা (আত্মীয়তা ছিন্ন করা) থেকে আপনার নিকট সুরক্ষা কামনার এটা-ই উপযুক্ত সময় (সুতরাং ছিন্ন হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করুন।) আল্লাহ্ বললেনঃ হ্যাঁ.. (তাই করব।) যে তোমায় রক্ষা করবে আমি (আল্লাহ্) তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করব আর যে তোমায় ছিন্ন করবে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব; এতে কী তুমি সন্তুষ্ট..? আত্মীয়তা বললঃ জি..! আল্লাহ্ বললেনঃ তোমাকে তাই দেওয়া হলো"। এতোটুকু বলার পর রাসূল সা. বললেনঃ (আমার কথার প্রমাণ স্বরূপ) চাইলে পাঠ করঃ "(জিহাদ বিমুখ হয়েগেলে) তোমাদের থেকে আর কি প্রত্যাশা করা যায়? তখন ক্ষমতা পেলে তোমরা (ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখতে পারবে না, বরং তোমরা তখন) যমীনে ফাসাদ করবে, আত্মীয়তা ছিন্ন করবে। (কারণ জিহাদ বিমুখতা মানুষকে ভিতু বানায়। আর ভিতুরা সর্বদাই অবিচারী হয়ে থাকে।) যারা এমন হয়ে যায় আল্লাহ তাদের লা'নত করেন, তাদের বধীর করে দেন, তাদের দৃষ্টি অন্ধ করে দেন। (৪৭ মুহাম্মাদঃ ২২,২৩) (বুখারীঃ ৪৪৬৭, ৪৪৬৮, ৪৪৬৯ ও মুসলিম)

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله

আ'ইশাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ আত্মীয়তা আরশে ঝুলন্ত থেকে বলছেঃ যে আমাকে রক্ষা করবে আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবেন আর যে আমাকে ছিন্ন করবে আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৪. আত্মীয়তা রক্ষা করা জান্নাতে প্রবেশের পথ সুগম করে। বর্ণিত হচ্ছে..

عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول اللهﷺ يا أَيُّها النَّاسُ أفشوا السَّلامَ وأطعِموا الطَّعامَ وصِلوا الأرحامَ وصلُّوا باللَّيلِ والنَّاسُ نيامٌ تدخلوا الجنَّةَ بسَلامٍ

আব্দুল্লাহ বিন সালাম রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন হে মানুষ! তোমরা পরস্পরে..

- ✓ সালামের প্রচলন কর,
- ✓ (একে অপরকে বেশী বেশী দাওয়াত করে) খাওয়াও,
- ✓ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর,
- ✓ রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাত আদায় কর। আর (এ চারটি কাজ করে) শান্তিপূর্ণ ভাবে জান্নাতে প্রবেশ কর। (ইবন মাজাঃ শাইখ আলবানীর তাহক্বীক্ব মতেও হাদীছটি সাহীহ)

অন্য বর্ণনা মতে আবু-আইয়্যুব আল-আনস্বারী রা. বলেনঃ একদা এক ব্যক্তি বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন কাজ করলে আমি জান্নাতে যেতে পারব..? রাসূল সাঃ বললেন..

- ✓ এক আল্লাহর ইবাদাত কর,
- ✓ আল্লাহর সাথে শিরক কর না,
- ✓ সালাত কায়েম কর,
- ✓ যাকাত আদায় কর
- ✓ আর আত্মীয়তা রক্ষা কর। (বুখারী ও মুসলিম)

আত্মীয়তা রক্ষায় করণীয় পদক্ষেপ সমূহঃ আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে অতি বাড়াবাড়িয়ে করে ফাসিক বা মুনাফিক হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে হবে আবার অতি ছাড়াছাড়ি করে ফাসিক হওয়া থেকেও বিরত থাকতে হবে। আর এজন্য জানতে হবে আত্মীয়তা রক্ষায় আমাদের করণীয় পদক্ষেপগুলো কেমন হওয়া উচিত। আত্মীয়তা রক্ষায় বাস্তব সম্মত কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সম্মানিত উলামাগণ। আপনাদের সুবিধার্থে এর সামান্যকিছু নিম্নে পেশ করা হল..

تختلف الطرق التي تتحقّق بها صلة الرحم فتكون بالمال وتقديم المساعدة والنّصرة وطلاقة الوجه وإرشادهم وتقديم النصح لهم مع الحرص على الدعاء لهم بالهداية ويشمل الدعاء كلّ مَن له حقٌّ بالصلة بالإضافة إلى عيادة المريض من الرحم وإجابة الداعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الجدير بالذكر أنّ صلة الرحم تستند إلى العُرف؛ فما اعتاد عليه الناس على أنّه من صِلة الرحم فهو صِلةٌ وما اعتادوا على أنّه قطيعةٌ فهو كذلك -خالد الخراز، موسوعة الأخلاق، الكويت :مكتبة أهل الأثر، صفحة .358-359 بتصرّف.

আসলে আমাদেরকে আত্মীয়তা রক্ষার জন্য স্থান, কাল, পাত্র ভেদে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। যেমন ..

- ✓ আর্থিক সাপোর্ট
- ✓ একে অপরকে উপহার দেওয়া,
- ✓ পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা করা
- ✓ একে অপরের সাথে হাসি মুখে কথা বলা,
- ✓ পরস্পরকে সৎপথের সন্ধান দেওয়া
- ✓ একে অপরের কল্যাণ কামনা করা
- ✓ পরস্পরকে ভালো পরামর্শ ও সৎ উপদেশ দেওয়া
- ✓ আত্মীয়স্বজনের হেদায়াতের জন্য দোয়া করা
- ✓ রোগীর শুশ্রুষা করা
- ✓ (বিপদ, আপদ, মুসীবত ও খুশীর দিনে) একে অন্যের ডাকে সাড়া দেয়া
- ✓ সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করা
- ✓ সাধারণত সমাজে যেসব উত্তম কাজকে আত্মীয়তা রক্ষার মাধ্যম হিসেবে দেখা হয় এমন কাজ করা। ইত্যাদি

২য় অনুচ্ছেদঃ আত্মীয়তা ছিন্ন করার পরিণতি

ইসলামী বিধান মতে আত্মীয়তা ছিন্ন করা মহাপাপ এবং এর পরিণাম বড় ভয়াবহ। আত্মীয়তা ছিন্ন করার পরিণাম উল্লেখ করে আল-কুরআনে একাধিক আয়াত এবং বিভিন্ন কিতাবে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। নীচে এর কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা হল। যেমন..

১. যারা আত্মীয়তা ছিন্ন করে আখেরাতে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

وما يضل به إلّا الفاسقين
الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

আল্লাহ্ বিভ্রান্ত করেন শুধু ফাসিকদেরকে, যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আল্লাহ যা (সমাজ, দ্বীন, আত্মীয়তা) একিভূত করণের নির্দেশ দিয়েছেন এগুলোকে ছিন্ন করে (বলে ধর্ম আর রাষ্ট্র আলাদা।) আর যমীনে ফাসাদ (পাপকাজ) করে। (যারা এমন করে) এরাই ক্ষতিগ্রস্থ। (২ বাক্বারাহঃ ২৭)

২. যারা আত্মীয়তা ছিন্ন করে স্বয়ং আল্লাহ তাদের উপর লা'নত করেন। ইরশাদ হচ্ছে..

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ (23)

(জিহাদ বিমুখ হলে) তোমাদের থেকে আর কি প্রত্যাশা করা যায়? তখন ক্ষমতা পেলে তোমরা (ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখতে পারবে না বরং) যমীনে ফাসাদ করবে এবং আত্মীয়তা ছিন্ন করবে। (কারণ জিহাদ বিমুখতা মানুষকে ভিতু বানায় আর ভিতুরা অবিচারী হয়) যারা এমন হয়ে যায় আল্লাহ তাদের লা'নত করেন, তাদের বধীর করে দেন, তাদের দৃষ্টি অন্ধ করে দেন। (৪৭ মুহাম্মাদঃ ২২,২৩)

৩. আত্মীয়তা ছিন্নকারীর ইবাদাত কবুল হয় না। বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم **قال إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم** (أحمد 484/2 , حسنه الألباني في صحيح الترغيب 2538)

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার (দিবাগত) জুমার রাতে মানব জাতির আ'মাল (সাপ্তাহিক কর্ম বিবরণী বা কাজের রিপোর্ট মঞ্জুরির জন্য) পেশ করা হয়। তখন আত্মীয়তা ছিন্নকারীর আ'মাল কবুল করা হয় না। (আহমদঃ ২/৪৮৪, সাহীহ' আত-তারগীব লি-আলবানীঃ ২৫৩৮। শাইখ আলবানীর তাহ'ক্বীক মতে হাদীছটি হাসান।)

৪. আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্নাতে যেতে পারবে না। বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي محمد جبير بن مطعم أن رسول الله ﷺ قال **لا يدخل الجنة قاطع** . قال سفيان يعني قاطع رحم . متفق عليه

জুবাইর বিন মুত্বই'ম রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্নাতে যেতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিমঃ ২৫৫৬)

৫. আত্মীয়তা ছিন্ন করলে দুনিয়াতেও সাজা হয়, আখেরাতেও সাজা হয়। বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي بكر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم.

আবু-বাকর রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ যে সব পাপের কারণে দুনিয়াতে সাজা তড়ান্বিত হয় এবং আখেরাতেও সাজা দেওয়া হয় এর অন্যতম হচ্ছে (ইসলামী সরকারের সাথে) বিদ্রোহ করা এবং আত্মীয়তা ছিন্ন করা।

(সূত্রঃ আবু-দাউদ, তিরমিযী, ইবন মাজা। হাদীছটি সাহীহ। শাইখ আল-বানীও হাদীছটিকে সাহীহ বলেছেন এবং সাহীহ আল-তারগীবে স্থান দিয়েছেন। ইমাম বুখারী ও তদীয় কিতাব "আদাবু-ল-মুফরাদ" এ হাদীছটিকে স্থান দিয়েছেন।)

৩য় অনুচ্ছেদঃ আদর্শহীন আত্মীয়দের সাথে করণীয়

প্রারম্ভিক কথাঃ আমাদের আত্মীয় স্বজনের কেউ যদি নীতিহীন ও আদর্শহীন হয়ে মন্দ পথে চলে যায়, যদি তারা দ্বীনের পথ ছেড়ে পাপের পথে পা বাড়ায়? তবে তাদের সাথে আমাদের আচরণ কেমন হবে? এটা এক বিরাট সমস্যা। চলুন! খুঁজে দেখি; এ সমস্যার সমাধানে ইসলাম কি বলে? আদর্শহীন আত্মীয়দের সাথে আমাদের করণীয় কেমন হওয়া উচিত এ ব্যাপারটিকে কয়েকটি বিধান আপনাদের সামনে পেশ করছি। যথা..

বিধানঃ ১. আমাদের কারো বাবা-মা, ভাইবোন বা অন্যান্য আত্মীয়স্বজন যদি খারাপ হয়ে যায়, তারা যদি মন্দ পথে চলে তবে শারীয়া'হ বহির্ভুত কোনো ব্যাপারে তাদের কথা মানা যাবে না /মেনে নেওয়া যাবে না। কিন্তু এতদ সত্ত্বেও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (15)

আমরা (মানে আল্লাহ নিজে। আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী অধিক সম্মান বুঝাতে বহুবচনে "আমরা" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে) মানুষকে তার বাবা-মার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছি; (হে মানুষ!) আমার শোকর আদায় কর এবং তোমার বাবা-মারও (শোকর আদায় কর। আল্লাহর নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে তাঁর আনুগত্য করার নাম শোকর আদায় করা। মানুষ যেন ভুলে না যায়) তার মা অনেক কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে, দুই বছর দুধ পান করিয়েছে। (শুনো!) আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তবে তোমাদের বাবা-মা যদি কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে যায় এবং শিরক (পাপ) করার জন্য তোমাদেরকে চাপ দেও তখন তাদের কথা মেনে নিও না। তবে দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে মা'রুফ (রীতি ও বিধান মত) সহাবস্থান করবে। (আদর্শগত ভাবে) শুধু তার পথই গ্রহণ কর যে আমার দিকে ধাবিত হয়। (মনে রেখো!) তোমরা সবাই আমার কাছে ফিরে আসবে আর আমি বদলা দেব তোমাদের সকল কাজের। (৩১ লুক্বমানঃ ১৪-১৫)

বিধানঃ ২. আমাদের মাঝে কারো নিজের স্ত্রী, সন্তান বা পরিবারের অন্য সদস্য খারাপ হয়ে গেলে তাদের সাথে আদর্শিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, তাদের থেকে সাবধান থাকতে হবে; যেন তারা আপনাকে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিতে না পারে। তবে দুনিয়াবী ব্যাপারে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (14)

মুঅমিনগণ! তোমাদের কোনো কোনো স্ত্রী ও সন্তান তোমাদের শত্রু, (যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ, হিজরত, দ্বীনি কাজ ও দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখে) তাই তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকবে। তাদের উপেক্ষা করবে, ক্ষমা করবে, মার্জনা করবে (এটা-ই তোমাদের জন্য উত্তম। আর মনে রাখবে) নিশ্চয় আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল ও দয়াময়। (৬৪ তাগা'বুনঃ ১৪)

বিধানঃ ৩. নীতিহীন, আদর্শহীন, অভদ্র আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করা এবং সর্বক্ষেত্রে নিজের ব্যবহারকে উত্তম রাখাই আমাদের জন্য কল্যাণকর। বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله فقال له يا رسولَ اللهِ إنَّ لي قرابةً أَصِلُهم ويقطَعوني وأُحسِنُ إليهم ويُسيئون إليَّ وأَحلمُ عنهم ويجهلون عليَّ فقال لئن كنتَ كما قلتَ فكأنما تُسِفُّهمُ المَلَّ ولا يزال معك من اللهِ ظهيرٌ عليهم ما دمتَ على ذلك . رواه مسلم ، في صحيح مسلم

আবু-হুরাইরাহ রাঃ বলেনঃ একদা এক ব্যক্তি এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কিছু আত্মীয় আছে..

- আমি তাদের সাথে আত্মীয়তা রক্ষা করে চলি কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে
- আমি তাদের সাথে উত্তম আচরণ করি কিন্তু তারা আমার সাথে অশোভ আচরণ করে,
- আমি তাদের ব্যাপারে সহনশীল আচরণ করি কিন্তু তারা আমার সাথে কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ করে। (এখন আমি কি করব...?)

রাসূল সাঃ বললেনঃ তুমি যা বলছ তাই যদি হয় (তবে তোমার কাজ চালিয়ে যাও। কারণ তোমার আচরণে তাদের গাত্রদাহ এমন বেড়ে যাবে) যেন তুমি তাদের উপর গরম বালু নিক্ষেপ করছ। তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য তোমার সঙ্গী হবে যতদিন তুমি এমন থাকবে। (মুসলিম)

৪র্থ অনুচ্ছেদঃ আস্বাবিয়্যাহ (অবৈধ স্বজন প্রীতি বা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ)

প্রারম্ভিক কথাঃ ইতিমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি; আত্মীয়তা রক্ষা করা আল্লাহর আদেশ এবং আত্মীয়তা ছিন্ন করা মহাপাপ। তবে আমাদের সমাজে অনেক মানুষ এমন আছেন যারা আত্মীয়তা রক্ষার নামে অবৈধ স্বজনপ্রীতি করেন, ইসলামী পরিভাষায় যাকে বলা হয় "আস্বাবিয়্যাহ"।

আ'স্বাবিয়্যাহ একটি মারাত্মক ব্যাধি। মানুষকে পাপের পথে ঠেলে দিতে আ'স্বাবিয়্যাহ শয়তানের এক কার্যকরী পন্থা। আ'স্বাবিয়্যাহ একটি হারাম কাজ। তবে এ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাবে আমাদের অনেকেই এমন হারামের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। তাই আসুন! আ'স্বাবিয়্যাহ সম্পর্কে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জেনে নেই।

আ'স্বাবিয়্যাহ পরিচিতিঃ শুধুমাত্র নিজের পরিবার, আত্মীয়, সম্প্রদায়, জাতি বা বন্ধু হওয়ার কারণে অন্যায় ভাবে কাউকে নৈতিক ও আদর্শিক সমর্থন করার নাম আ'স্বাবিয়্যাহ। বর্ণিত হচ্ছে..

عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله ما العصبية ؟ قال أن تعين قومك على الظلم

ওয়াছিলাহ বিন আসক্বা রাঃ বলেন, একদা আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আ'স্বাবিয়্যাহ কি? তিনি বললেনঃ তোমার ক্বাওম (পরিবার, সম্প্রদায়, জাতি)কে অন্যায় ভাবে সমর্থন করা। (সূত্রঃ আবু-দাউদ, ইবনু মাজা। শাইখ আলবাণীর তাহ'ক্বীক মত হাদীছটি দ্বাইফ।)

উল্লেখ্যঃ দ্বাইফ হাদীছ আক্বীদাহ বা বিধানের ক্ষত্রে দলীল হয় না। আমরাও এখানে আক্বীদাহ বা বিধান প্রমাণের জন্য হাদীছটি ব্যবহার করিনি। আমরা হাদীছটি ব্যবহার করেছি শুধুমাত্র সংজ্ঞা বুঝাতে, যার জন্য কোনো হাদীছের প্রয়োজন ছিল না, শুধুমাত্র উলামাদের মতামতই যথেষ্ট ছিল।

আ'স্বাবিয়্যাহর পরিণতিঃ ইসলামী সমাজের মূল বিষয়সমূহের মাঝে অন্যতম হচ্ছে ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ। আর আ'স্বাবিয়্যাহ ন্যায় সাম্য ও ইনসাফকে ধ্বংস করে দেয়। আ'স্বাবিয়্যাহ আল্লাহ্ ও রাসূলের নীতি বিরোধী অবৈধ কাজ। তাই এর পরিণতি বড় ভয়াবহ। আস্বাবিয়্যাহর পরিণতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীছে অনেক কথাই বর্ণিত হয়েছে। নীচে এসবের কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা হল।

পরিনতিঃ ১. যে ব্যক্তি আ'স্বাবিয়্যাহর সাথে জড়িয়ে পড়ে রাসূল সাঃ ও মুঅমিনদের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। বর্ণিত হচ্ছে..

رواه أبو داود (5121) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : **لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ** . وهو حديث ضعيف كما قال الألباني في ضعيف أبي داود

জুবাইর বিন মুতই'ম রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেন..

- যে ব্যক্তি আ'স্বাবিয়্যাহর প্রতি আহ্বান করল সে আমাদের কেউ নয়,
- যে ব্যক্তি আ'স্বাবিয়্যাহ রক্ষার্থে যুদ্ধ করল সে আমাদের কেউ নয়,
- যে ব্যক্তি আ'স্বাবিয়্যাহর উপর মারা গেল সে আমাদের কেউ নয়।

সূত্রঃ আবু-দাউদঃ ৫১২১। শাইল আলবাণীর তাহ'ক্বীক মত হাদীছটি দ্বাইফ। তবে মুসলিমঃ ১৮৫০, বুখারীঃ ৪৯০৫, মুসলিমঃ ২৫৮৪ শব্দগত পরিবর্তন সহ প্রায় অনুরূপ অর্থ বর্ণিত হয়েছে। তাই আবু-দাউদের হাদীছটি দ্বাইফ হলেও হাদীছের মর্ম বাণী সঠিক। এই হাদীছটি তথ্য বহুল এবং সাজানো গোছানো তাই এখানে উল্লেখ করা হল।

পরিনতিঃ ২. যে ব্যক্তি আ'স্বাবিয়্যাহর জন্য নিহত হল সে জাহিলিয়্যাতের (কুফুরের) উপর মারা গেল। বর্ণিত হচ্ছে..

وقد روى مسلم (1850) عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ

জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আ'স্বাবিয়্যাহর (অবৈধ স্বজন প্রীতির বা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের) অন্ধ পতাকার (ভ্রান্ত নীতির) সমর্থক বা সাহায্যকারী হিসেবে নিহত হল সে জাহিলিয়্যাতের (কুফরের) পথে নিহত হল। (মুসলিমঃ ১৮৫০)

পরিনতিঃ ৩. আ'স্বাবিয়্যাহর প্রতি আহ্বান করা জাহিলিয়্যাতের প্রতি আহ্বানের শামিল। বর্ণিত হচ্ছে..

وروى مسلم (2584) **عَنْ جَابِرٍ قَالَ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ غُلَامٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلَامٌ مِنْ الْأَنْصَارِ؛ فَنَادَى الْمُهَاجِرُ أَوْ الْمُهَاجِرُونَ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ! وَنَادَى الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارِ! فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا ؟! دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ ! قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ اقْتَتَلَا فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. قَالَ فَلَا بَأْسَ؛ وَلْيَنْصُرْ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا؛ إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ. وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ**

জাবির রাঃ বলেনঃ একদা দুই বালক ঝগড়া বাঁধাল। একজন মুহাজির আর একজন আনসার (এক পর্যায়ে এটা গোত্রীয় রূপ ধারণ করল।) মুহাজির (তার পক্ষ নেওয়ার জন্য) মুহাজিরদের প্রতি আহ্বান করল এবং আনসার (তার পক্ষ নেওয়ার জন্য) আনসারদের প্রতি আহ্বান করল। (শোরগোল শুনে) রাসূল সাঃ বেরিয়ে এসে বললেনঃ এসব কি.? (আমার উম্মতের মাঝে) জাহিলিয়্যাতের আহ্বান.?! লোকজন (বুঝে ফেলল এমন

আহ্বানে রাসূল সাঃ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই বিষয়টি সামাল দিতে) বললঃ তেমন কিছু না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুই বালক ঝগড়া বাধিয়েছে। একজন অন্যজনকে আঘাত করেছে। রাসূল সাঃ বললেনঃ এটা তেমন কিছু নয়। মানুষ যেন তার ভাইকে সাহায্য করে; সে জালিম হলেও, মজলুম হলেও। জালিমকে জুলম থেকে বিরত রাখবে, এটা-ই তাকে সাহায্য করা হবে। আর মজলুমকে (যথাসাধ্য) সাহায্য করবে।

(মুসলিমঃ ২৫৮৪)

পর্যালোচনাঃ আসলে আত্মীয়তার বন্ধন আল্লাহ প্রদত্ব। আমাদের বাবা-মা, ভাইবোন, ছেলেমেয়ে, ভাতিজা ভাতিজী, ভাগনা ভাগনী, চাচাচাচী, মামামামী, এরা সবাই আমাদের আত্মীয়স্বজন। আত্মীয়স্বজন আল্লাহর দান। দুনিয়ার জীবনে আমাদের সার্বিক সুবিধা ও মানবিক সমর্থনের জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক এক বিশেষ নিয়ামত। এমন সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা আমাদের মানবিক দায়িত্ব। এটাই আল্লাহর বিধান। এটাই আমাদের মালিকের আদেশ।

আমরা নিজ থেকে কখনো আত্মীয়তা ছিন্ন করব না। কারণ এটা আমাদের মালিকের নিষেধ। তবে বিষয়টি যেহেতু খুবই স্পর্শকাতর, তাই এ ব্যাপারে আমাদের সাবধান থাকতে হবে; যেন আমরা আত্মীয়তা ছিন্ন না করি, আবার আত্মীয়তা রক্ষার নামে আ'স্বাবিয়্যাতে জড়িয়ে না পড়ি !!

৫ম অনুচ্ছেদঃ যে সব আত্মীয় কুফরকে পছন্দ করে তাদের ব্যাপারে করণীয়

প্রারম্ভিক কথাঃ আমাদের কোনো আত্মীয় যদি কাফির, মুশরিক, নাস্তিক, মুরতাদ বা মুনাফিক হয়ে যায়, তারা যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করে; তবে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হবে এবং করণীয় কি হবে? আমরা তাদের সাথে কি ধরণের আচরণ করব এবং কোন ধরণের সম্পর্ক রাখবো? এমন প্রশ্ন প্রায়ই আমাদের মাঝে ঘোরপাক খায়। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে এমন প্রশ্নের উত্তরও সুস্পষ্টভাবে দেওয়া আছে। তাই আসুন! এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিধান জেনে নেই।

বিধানঃ ১. আত্মীয়রা শুধুই আত্মীয়। দ্বীনী ব্যাপার আর আত্মীয়তা এক নয় বরং আলাদা দুটি পথ। তাই এ দুটি বিষয়কে আলাদা-ই রাখতে হবে। বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ - الشعراء 214: دعا رسول الله ﷺ قريشاً فاجتمعوا فعمّ وخصّ وقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئًا غير أن لكم رحمًا سأبُلُّها ببِلالها

رواه مسلم :كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى :وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ] الشعراء[214 :(1/ 192)، برقم ..(204)

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, যখন নাযিল হলো "তোমার নিকট আত্মীয়দেরকে (আখেরাতের ব্যাপারে) সাবধান করে দাও"। তখন নবী সাঃ কুরাইশদের জমা করলেন। তিনি সম্মিলিত এবং ব্যাক্তিগত ভাবে সম্বোধন করে বললেনঃ

হে কায়া'ব বিন লুওয়াই পরিবার! নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও!
হে মুররাহ বিন কায়া'ব পরিবার! নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও!
হে আব্দু শামছ পরিবার! নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও!
হে আব্দু মানাফ পরিবার! নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও!
হে হাশিম পরিবার! নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও!
হে আব্দুল মুত্তালিব পরিবার! নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও!
হে মুহাম্মাদের মেয়ে ফাত্বিমাহ! নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও!

আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারব না। তবে তোমাদের সাথে আমার আত্মীয়তা রয়েছে। তাই তোমাদের ব্যাথায় আমিও ব্যথিত হই। (মুসলিম)

বিধানঃ ২. যে সব আত্মীয় ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করে তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলেও আদর্শিক মিত্রতা করা যাবে না এবং তাদের কেওকে আদর্শিক মিত্র বা অভিভাবক হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে না। আমাদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। এ ব্যাপারে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে নাযিল হয়েছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23)

ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!) তোমাদের বাবা-মা ও ভাইবোন যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসে তবে তাদেরকে ওয়ালী (মিত্র/অভিভাবক) বানিও না /ওয়ালী হিসেবে মেনে নিও না। তোমাদের যে ব্যক্তি তাদেরকে ওয়ালী বানাবে /ওয়ালী হিসেবে মেনে নেবে সে অপরাধী হয়ে যাবে। (৯ তাওবাহঃ ২৩)

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24)

(হে নবী!) বলে দাওঃ তোমাদের বাবা-মা, ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, স্ত্রীগণ, আত্মীয়স্বজন, নিজ হাতে অর্জিত সম্পদ, নিজের ব্যবসা; যার লোকসানে তোমরা শঙ্কিত থাক, তোমাদের পছন্দের ঘরবাড়ী, (এসব) যদি আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল অথবা আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে বেশী প্রিয় হয়ে যায় তবে অপেক্ষা কর; আল্লাহ তার আযাব পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আর (জেনে রাখো!) আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না (যদি তারা নিজ থেকে ফিরে না আসে।) (তাওবাহঃ ২৪)

৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ আত্মীয়তা রক্ষায় করণীয়

এখন প্রশ্ন হলঃ আত্মীয়তা রক্ষায় আমাদের করণীয় কী? আমি/আপনি কখন আত্মীয়তা রক্ষাকারী হতে পারব? আত্মীয়তা রক্ষা করতে হলে আমাদেরকে কি করতে হবে, কোন ধরণের পদক্ষেপ নিতে হবে.? কি করলে আমরা আল্লাহর কাছে আত্মীয়তা রক্ষাকারী হিসেবে গণ্য হতে পারব..?

ইসলাম যেহেতু সর্বকালীন, সার্বজনীন। জীবনের সব সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামী বিধানে। তাই অবশ্যই আমাদের উল্লেখিত প্রশ্নসমূহের সমাধানও ইসলামে থাকার কথা এবং আছেও। এ সকল প্রশ্নের সমাধান আছে রাসূল সাঃর কিছু হাদীছে। যেমন...

১. ইসলামী বিধান মতে আত্মীয়তা রক্ষাকারীর পরিচিতি তুলে ধরে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى اله عليه وسلم ليسَ الواصِلُ بالمُكافِئِ ولَكِنِ الواصِلُ الذي إذا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وصَلَها

رواه البخاري في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو، الصفحة أو الرقم5991 :، صحيح.

আব্দুল্লাহ বিন আ'মর রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি (অন্য আত্মীয়ের মন্দ আচরণে অতিষ্ট হয়ে তার সাথে) অনুরূপ (মন্দ) আচরণ করল সে আসলে আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়। প্রকৃত অর্থে আত্মীয়তা রক্ষাকারী ওই ব্যক্তি; যে ছিন্নকারীর সাথেও আত্মীয়তা রক্ষা করে চলে। (বুখারী)

২. সম্পদ ব্যয় বা সাহায্যের ব্যাপারে প্রথমে নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে প্রাধান্য দিতে হবে। তারপর আত্মীয় স্বজন। বর্ণিত হচ্ছে..

عن جابر رضي الله عنهعن النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذى قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا . مسلم.

জাবির রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী সাঃ বলেছেনঃ প্রথমে তোমার থেকে শুরু করবে। প্রথমে তোমার নিজের জন্য ব্যয় করবে। তোমার প্রয়োজন মিটিয়ে যা বাকি থাকবে এটা পরিবারের জন্য ব্যয় করবে। পরিবারকে দেওয়ার পর যদি বাকি থাকে তবে আত্মীয়দের দেবে। আর আত্মীয়দের দেওয়ার পর যদি বাকি থাকে তবে.. (অন্যদের দেবে। তোমার রোজী) এভাবেই ব্যয় করবে। (মুসলিম)

৭ম অনুচ্ছেদঃ দ্বীন ও আত্মীয়তা

রাসূল সাঃর আত্মীয়স্বজনঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ মাক্কাহ নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। মক্কাহ-ই ছিল তাঁর পিতৃভূমি। তাঁর পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের আবাস ছিল মাক্কাতেই। নবী সা.র আত্মীয় স্বজনের হাতেই ছিল মাক্কাহর ক্ষমতা। তাঁর চাচাগণ ছিলেন মাক্কাহর প্রভাবশালী নেতা।

আত্মীদের বিরোধিতাঃ রাসূল সা.র আত্মীয়দের অনেকেই ছিল ইসলাম বিরোধী। ইসলামকে চিরতরে স্তব্দ করে দিতে এবং মুসলিমদের সমূলে ধ্বংস করে দিতে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদ সা.র উত্থান এবং ইসলামের জাগরণ ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে রাসূল সা.কে হত্যার পরিকল্পনা করেছে এবং এ কাজে একদল হত্যাকারী নিয়োগ দিয়েছে। যারা রাতের আঁধারে রাসূল সা.র ঘর অবরোধ করে বাইরে অপেক্ষা করছিল যেন বের হলেই তাকে হত্যা করা যায়।

রাসূল সাঃর পদক্ষেপঃ রাসূল সা. তখন আল্লাহর হুকুমে মাক্কাহ থেকে হিজরত করে মাদীনাহ চলে যান এবং মাদীনার ক্ষমতা হাতে নিয়ে গড়ে তুলেন মাদীনাহ কেন্দ্রিক ইসলামী সরকার ও সমাজ। কারণ মদীনাহর লোকেরা আগ থেকেই মুসলিম হয়ে গিয়েছিল এবং রাসূল সা.র হাতে (সামাজিক ও রাজনৈতিক) বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করেছিল। যার অর্থ ছিল..

- রাসূল মাদীনায় গেলে তারা তাকে আশ্রয় দেবে।
- রাসূল মাদীনায় গেলে তার হাতে মাদীনাহর ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হবে। মাদীনাহবাসী তাদের একক নেতা হিসেবে তাকে মেনে নেবে এবং তার আনুগত্য করবে।
- তিনি যে ভাবে চালাবেন তারা সে ভাবেই চলবে। ইত্যাদি।

মাক্কাহবাসীর সীমালঙ্ঘনঃ কিন্তু মাক্কাহর নেতারা এটা মেনে নিতে পারল না। তারা নবগঠিত ইসলামী সমাজ ও সরকারকে উৎখাত করে মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর অনুসারীদের হত্যা করতে উদ্যত হল।

হাতে অস্ত্র তুলে নিলেন রাসূল সাঃ মক্কাবাসীর এমন আচরণে ক্ষেপে উঠল ইসলাম প্রিয় মুসলিম জনতা। তারা যুদ্ধের প্রস্তাব করল। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেও যুদ্ধের অনুমোদন ও বিধান দিয়ে আয়াত নাযিল হল। ইসলামী সরকারের প্রধান নির্বাহী হিসেবে যুদ্ধের হুকুম জারি করলেন রাসূল সা.। তিনি নিজের হাতে অস্ত্র তুলে নিলেন। সাহাবাদেরও আদেশ দিলেন অস্ত্র তুলে নিতে। শুরু হল যুদ্ধ, ধারাবাহিক যুদ্ধ, একের পর এক যুদ্ধ। ১০বছরের মাদানী জীবনে প্রায় ৮৭-৯০টি যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন রাসূল সাঃ, যেসব যুদ্ধের অধিকাংশই ছিল রাসূলের আত্মীয়স্বজন তথা মক্কার কুরাইশ গোত্রের বিরুদ্ধে।

রাসূল সা.র বদ-দোয়াঃ রাসূল সা. শুধু যুদ্ধ করেই কান্ত হননি। বরং মক্কাবাসীর আচরণে অতিষ্ট হয়ে তিনি তাদের বিরুদ্ধে বদ-দোয়া করেছেন। বলেছেনঃ হে আল্লাহ! তাদের উপর দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দাও। বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, (ফজর সালাতের) শেষ রাকায়াতে (রুকু থেকে) মাথা তোলার পর রাসূল সাঃ বলতেনঃ

- হে আল্লাহ! আ'ইয়্যাশ বিন আবু-রাবীয়া'হকে মুক্ত কর।
- হে আল্লাহ! সালামাহ বিন হিশামকে মুক্ত কর।
- হে আল্লাহ! ওয়ালীদ বিন ওয়ালীদকে মুক্ত কর। (উনারা তখন কাফিরদের হাতে বন্দী ছিলেন)
- হে আল্লাহ! (কাফিরদের কব্জা থেকে) অসহায় মুঅমিনদের মুক্ত কর।
- হে আল্লাহ! মুদ্বার (গোত্র)র উপর তোমার আযাবকে অবধারিত করে নাও।
- হে আল্লাহ! কয়েকটি বছরের জন্য তাদের উপর এমন দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দাও যেমন দিয়েছিলে ইউসুফের সময়ে (মিশর বাসীর উপর।)
- নবী সা. আরো বলেছেনঃ গি'ফার (গোত্র)কে মাফ করে দাও, আসলাম (গোত্র)কে শান্তি দাও। (হাদীছের একজন রাবী) ইবনু আবু-যিনাদ বলেছেনঃ এসব দোয়া হয়েছে সকালের সালাতে। (বুখারীঃ ৯৫২ বাংলা ইফাবা। কোনো কিতাবে এর ক্রমিক হয়েছে ৯৬১, আর কোনো কিতাবে ৯৭৫)

বানিজ্যিক অবরোধঃ রাসূল সা. শুধু যুদ্ধ আর বদ-দোয়া করেই কান্ত হননি। কার্যকরি পদক্ষেপ হিসেবে তিনি নিজের আত্মীয়স্বজন তথা মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে বানিজ্যিক অবরোধ আরোপ করেছিলেন এবং আশপাশের গোত্রগুলোকে সাবধান করে দিয়ে ছিলেন; কেউ যেন মাক্কাহ শহরে খাদ্য সরবরাহ না করে। সাথে সবাইকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেনঃ যে বা যারা মাক্কাহবাসীকে খাদ্য সহায়তা করবে মুসলিমরা তাদেরকে শত্রু হিসেবে বিবেচনা করবে।

আরবে তখন ইসলাম একটি উদিয়মান শক্তি। মাদীনাহ তখন সামরিক শক্তিতে আঞ্চলিক পরাশক্তি। তাই রাসূলের হুশিয়ারিকে সবাই আমলে নিল এবং মাক্কায় খাদ্য সরবরাহ থেকে বিরত থাকল। ফলে মাক্কাহ শহরে খাদ্য সংকট দেখা দিল। শুরু হল দুর্ভিক্ষ। খাদ্যের অভাবে মক্কার লোকজন তখন মৃত জানোয়ার, কুকুরের মাংস, হাড় ফুটানো পানি, ইত্যাদি খেয়েছে। (দেখুনঃ সূরাহ মুঅমিনঃ ৭৭ তম আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে)

কুরাইশ নেতাদের পদক্ষেপঃ জাতির এমন দুর্দিনে মাক্কাহর নেতা আবু-সুফিয়ান নিরুপায় হয়ে মাদীনাহ সফরে এলো এবং রাসূল সা.র সাথে সাক্ষাৎ করে বললঃ মুহাম্মাদ! (উল্লেখ্য আবু-সুফিয়ান মুহাম্মাদ সাঃর শশুড় ছিল) তুমি বলছঃ তুমি বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ? তবে কেন তোমার আত্মীয় বৃদ্ধদেরকে তরবারির আঘাতে আর বাচ্চাদেরকে খাদ্যাভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছ? বর্ণিত হচ্ছে..

عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم

(প্রসিদ্ধ তাবিয়ী) মাসরুক্ব বলেনঃ একদা আমরা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেনঃ রাসূল সা. যখন দেখলেন (মাক্কাহর) মানুষের (ইসলাম ও মুসলিম) বিরোধিতা (সীমা ছাড়িয়ে গেছে) তখন তিনি (বদ-দোয়া করে) বললেনঃ হে আল্লাহ! (তাদের উপর এমন) সাতটি (বছর অবধারিত করে দাও) যেমন ইউসুফের সময়ের সাত (বছর দুর্ভিক্ষ দিয়েছিলে। রাসূল সাঃর বদ-দোয়ার) ফলে তাদের উপর (দুর্ভিক্ষের) বছর নেমে এলো যা তাদের সবকিছু ধ্বংস করে দিলো। (দুর্ভিক্ষের তাড়নায়) মানুষ (শুকনো) চামড়া, মৃত পশু, গলিত মরদেহ খেয়েছে। ক্ষুধায় তাদের অবস্থা এমন হয়েছিল যে আকাশের দিকে তাকালে ধোয়াচ্ছন্ন মনে হত। তখন আবু-সুফিয়ান এসে বললঃ মুহাম্মাদ! তুমি আল্লাহর আনুগত্যের কথা বলছো, আত্মীয়তা রক্ষার কথা বলছো। আর তোমার জাতি (খাদ্যাভাবে) ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে? তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর। (বুখারীঃ ৯৫৩ বাংলা ইফাবা। কোনো কিতাবে এর ক্রমিক হয়েছে ৯৬২, আর কোনো কিতাবে ৯৭৬।)

পর্যালোচনাঃ আসলে আত্মীয়স্বজন মানুষের উপকারী বন্ধু। জীবনের নানা ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনের প্রয়োজন হয়। আত্মীয়তার বন্ধন খুব দৃঢ় বন্ধন। যে বন্ধনের টানে অনেক ভালো মানুষও লাইনচ্যুত হয়ে যায়। আবার অনেক মন্দলোকও বাধ্য হয়ে সৎপথে চলে।
ইসলামে আত্মীয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। আত্মীয়তা রক্ষা করা ফরজ। আত্মীয়তা ছিন্ন করা মহাপাপ। তথাপিও অনেক ক্ষেত্রে নবী রাসূলগণ পর্যন্ত নিজের আত্মীয়স্বজন ও জাতি থেকে আলাদা হয়ে গেছেন। তাদের পাপাচারে অতিষ্ট হয়ে বদ-দোয়া করেছেন, আযাবের আহ্বান জানিয়েছেন। ফলে আল্লাহর আযাব তাদের উপর অবধারিত হয়েছে, আযাবে ধ্বংস হয়েছে গোটা জাতি।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সা.কেও নিজের আত্মীয়স্বজন ও গোত্রের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। তিনিও তাদের জন্য বদ-দোয়া করেছেন, তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। আপন চাচা আব্বাস, চাচাত ভাই আক্বীলসহ অনেক আত্মীয়কে বন্দি করেছেন, তাদের থেকে মুক্তিপণ আদায় করেছেন। নবীজির প্রিয় সাহাবীগণকেও নিজের বাবার বিরুদ্ধে, ছেলের বিরুদ্ধে, ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হয়েছে। কারণ আত্মীয়তার চেয়ে দ্বীন বড়। তাই তো ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে দেখা যায়..

- শুধু বিধর্মী হবার কারণে ছেলে বাবার সম্পদে অংশ পায় না, বাবা সন্তানের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।
- মুসলিম হয়েও দারু-ল-হারবে (চুক্তিবিহীন কুফর দেশে) বসবাসের কারণে একে অপরের মিরাছ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

আসল ব্যাপারঃ আসল ব্যাপার হল আত্মীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রেও রয়েছে নির্ধারিত নীতিমালা ও নির্ধারিত সীমারেখা। আল্লাহর নির্ধারিত নীতিমালা মেনে এবং এ সীমারেখার ভিতরে থেকেই আমাদেরকে আত্মীয়তা রক্ষা করে চলতে হবে। আত্মীয়তা রক্ষার নামে আল্লাহর নীতিমালার বাইরে গেলে বা আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে আ'মাল ও ইবাদাত বরবাদ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই কোনো অবস্থাতেই এটা লংঘন করা যাবে না।
কিন্তু আল্লাহর দেয়া নীতিমালা এবং আল্লাহর দেয়া সীমারেখা না জানার কারণে অনেক ক্ষেত্রে মানুষ ধোঁকায় পড়ে যায়। শয়তান তখন আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে মানুষকে ঈমানহারা করে। আর শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মানুষ তখন আত্মীয়তা রক্ষার নামে আল্লাহর দেয়া নীতিমালা লঙ্ঘন করে, আল্লাহর পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে।

তাই এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা জানতে হবে। এ ব্যাপারে কুরআন হাদীছে বর্ণিত নীতিমালা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং এসব নীতিমালা মেনে চলতে হবে। নিম্নে আত্মীয়তার ব্যাপারে অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নীতি পেশ করা হল..
নীতিঃ ১. আত্মীয়স্বজন যদি নীতিহীন, আদর্শহীন হয়ে আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়ে যায় তবে তাদের আপন বা মিত্র হিসেবে মেনে নেয়া যাবে না। বরং তাদের থেকে আদর্শিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3)

(মনে রেখ) কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়স্বজন, সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না। (সে দিন) তিনি সবাইকে একে অন্য থেকে আলাদা করে দেবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ সব প্রত্যক্ষ করেন। (৬০ মুমতাহিনাহঃ ৩)

নীতিঃ ২. যে সব আত্মীয় ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করে তাদের ওয়ালী তথা সামাজিক মিত্র বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23)

ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!) তোমাদের বাবা-মা, ভাইবোন যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করে তবে তাদেরকে ওয়ালী বানিও না /ওয়ালী হিসেবে মেনে নিও না। তোমাদের যে ব্যক্তি তাদেরকে ওয়ালী বানাবে /ওয়ালী হিসেবে মেনে নেবে সে অপরাধী হয়ে যাবে। (৯ তাওবাহঃ ২৩)

নীতিঃ ৩. আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর দ্বীন এবং দ্বীনি কাজের চেয়ে আত্মীয়স্বজনকে বেশী ভালবাসলে বা বেশী গুরুত্ব দিলে আল্লাহর আযাব অবধারিত হয়ে যায়। তাই আমাদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي

سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24)

বলে দাওঃ তোমাদের বাবা-মা, ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, স্ত্রীগণ, আত্মীয়স্বজন, নিজ হাতে অর্জিত সম্পদ, নিজের ব্যবসা; যার লোকসানে তোমরা শঙ্কিত থাক, তোমাদের পছন্দের ঘরবাড়ী, (এসব) যদি আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল অথবা আল্লাহর পথে জিহাদ অপেক্ষা বেশী প্রিয় হয়ে যায় তবে অপেক্ষা কর। আল্লাহ তার আযাব পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না। (৯ তাওবাহঃ ২৪)

নীতিঃ ৪. যে সব আত্মীয়স্বজন দ্বীনি কাজে বাঁধা হয়ে দাড়ায় এদেরকে আদর্শিক শত্রু হিসেবে দেখতে হবে। তবে পারিবারিক ভাবে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14)

ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!) তোমাদের কোনো কোনো স্ত্রী ও সন্তান তোমাদের শত্রু, (যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ, হিজরত, দ্বীনি কাজ ও দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার থেকে বিরত রাখে) তাই তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকো। তবে তাদের উপেক্ষা কর, ক্ষমা কর, মার্জনা কর (এটাই উত্তম হবে।) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়। (৬৪ তাগা'বুনঃ ১৪)

৮ম অনুচ্ছেদঃ আত্মীয়তা রক্ষার বিধান

দুনিয়া এক বিচিত্রময় জায়গা। দুনিয়ার মানুষগুলোও বিচিত্রময়। আমাদের আত্মীয়স্বজনও এ বৈচিত্রের বাইরে নয়। আসলে আত্মীয়স্বজন নানা ধরণের এবং নানা স্বভাবের হয়ে থাকেন। যেমন..

- নীতিবান আদর্শবান দ্বীনদার আত্মীয়।
- নীতিহীন আদর্শহীন দ্বীনহীন আত্মীয়।
- যে সব আত্মীয় পাপের পথে চলে এবং পাপের কথা বলে।
- যে সব আত্মীয় দ্বীনি কাজে বাঁধা দেয়।
- যে সব আত্মীয় ইসলামের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালবাসে।
- যে সব আত্মীয়স্বজন ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে যায়, ইসলাম বিরোধী হয়ে যায়।
- অভদ্র আত্মীয়স্বজন। ইত্যাদি।

তাই আত্মীয়দের শ্রেণী, স্বভাব ও ধরণ বুঝে আত্মীয়তা রক্ষার নীতিমালাও ভিন্ন ভিন্ন হবে। এবং আত্মীয়দের অবস্থা বুঝে বিধান প্রয়োগ করতে হবে। যেমন...

বিধানঃ ১. যে সব আত্মীয় নীতিবান, আদর্শবান এবং দ্বীনদার হবেন তাদের ব্যাপারে আত্মীয়তা রক্ষার সকল নীতিমানা ও বিধান মেনে চলতে হবে। কোনো অবস্থাতেই তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না বা দূরত্ব বজায় রাখা যাবে না। তাদের ব্যাপারে আমরা মেনে চলব আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ। যেমন ইরশাদ হচ্ছে..

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (6)

নবী (এবং নবীর প্রতিনিধি হিসেবে ইসলামী সরকার) মুঅমিনদের ব্যাপারে তাদের নিজের চেয়েও বেশী দায়িত্বশীল। নবীর স্ত্রীগণ তাদের মা। (মা হিসেবে নবীর স্ত্রীদের ভরণপোষণ করা জাতির কর্তব্য। জাতির পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব পালন করবে সরকার।) আল্লাহর কিতাবে (বর্ণিত বিধান মতে) মুঅমিন মুহাজির আত্মীয়স্বজন পরস্পরের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। (এ হচ্ছে দায়িত্ব বহনের সীমানা) তবে তোমরা তোমাদের আওলিয়াদের (মিত্রদের/দায়িত্বের আওতাধীন ব্যক্তিদের) ব্যাপারে আইনত দায়িত্ব পালন করবে। এসবই হলো কিতাবে লিপিবদ্ধ (বিধান।) (আহযাবঃ ৬)

জ্ঞাতব্যঃ ইসলামের সূচনাতে বিধান ছিলঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি মারা গেলে রাসূল সা. তার জানাযা পড়াতেন না (যতক্ষণ না কেউ ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নেয়।) আর উক্ত আয়াত নাযিলের পর রাসূল সা. ঘোষণা করলেনঃ মুঅমিনদের ব্যাপারে আমি তাদের নিজের চেয়েও বেশী দায়িত্বশীল, (আল্লাহ আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন) সুতরাং কেউ ঋণ রেখে মারা গেলে এটা পরিশোধের দায়িত্ব আমার আর সম্পদ রেখে মারা গেলে এটা তার উত্তরাধিকারীদের। (কুরতুবীঃ বুখারী, মুসলিম) (দেখুন বুখারীঃ ৪৪১৯ তাফসীর অধ্যায়)

আইন ও বিধানঃ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, ইত্যাদি হচ্ছে মানুষের নাগরিক অধিকার। প্রতিটি নাগরিকের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। মানুষ তার নিজের অধিকারের ব্যাপারে যতটুকু দায়িত্ব শীল, সরকার এরচেয়ে বেশী দায়িত্বশীল হবে। সরকারকে এ দায়িত্ব দিয়েছে ইসলাম। তাই কেউ তার নিজের উপর, পরিবারের উপর, সন্তানের উপর বা দাসদাসীর উপর অবিচার করলেও সরকারকে এসব ঠেকাতে হবে। কেউ ঋণ রেখে মারা গেলে তার সম্পদ বন্টনের আগে রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে এটা পরিশোধ করতে হবে আর সম্পদ না থাকলে এ ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব সরকারের, ইসলামী সরকার এ ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবে।

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে..

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)

যারা ঈমান আনে, হিজরত করে, আল্লাহর পথে জিহাদ করে আর যারা এদেরকে আশ্রয় দেয়, সাহায্য করে, তারাই (তথা এ ৫ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিরাই) আসল মুঅমিন। তাদের জন্য আছে সাধারণ ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজক। আর যারা পরে ঈমান আনবে, হিজরত করবে এবং তোমাদের সঙ্গী হয়ে জিহাদ করবে তারাও তোমাদের সঙ্গী হিসেবে বিবেচিত হবে। আল্লাহর কিতাবে (লিখিত বিধান মতে) নিকট আত্মীয়গণ একে অপরের ওয়ালী। (৮ আনফালঃ ৭৪-৭৫)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ ওয়ালী পরিচিতিঃ আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে ওয়ালী বানানো কুফর। বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্য নিম্নে ওয়ালীর সংজ্ঞা ও সংক্ষিপ্ত বিধান তুলে ধরা হল।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ বদ্ধ থাকা মানুষের স্বভাব। এক সাথে একই সমাজে বাস করতে গিয়ে মানুষ পরস্পরে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। একে অপরের আপন হয়ে যায়। এমন সম্পর্ককে বলা হয় বন্ধুত্ব।

ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন। ইসলামই মানব জাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন আদর্শ। জীবনের সকল বিষয়ে মৌলিক নীতিমালা ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম। বন্ধুত্ব মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ব্যাপারটি এড়িয়ে যায়নি ইসলাম। শারীয়া'হ বিধান মতে বন্ধুত্বের কয়েকটি ধাপ রয়েছে। যথাঃ

ক. সাধারণ বন্ধু, রাফিক্বঃ রাফিক্ব অর্থ কোমল, নমনীয়। চলার পথে, কর্মক্ষেত্রে বা সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের মাঝে পরস্পরে সম্পর্ক গড়ে উঠে। এক সময়ে এ সম্পর্ক হৃদ্যতায় রূপ নেয়। মানুষ তখন একে অন্যের প্রতি কোমল ও নমনীয় হয়ে যায়। এমন সম্পর্কের উপর গড়ে উঠা বন্ধুকে বলা হয় সাধারণ বন্ধু, রাফিক্ব।

খ. বিশ্বস্থ বন্ধু, সাদীক্বঃ সাদীক্ব অর্থ বিশ্বস্থ। ধীরে ধীরে মানুষের সম্পর্ক আরো গভীর হয়। এক পর্যায়ে একে অন্যকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। একে অপরকে বিশ্বাস করে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও শামিল করে নেয়। এমন বন্ধুকে বলে সাদীক্ব, বিশ্বস্থ বন্ধু।
বিধানঃ রাফিক্ব ও সাদীক্ব এ দুই ধরণের বন্ধুত্বের মূলভিত্তি মানবতা। মানুষ হিসেবে যে কারো সাথে এমন বন্ধুত্ব হতে পারে। এতে শারীয়া'হ কোনো বাধা নিষেধ আরোপ করেনি।

গ. অন্তরঙ্গ বন্ধু বা আদর্শিক বন্ধু, খালীলঃ খালীল অর্থ অতি আপনজন, একান্ত বন্ধু, অন্তরঙ্গ বন্ধু। দিনে দিনে মানুষের সম্পর্ক আরো গভীর হয়। এক সময় বন্ধুত্বের সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, এক বন্ধু অন্য বন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। এমন অন্তরঙ্গ ও আদর্শিক বন্ধুকে বলে খালীল, একান্ত বন্ধু বা অন্তরঙ্গ বন্ধু।

এমন বন্ধুত্বের মূল বিষয় আন্তরিক ভালোবাসা বা একনিষ্ঠ ভালোবাসা। এমন বন্ধুত্ব সবার সাথে করা ভালো নয়। মন্দলোকের সাথে এমন সম্পর্ক করলে বিভ্রান্তির সম্ভাবনাই বেশী। তাই রাসূল সাঃ এমন বন্ধুত্বের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন। বর্ণিত হয়েছে..

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم **المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل** ..رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والبيهقي

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ মানুষ তার খালীলের আদর্শে আদর্শবান হয়। তাই সে যেন ভেবে দেখে; কাকে সে খালীল বানাবে। (আহমদ, আবু-দাউদ, তিরমিযী। ইমাম নববী বলেছেনঃ হাদীছটি সাহীহ।)

ঘ. ওয়ালীঃ ওয়ালী অর্থ মিত্র, অভিভাবক, দায়িত্বশীল। বন্ধুত্বের সম্পর্ক যখন এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, এক বন্ধু আরেক বন্ধুর দায়ভার নিতে বা বন্ধুর জন্য কোনো ঝামেলায় জড়াতেও দ্বিধা করে না। অর্থাৎ যে বন্ধুত্বের সাথে অভিভাবকত্বসহ অনেক দায়ভার এসে যায়। এমন বন্ধুকে বলে ওয়ালী।

কে ওয়ালী হবেঃ ওয়ালী ব্যক্তি হতে পারে, পরিবার হতে পারে, সম্প্রদায় হতে পারে, জাতি হতে পারে বা রাষ্ট্র হতে পারে। ওয়ালীর সাথে সামাজিক অভিভাবকত্বও জড়িত। সামাজিক চুক্তি, শান্তি চুক্তি, সামরিক চুক্তি, ইত্যাদির মাধ্যমেও পরস্পরের ওয়ালী হওয়া যায়। ওয়ালী হবার অনেক পদ্ধতি ও সূত্র রয়েছে। যথা...

- জন্ম সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ বাপ সন্তানের ওয়ালী হবে যদি সে মুঅমিন হয়।
- সামাজিক সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ স্বামী তার স্ত্রীর ওয়ালী, সরকার জনতার ওয়ালী হবে যদি তারা মুঅমিন হয়।
- কোনো কাফির, মুশরিক, নাস্তিক বা মুরতাদ (যতই আপন হক না কেন) মুঅমিনের ওয়ালী হতে পারবে না।
- চুক্তির মাধ্যমেও একে অপরকে ওয়ালী বানানো যায়। ব্যক্তির সাথে, পরিবারের সাথে, সম্প্রদায়ের সাথে, জাতির সাথে এবং রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে একে অপরকে ওয়ালী বানাতে পারবে।

ওয়ালী হবার বা ওয়ালী বানাবার মূল ভিত্তি ঈমান। মুসলিমগণ শুধু ঈমানের ভিত্তিতেই একে অপরের ওয়ালী হতে পারবে বা ওয়ালী বানাতে পারবে। কাফির, মুশরিক বা মুনাফিক কোনো মুঅমিনের ওয়ালী হতে পারে না। এদের সাথে এমন সম্পর্ক রাখা পাপ ও বিভ্রান্তির পথ। প্রকৃত মুঅমিন না হলে আপন বাবা, মা, ভাই, বোনদের সাথেও এমন সম্পর্ক রাখতে বারণ করা হয়েছে। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ২৩) তাই তো...

- কাফির পিতা মুসলিম সন্তানের ওয়ালী হয় না। তাই মুসলিম সন্তান মারা গেলে কাফির পিতা তার সম্পদে আওংশ পায় না।
- কাফির সন্তান মুসলিম পিতা-মাতার ওয়ালী হয় না। তাই তারা মারা গেলে কাফির সন্তান তাদের সম্পদে অংশ পায় না।
- কাফির বা মুশরিক স্বামী মুসলিম স্ত্রীর ওয়ালী হয় না। তাই স্বামী মুরতাদ হয়ে গেলে বা কাফিরের স্ত্রী মুসলিম হয়ে গেলে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে যায়। এবং এই স্ত্রী তালাক ছাড়াই অন্য মুসলিমকে বিয়ে করতে পারে।

(এসম্পর্কে জানতে আমাদের সিলেবাসের ৪র্থ বইয়ে "আল-ওয়ালা ওয়া-ল-বারা" পাঠটি পড়ে নিন)

বিধানঃ ২. যে সব আত্মীয়স্বজন নীতিহীন আদর্শহীন হয়ে পাপের পথে চলে গেছেন তাদের সাথে আমরা ভালো ব্যবহার করব তবে তাদের নীতি আদর্শ গ্রহণ করব না, পাপের পথে তাদের সঙ্গী হব না। তাদের ব্যাপারে মেনে চলব আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত মুসলিমের হাদীছ, যা এ অধ্যায়ের ৫ম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে উৎসাহ দেয়া হয়েছে; আত্মীয়স্বজন খারাপ হয়ে গেলেও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে।

বিধানঃ ৩. যে সব আত্মীয় পাপের পথে চলে এবং পাপের কথা বলে। তাদের ব্যাপারে আমরা মেনে চলব সূরাহ লুক্বমানের ১৫তম আয়াতের বিধান। যেখানে বলা হয়েছেঃ

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15)

আর বাবা-মা যদি কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে যায় এবং শিরক (পাপ) করার জন্য তোমার উপর চাপ প্রয়োগ করে, তুমি তবুও তাদের কথা মেনে নিও না। তবে দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে মা'রুফ (রীতিনীতি এবং আইন ও বিধান) মত সহাবস্থান করবে। আর (আদর্শগত ভাবে) শুধু তার পথই গ্রহণ করবে যে আমার দিকে ধাবিত হয়। তোমরা সবাই আমার কাছে ফিরে আসবে, আমিই বদলা দেব তোমাদের সকল কাজের। (৩১ লুক্বমানঃ ১৫)

বিধানঃ ৪. যে সব আত্মীয় ইসলামের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসবে আমরা তাদেরকে আত্মীয় হিসেবে মেনে নিলেও আপন হিসেবে বা সামাজিক মিত্র হিসেবে অথবা অভিভাবক হিসেবে মেনে নেব না। এ ব্যাপারে আমরা মেনে চলব সূরাহ তাওবাহর ২৩ তম আয়াতের বিধান। যেখানে বলা হয়েছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23)

মুঅমিনগণ! তোমাদের বাবা-মা, ভাইবোন যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী পছন্দ করে তবে তোমরা তাদেরকে ওয়ালী (অভিভাবক বা সামাজিক মিত্র) বানিও না /মেনে নিও না। তোমাদের যে ব্যক্তি তাদেরকে ওয়ালী বানাবে /ওয়ালী হিসেবে মেনে নেবে সে অপরাধী হয়ে যাবে। (৯ তাওবাহঃ ২৩)

বিধানঃ ৫. আমাদের যে সব আত্মীয় দ্বীনি কাজে বাঁধা দেবে বা বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে আমরা তাদের সাথে আত্মীয় হিসেবে ভালো ব্যবহার করব। তবে তাদেরকে আদর্শিক শত্রু মনে করব। তাদের ব্যাপারে মেনে চলব সূরাহ তাগা'বুনের ১৪তম আয়াত। যেখানে বলা হয়েছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14)

মুঅমিনগণ! তোমাদের কোনো কোনো স্ত্রী ও সন্তান তোমাদের শত্রু, (যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ, হিজরত, দ্বীনি কাজ ও দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার থেকে বিরত রাখে) তাই তাদের ব্যাপারে সাবধান থেকো। তাদের উপেক্ষা কর, ক্ষমা কর, মার্জনা কর (এটাই উত্তম) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়। (৬৪ তাগা'বুনঃ ১৪)

বিধানঃ ৬. আমাদের যে সব আত্মীয় ইসলাম বিদ্বেষী বা ইসলাম বিরোধী হয়ে যাবে তাদের ব্যাপারে আমাদেরকে কঠোর হতে হবে। প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে হবে। যেমন করেছেন নবী সা.সহ অন্যান্ন নবী রাসূল ও সাহাবীগণ। যে কথা বলা হয়েছে এ অধ্যায়ের ৭ম অনুচ্ছেদে।

৪র্থ সেমিষ্টার ১২তম দিন

ওয়াদা, কসম ও কাফফারাহ

ওয়াদা, কসম, কসমের বিধান ও কাফফারাহ বলতে গেলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ বিশেষ। তাই দ্বীনের পথে চলতে হলে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। আর এ আবশ্যকতার বিষয়টি বিবেচনা করেই পাঠটিকে আমাদের কোর্সের অন্তর্গত করা হয়েছে।

১ম পাঠঃ ওয়াদা

আমাদের উপর অর্পিত আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হলো ওয়াদা করলে বা অঙ্গীকার করলে এটা পূর্ণ করা। আসলে বিষয়টি আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই বিস্তৃত। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন..

..আর তোমরা ওয়াদা পূর্ণ করবে। নিশ্চয় ওয়াদা সম্পর্কে (আল্লাহর কাছে) জবাবদিহি করতে হবে। (১৭ ইসরাঃ ৩৪)	**وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا**

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91)

(হে আমার বান্দাগণ!) তোমরা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। ওয়াদাকে শপথে রূপান্তিত করার পর এটা আর ভঙ্গ করবে না। কারণ (আল্লাহর নাম ব্যবহার করে) তোমরা আল্লাহকে এর জিম্মাদার বানিয়ে ফেলেছ। (সুতরাং এরপর ও এটা ভঙ্গ করলে আল্লাহর নামের অবমাননা হয়। মনে রেখো!) তোমরা যা কর আল্লাহ এসকল ব্যাপারে অবগত। (১৬ নাহ'লঃ ৯১)

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (94) وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (95)

(হে মুঅমিনগণ!) তোমরা তোমাদের শপথ ও অঙ্গীকারকে প্রতারণার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করো না। এমন করলে (তোমরা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে এবং তখন) প্রতিষ্ঠিত হবার পরও তোমাদের পা পিছলে যেতে পারে। তখন আল্লাহর পথ থেকে বিরত থাকার কারণে তোমাদেরকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। আর (এমন করলে আখেরাতে) তোমাদের জন্য নির্ধারিত হবে কঠিন আযাব।
তোমরা আল্লাহর নামে শপথ করার পর সামান্য দুনিয়ার স্বার্থে এসব বদলে দিও না। (মনে রেখো! শপথ পূর্ণকারীর পুরস্কার হিসেবে) আল্লাহর কাছে যা রয়েছে (সমগ্র দুনিয়ার চেয়েও) এটা অনেক অনেক উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে। (শপথের বিধান জানতে দেখুন সূরাহ বাক্বারাহঃ ২২৫)

২য় পাঠঃ কসম ও কসমের বিধান

কসম ৩ প্রকার হয়ে থাকে। যথা.. গুরুত্বহীন কসম (লাগ'ওয়া,) মিথ্যা কসম (গু'মুস) ও উদ্দেশ্যমূলক কসম (মুনআ'ক্বিদাহ।)

লাগ'ওয়াঃ কসমের ইচ্ছা না করে অভ্যাসগত বা উদ্দেশ্যহীন ভাবে কসমের শব্দ ব্যবহার করা অথবা অতীতের কোনো বিষয়কে সত্য মনে করে কসম করার নাম লাগ'ওয়া কসম। লাগ'ওয়া কসমে পাপ হয় না এবং লাগ'ওয়া কসমে কাফফারাহ দিতে হয় না।

গু'মুসঃ অতীতের কোনো বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কসম করাকে গু'মুস বলে। গু'মুস কসমে পাপ হয়। এজন্য তাওবাহ ও ইস্তিগফার করতে হয়। তবে কাফফারাহ দিতে হয় না।

মুনআ'ক্বিদাহঃ ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার বা না করার কসমকে মুনআ'ক্বিদাহ বলে। মুনআ'ক্বিদাহ কসম করলে পাপ হয় না। তবে মুনআ'ক্বিদাহ কসম ভঙ্গ করলে কাফফারাহ দিতে হয়। মুনআ'ক্বিদাহ কসমের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান হচ্ছে..

- কোনো ভালো কাজ না করার কসম করলে এটা ভঙ্গ করে কাফফারাহ দিতে হয়।
- কোনো মন্দ কাজ করার জন্য কসম করলে এটা ভঙ্গ করে কাফফারাহ দিতে হয়।
- সাধারণ ভাবে মুনআ'ক্বিদাহ কসম পূর্ণ করতে হয়।
- মুনআক্বিদাহ কসম ভঙ্গ করলে কাফফারাহ দিতে হয়।
- কসমের কাফফারাহ হচ্ছে দশজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা অথবা বস্ত্র দান করা অথবা একজন দাসকে মুক্ত করে দেওয়া। আর এ তিনটির কোনোটি করতে সক্ষম না হলে তিনটি রোজা রাখতে হয়।
- আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে কসম করা বৈধ নয়। এমন কাজকে হাদীছে শিরক বলা হয়েছে।

৩য় পাঠঃ কাফফারাহ

আমাদের আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হচ্ছে কোনো অপরাধ করার পর আল্লাহ প্রদত্ত কাফফারাহ (পাপ মোচনের জন্য নির্ধারিত পণ বা জরিমানা) নির্ধারণ হলে এটা আদায় করা।

কাফফারহ পরিচিতিঃ কাফফারহ অর্থ রিমোভার বা মোচনকারী। কখনো কোনো কাবীরাহ গোনাহ (মহাপাপ) হয়ে গেলে এসব পাপ মোচনের জন্য সুনির্দিষ্ট পন্থা বাতলে দিয়েছে ইসলাম। সাধারণত মহাপাপের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পেতে ক্ষমার ব্যবস্থা রয়েছে ইসলামে। তাওবাহ ও ইস্তিফগারের মাধ্যমে মহাপাপ থেকে ক্ষমা পাওয়া যায় আর কাফফারাহ আদায় করলে পাপটি মোচন হয়ে যায়। কাফফারাহ আসলে পাপ মুক্তির জরিমানা বা পণ।

উল্লেখ্য সকল পাপের জন্য কাফফারাহ দিতে হয় না। নির্ধারিত কয়েকটি পাপের কারণে কাফফারাহ আদায় করা ফরজ হয় এবং প্রতিটি বিষয়ের কাফফারাহ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন..

ক. কসম ভঙ্গের কাফফারাহঃ ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার বা না করার জন্য কসম করলে এ কসম রক্ষা করা আবশ্যকীয় হয়ে যায়। আর এমন কসম ভঙ্গ করলে কাফফারাহ (পাপ মোচনের জন্য নির্ধারিত পণ বা জরিমানা) আদায় করতে হয়।

কসমের কাফফারাহ হচ্ছেঃ ১০জন মিসকিনকে (২ বেলা) খাদ্য দান করা অথবা ১০ জন মিসকিনকে (১ জোড়া করে) বস্ত্র দান করা অথবা একজন দাসকে মুক্ত করে দেওয়া। আর এ তিনের কোনোটি করতে সক্ষম না হলে ৩টি রোজা পালন করা। ইরশাদ হচ্ছে..

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ **(89)**

লাগ'ওয়া কসমের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। তবে ইচ্ছাকৃত কসমের জন্য অবশ্যই পাকড়াও করবেন। (তোমরা কসম করলে এটা পূর্ণ করবে। আর কসম ভঙ্গ করলে কাফফারাহ দিবে। কসমের) কাফফারাহ হল..

- দশজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা, (এমন মানের খাদ্য) যা তোমরা সাধারণত পরিবারে খেয়ে থাকো
- অথবা (দশজন মিসকীনকে) বস্ত্র দান করা, (প্রত্যেককে ১ জোড়া করে বস্ত্র দেবে। একটি নীচের আর একটি উপরের)
- অথবা একজন দাসকে মুক্ত করে দেওয়া।
- আর (এ তিনটির কোনোটি) না পারলে তিনদিন রোজা পালন করা।

এটা হল কসমের কাফফারাহ। তোমরা কসম (করলে এটা) রক্ষা করবে। আল্লাহ এভাবেই তার বিধান স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা শোকর আদায় কর। (৫ মাইদাহঃ ৮৯)

খ. হত্যার কাফফারাহঃ এক মুসলিমের জন্য বৈধ কারণ (তথা এমন কোনো অপরাধ প্রমাণিত হওয়া যে কারণে শারয়ী' আইন মতে ইসলামী আদালত তাঁর মৃত্যুদন্ড দিয়েছে) ব্যতীত অন্য মুসলিমকে হত্যা করা মহাপাপ। কখনো ভুলবশত এমন হয়ে গেলে হত্যাকারী ব্যক্তি (নিহতের পরিবারকে) দিয়াত (রক্তপণ) এবং কাফফারাহ উভয়টি-ই আদায় করবে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا **(92)** وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا **(93)**

৯২. কোনো মুঅমিনের (মুসলিমের) জন্য বৈধ নয় অন্য মুঅমিনকে হত্যা করা তবে ভুলবশত (করে ফেললে ভিন্ন কথা)

- যে ব্যক্তি ভুলবশত কোনো মুঅমিনকে হত্যা করল তাকে অবশ্যই (কাফফারাহ এবং দিয়াত দুটি-ই আদায় করতে হবে।)
- (কোনো মুঅমিনকে ভুলবশত হত্যার কাফফারাহ হিসেবে) একজন মুঅমিন দাসকে মুক্ত করবে এবং নিহত ব্যক্তির পরিবারকে দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করবে। তবে নিহতের পরিবার মাফ করে দিলে (দিয়াত মাফ হয়ে যাবে কিন্তু কাফফারাহ মাফ হবে না।)
- নিহত মুসলিম ব্যক্তি শত্রু দেশের নাগরিক হলে শুধু (কাফফারাহ দিতে হবে তথা) একজন মুঅমিন দাসকে মুক্ত করে দিতে হবে।
- আর সে (নিহত মুসলিম ব্যক্তি) যদি এমন দেশের নাগরিক হয় যাদের সাথে তোমাদের (ইসলামী সরকারের নিরাপত্তা) চুক্তি রয়েছে তবে (হত্যাকারী) নিহত ব্যক্তির পরিবারকে দিয়াত আদায় করবে এবং (কাফফারাহ ও আদায় করবে তথা) একজন মুঅমিন দাসকে মুক্ত করবে।
- নিহত ব্যক্তি যদি (মুক্ত করার জন্য) দাস না পায় (তবুও কাফফারাহ রহিত হবে না বরং) তখন (হত্যার কাফফারাহ হিসেবে) লাগাতার দুই মাস রোজা রাখবে।
- (হত্যাকারী এসব করবে) আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওবাহ (কবুলের পন্থা) হিসেবে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (সুতরাং আল্লাহর দেওয়া সকল বিধান-ই জ্ঞানগর্ভ এবং প্রজ্ঞায় ভরপুর)

৯৩. আর কেউ যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে কোনো মুঅমিনকে হত্যা করে তবে তার সাজা হল চির জাহান্নাম। আল্লাহ তার প্রতি গুস্বা হবেন, তাকে লা'নত করবেন, তার জন্য প্রস্তুত করবেন মহা-আযাব। (৪ নিসাঃ ৯২-৯৩)

গ. রোজা ভঙ্গের কাফফারাহঃ ফজরের সূচনা থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার খাদ্য, পানীয় এবং যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নাম সিয়াম সাধন করা বা সাওম পালন করা। আমাদের সমাজে ফার্সি শব্দকে বাংলার সাথে মিশিয়ে বলা হয় রোজা রাখা। রামাদ্বানের রাতে এ তিন কাজ করা বৈধ আর দিনে (রোজা অবস্থায়) এ তিনটি কাজ করা অবৈধ হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ **(187)**

পটভূমিঃ সূচনাতে যখন রোজা ফরজ করা হলো তখন রোজা পালনের নিয়মনীতি স্পষ্ট করে বলা হয়নি। ফলে রাসূল সাঃ ও সাহাবাগণ আহলে কিতাবের নিয়ম ও রীতি মেনে রোজা পালন করতেন। তখনকার রীতি অনুযায়ী ইফতারের পর ঘুমিয়ে পড়লে পরদিনের রোজা শুরু হয়ে যেত এবং তখন থেকে-ই পানাহার ও যৌন সঙ্গম হারাম হয়ে যেত। বিষয়টি আসলে সহজ ছিল না। তাই কিছু অঘটন ঘটে গেল। যেমন..

- এক রাতে দেরী করে বাড়ী ফিরে উমর রাঃ দেখলেন স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি স্ত্রীকে কাছে টেনে সহবাস করে ফেললেন। অন্য বর্ণনা মতে উমর রাঃ নিজে-ই ঘুমিয়ে পড়ে ছিলেন এবং ঘুম ভাঙ্গার পর সহবাস করেছেন। (ক্বুরতুবীঃ আবু-দাউদ)
- কাইস বিন সিমরাহ আল-আনসারী রা. একজন গরীব সাহাবী ছিলেন। সারাদিন তিনি খেজুর বাগানে কাজ করতেন। একদা রোজার দিনে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে জানতে পারলেন ঘরে খাবার কিছু-ই নেই। স্ত্রী খাবারের সন্ধানে অন্য বাড়ী গেলে কাইসের ক্লান্ত দেহ জুড়ে ঘুম জড়িয়ে এলো। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। স্ত্রী খাবার নিয়ে এসে দেখলেন স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছেন। কাইস রাঃ কিছু না খেয়ে-ই পরের দিনের রোজা শুরু করলেন। কিন্তু শরীরে আর কত সয়। দুপুরের পর তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। (ক্বুরতুবীঃ বুখারী)

এভাবে আরো কিছু ঘটনা ঘটল, এসব ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট সাহাবাগণ তাওবাহ করলেন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন। তাই এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান দিয়ে নাযিল হল.. তোমাদের তরে হালাল করা হলো সিয়াম পালনের রাতে নারী (স্ত্রী/দাসী) গমন। নারীরা তোমাদের পরিচ্ছদ আর তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানেনঃ তোমাদের কেও কেও নিজেকে প্রতারিত করেছো। (তবে) তিনি তোমাদের তাওবাহ কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। এখন থেকে তোমরা (রামাদ্বানের রাতে) যখন ইচ্ছা নারী গমন করতে পারবে। (এবং সঙ্গমকালে) তাই (সন্তান) কামনা করবে যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর তোমরা (রামাদ্বানের রাতে) খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করবে যতক্ষণ না (আকাশের পূর্ব দিগন্তে) রাতের কালো দাগ (দূর হয়ে এখান) থেকে ঊষার সাদা দাগ স্পষ্ট হয়ে উঠে। এরপর (পরবর্তী) রাত (তথা সূর্যাস্ত) পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করবে। তবে মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় নারী গমন করবে না। (মনে রাখবে!) এসব (বিধান) হলো আল্লাহর সীমানা। তোমরা আল্লাহর সীমানার কাছেও যাবে না। (আর শোনো!) আল্লাহ তার বিধান এভাবে-ই স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, যেন তারা মুত্তাক্বী হতে পারে। (বাক্বারাহঃ ১৮৭। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকে সে-ই মুত্তাক্বী)

আইন ও বিধানঃ সিয়াম পালনের রাতে স্ত্রী-সঙ্গম করা বৈধ কাজ। সেহরীর সময় ফজরের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠা পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সঙ্গম করা যাবে। মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রী-সঙ্গম করা যাবে না। তবে এ অবস্থায়ও স্ত্রী তার স্বামীর মাথার চুল আঁচড়ে দিতে পারবে বলে হাদীছ উল্লেখ আছে।

রামাদ্বান মাসে রোজা অবস্থায় দিনের বেলা যৌন সঙ্গম করলে পাপ হয় এবং এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে কাফফারাহ দিতে হয়। রাসূল সা. এমন বিধান দিয়েছেন বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

1834حدثنا **أبو اليمان** أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن **أن أبا هريرة** رضي الله عنه **قال بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله ﷺ هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي ﷺ فبينا نحن على ذلك أتي النبي ﷺ بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذها فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك**

আবু-হুরাইরাহ রা. বলেনঃ একদা আমরা নবী সা.র কাছে বসা ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! "আমি ধ্বংস হয়ে গেছি"।
রাসূল সা. বললেনঃ তোমার কী হয়েছে?
লোকটি বললঃ আমি রোজা অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করে ফেলেছি।
রাসূল সা. বললেনঃ তুমি কী কোনো গোলাম আজাদ করতে পারবে?
লোকটি বললঃ না..।
রাসূল সা. বললেনঃ তবে কী লাগাতার দুই মাস রোজা রাখতে পারবে?
লোকটি বললঃ না..।
রাসূল সা. বললেনঃ তবে কী ৬০ জন মিসকিনকে খাদ্য দান করতে পারবে?
লোকটি বললঃ না..
রাসূল সা. (আর কিছু বললেন না। তিনি ভাবতে লাগলেন। এভাবে) কিছু সময় পার করলেন। আমরা এভাবে-ই বসে রইলাম। এমন সময় রাসূল সা.র কাছে (হাদিয়া স্বরূপ) এক ঝুড়ি খেজুর এলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ প্রশ্নকারী ওই লোকটি কোথায়?
লোকটি বললঃ আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ!
রাসূল সা. বললেনঃ এ খেজুরগুলো নিয়ে সাদাক্বাহ করে (গরীবদের মাঝে বিলিয়ে) দাও!
লোকটি বললঃ আমার চেয়ে গরীবদের মাঝে বিলাব..? ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! মদীনার দুই সীমানার ভিতর আমার পরিবারের চেয়ে গরীব কোনো পরিবার নেই। (একথা শুনে) নবী সা. হেসে ফেললেন (তিনি এমন ভাবে হাসলেন যে) তার আনইয়াব (দুই পাশের ধারালো চুকা দাঁত) দেখা গিয়েছে। অতঃপর বললেনঃ (যাও!) তোমার পরিবারকে খাইয়ে দাও। (বুখারী ও মুসলিম)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ রামাদ্বান মাসে রোজা অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করলে রোজা ভেঙ্গে যায়, এ রোজা কাজা করতে হবে এবং এ জন্য কাফফারাহ দিতে হবে। এটা ফাক্বীহ ইমামগণের সর্বসম্মত মত, সবাই এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তবে রামাদ্বান মাসে রোজা অবস্থায় খাদ্য বা পানীয় দ্বারা রোজা ভঙ্গ করলে কাফফারাহ দিতে হবে কী না? এ ব্যাপারে রাসূল সা. থেকে কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়নি। তাই ফাক্বীগণ এ বিষয়ে একমত হতে পারেননি।
হানাফীদের মতে রামাদ্বান মাসে রোজা অবস্থায় দিনের বেলা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো প্রকার খাদ্য বা পানীয় দ্বারা রোজা ভঙ্গ করলেও কাফফারাহ দিতে হবে। আর অন্যদের মতে এ অবস্থায় শুধু কাজা করতে হবে।

ঘ. যিহারের (তালাকের) কাফফারাহঃ স্বামী তার স্ত্রীকে "মা" বলে ডাকলে বা মায়ের সাথে তুলনা করলে ইসলামী সমাজনীতির পরিভাষায় এটাকে "যিহার" বলা হয়। জাহেলী যুগে আরব সমাজে যিহার করে বলা হত "তুমি আমার উপর (হারাম হয়ে গেছো) যেমন আমার মায়ের পিঠ"। মানে তুমি আমার উপর হারাম হয়ে গেছো যেমন আমার মায়ের উপর উঠা আমার জন্য হারাম। তখনকার দিনে এভাবে যিহার করাকে তালাক হিসেবে গণ্য করা হত। এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)

(হে মুসলিমগণ!) তোমাদের যারা আপন স্ত্রীদের সাথে যিহার করল (তাদের জেনে রাখা উচিত) তাদের (মুখের কথায়) স্ত্রীগণ তাদের মা হয়ে যায় না। বরং যে নারী যাকে জন্ম দেয় কেবল সে-ই তার মা হয়। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে "যিহার" করল সে অতি ঘৃনিত কাজ করল, সে মিথ্যা কথা বলল। (তবে তাওবাহ করলে আল্লাহ মাফ করে দেন) নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

(যে বা) যারা স্ত্রীদের সাথে "যিহার" করল এবং অতঃপর তার কথা প্রত্যাহার করে নিল (তাদের স্ত্রীগণ তালাক হবে না। তবে এমন জঘন্যতম উক্তির জন্য কাফফারাহ দিতে হবে। যিহারের কাফফারাহ হলঃ স্বামী-স্ত্রী) একে অপরকে স্পর্শ করার আগে (স্বামী) একটি গোলামকে আজাদ করে দেবে। এটা হচ্ছে আল্লাহর আদেশ। (তাই এটা অবশ্যই পালন করবে আর মনে রাখবে) তোমাদের সকল ব্যাপারে আল্লাহ অবগত।
আর এটা (গোলাম আজাদ করতে) না পারলে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে স্পর্শ করার আগে (স্বামী) একাধারে দুই মাস রোজা রাখবে (এটা হচ্ছে যিহারের কাফফারাহ আদায়ের ২য় পদ্ধতি।)
আর যে ব্যক্তি এটাও পারবে না, সে ৬০ জন মিসকীনকে (২ বেলা) ভোজন করাবে (এটা হচ্ছে যিহারের কাফফারাহ আদায়ের ৩য় পদ্ধতি।)
এসব (বিধান পালন করা) হলো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের দাবী। এসব হলো আল্লাহর সীমানা। (তোমরা আল্লাহর সীমানা লঙ্ঘন করো না। কারণ যে ব্যক্তি নীতিগত ভাবে আল্লাহর সীমানা লঙ্ঘন করে সে কাফির হয়ে যায়) আর কাফিরদের তরে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৫৮ মুজাদালাহঃ ২-৪)

আইন ও বিধানঃ যিহার শব্দটি এসেছে "যাহর" থেকে। আরবী "যাহর" অর্থ পিঠ। আর যিহার হলো পিঠের সাথে তুলনা করা। স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে "তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত"। সামাজিক পরিভাষায় এটাকে যিহার বলা হয়। "যাহর" শব্দের অর্থ পিঠ হলেও যিহার শব্দটি আরবী সমাজে আরোহণ করা বা উপরে উঠার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সঙ্গমকালে সাধারণত পুরুষ নারীর উপরে উঠে। সে মতে এর অর্থ দাঁড়ায়ঃ মায়ের উপরে উঠা যেভাবে হারাম স্ত্রীর উপর উঠাকেও সেভাবে হারাম করে নেওয়া। অর্থাৎ নিজের স্ত্রীকে হারাম করে ফেলা, যা তালাকের ইঙ্গিত বহন করে। তাই আরব সমাজে বিষয়টিকে অতি গুরুত্ব দিয়ে তালাক হিসেবে দেখা হত। যিহারের কিছু বিধান নিম্নে উল্লেখ করা হল..

- যিহারের মূল বিষয় হচ্ছে নিজের স্ত্রীর পিঠকে মায়ের পিঠের সাথে তুলনা করা। (অর্থাৎ স্ত্রীর উপরে উঠাকে মায়ের উপরে উঠার মত হারাম করে নেওয়া)
- কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে "তুমি আমার জন্য মেয়ের পিঠের মত বা বোনের পিঠের মত বা অন্য মহরাম নারীর সাথে তুলনা করে তবেও যিহার হয়ে যায়। ইমাম মালিক ও আবু-হানীফাহ এমন-ই বলেছেন। ইমাম শাফিয়ী থেকে এ ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়ঃ এক মতে যিহার হবে, আর এক মতে হবে না।
- "যিহার" ইসলামিক পারিবারিক আইনের অংশ। এ আইন মুসলিমদের বেলায় প্রযোজ্য। তাই ইসলামী দেশের অমুসলিম নাগরিক যিহার করলে তালাক হবে না। কারণ কুরআনে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে "তোমাদের কেউ যদি যিহার করে" মানে মুসলমানদের কেউ (ঈমাম আবু-হানীফাহ এ কথা বলেছেন)
- যিহারকারী স্বামী কাফফারাহ আদায়ের আগে স্ত্রী সহবাস করতে পারবে না।

ঙ. ইহ্‌রাম অবস্থায় চুল কাটার কাফফারাহঃ হাজ্জ বা উমরার ইহরামরত অবস্থায় চুল কাটা নিষিদ্ধ। এমতাবস্থায় কোনো কারণ বশত চুল কেটে ফেললে কাফফারাহ (পাপ মোচনের জন্য নির্ধারিত পণ বা জরিমানা) দিতে হবে। এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196)

(মুঅমিনগণ!) তোমরা হাজ্জ ও উমরাহ (শুরু করলে তা) পূর্ণ করবে (আর এটা করবে) শুধুই আল্লাহর জন্য। (ইহরামের পর হাজ্জ বা উমরাহ পালনে) বাধাগ্রস্ত হলে সাধ্যমত হাদয়ী (পশু কুরবাণী) দিবে। হাদয়ী যথাস্থানে পৌঁছার আগে তোমরা মাথা মুন্ডাবে না। তবে কেউ অসুখ হলে বা মাথায় সমস্যা হলে (মুন্ডিয়ে ফেলবে এবং এর) ফিদয়াহ হিসেবে (৩টি) রোজা রাখবে অথবা (৬জন মিসকিনকে) সাদাক্বাহ (হিসেবে খাদ্য) দেবে অথবা (১টি ছাগল বা ভেড়া) কুরবাণী করবে। আর নিরাপদ অবস্থায় হাজ্জ মৌসুমে (শাওয়্যাল, যু-ল-ক্বাই'দাহ, যু-ল-হি'জ্জাহ মাসে) উমরাহর সুবিধা নিলে (তথা তামাত্তু' বা ক্বিরান হাজ্জ করলে) সাধ্যমত হাদয়ী দিতে হবে। হাদয়ী না পেলে ১০টি রোজা পূর্ণ করবেঃ ৩টি হাজ্জকালীন সময়ে (মক্কায়) আর ৭টি (বাড়ি) ফিরে গিয়ে। এটা (হাদয়ীর বদলে রোজার বিধান) তার জন্য যার পরিবার মক্কায় থাকে না। তোমরা সবাই আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে আর মনে রেখো! আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। (বাক্বারাহঃ ১৯৬)

আইন ও বিধানঃ

- হাজ্জ ও উমরাহ হবে শুধুই আল্লাহর জন্য। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হাজ্জ বা উমরাহ করলে এর ছাওয়াব পাওয়া যাবে না;
- হাজ্জ বা উমরাহ শুরু করার (ইহরামের) পর বাঁধাগ্রস্ত হলে হাদয়ী (পশু কুরবাণী) দিয়ে এবং মাথার চুল কেটে ইহরাম থেকে বের হবে;
- হাদয়ী যথাস্থানে পৌঁছানোর পর চুল কাটতে হবে;
- কোনো অসুস্থতা বা অসুবিধার কারণে সময়ের আগে মাথার চুল কেটে ফেললে ফিদইয়াহ দিতে হবে;
- চুল কাটার ফিদইয়াহ হিসেবে ৩টি (মতান্তরে ১০টি) রোজা রাখতে হয় অথবা ৬জন মিসকিনকে খাবার দিতে হয় অথবা ১টি ছাগল/ভেড়া কুরবাণী করতে হয়;
- যে ব্যক্তি হাজ্জ করল সে যদি হাজ্জ মৌসুমে উমরাহ করে (তথা তামাত্তু' বা ক্বিরান হাজ্জ করে) তবে সে একটি হাদয়ী (পশু কুরবাণী) করবে আর পশু না পেলে ১০টি রোজা রাখবেঃ ৩টি হাজ্জ মৌসুমে আর ৭টি বাড়ি ফিরে গিয়ে। তবে মক্কার স্থায়ী বাসিন্দাদের রোজা রাখতে হবে না।
- উল্লেখ্য ইহরাম রত অবস্থায় চুল কাটার কাফফারাহকে ফিদইয়া বলা হয়।

চ. ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকারের কাফফারাহঃ হাজ্জ বা উমরার ইহরামরত অবস্থায় জলজ শিকার বৈধ হলেও স্থলজ প্রাণী বা পাখি শিকার বৈধ নয়। বরং এমন করা অন্যায় ও পাপ। কেউ এমন করলে এজন্য কাফফারাহ দিতে হয়। এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (94) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (95) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)

পটভূমিঃ শনিবার ছিল ইয়াহুদীদের ইবাদাতের দিন। এ দিনে ব্যবসা বানিজ্য, মৎস শিকারসহ দুনিয়াবী কাজকর্ম নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু শনিবারে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ তীরে ভেসে আসত। আসলে এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ পরীক্ষা। একদল ইয়াহুদ লোভ সামলাতে না পেরে নিষিদ্ধ হওয়া সত্বেও মাছ শিকারে মেতে উঠল। তারা আল্লাহর পরীক্ষায় ফেইল করেছে।
মহান আল্লাহ রাসূল সাঃর সাহাবাদেরও পরীক্ষা নিয়েছেন। আমাদের শারীয়া'হ মতে ইহরাম অবস্থায় পশুপাখি শিকার করা নিষিদ্ধ। হুদাইবিয়ার সফরে রাসূল সাঃ ও সাহাবাগণ ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। তখন পশুপাখি একেবারে নাগালের কাছে চলে আসত। কিন্তু সাহাবাগণ শিকার করেননি। তারা আল্লাহর পরীক্ষায় পাশ করেছেন। তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হয়েছে..

৯৪. মুঅমিনগণ! কিছু শিকারি জন্তু তোমাদের হাত ও তীরের নাগালে চলে আসছে (তবুও তোমরা শিকার করনি।) এভাবেই আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করেন। যেন প্রকাশিত হয় তোমাদের মাঝে কে না দেখেও আল্লাহকে ভয় করে (আর কে করে না।) যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে তার তরে যন্ত্রনাদায়ক আযাব।

৯৫. মুঅমিনগণ! তোমরা ইহ'রাম রত অবস্থায় (কোনো পশুপাখি) শিকার করবে না। তোমাদের কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে শিকার করে ফেললে এর প্রতিকার (কাফফারাহ) হিসেবে শিকারকৃত প্রাণীর সমতুল্য "হাদয়ী" মক্কায় পৌঁছে দেবে। তোমাদের (মুসলিমদের) মাঝে

বিচারিক জ্ঞান সম্পন্ন দুইজন ব্যক্তি (মান নির্ণয়ের) ফয়সালা করবে। অথবা (ইহরাম অবস্থায় শিকারের) কাফফারাহ হিসেবে মিসকীনকে খাদ্য দিবে বা সমপরিমাণ রোজা রাখবে। আর শিকারী ব্যক্তি এভাবে-ই তার কর্মফল ভোগ করবে। (তবে তোমাদের) অতীত আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৯৬. তবে তোমাদের (হাজীদের) আর (জাহাজে অবস্থানকারী) সঙ্গীদের জীবিকার জন্য সাগরের শিকার ও খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল করা হল। ইহরামে থাকাকালীন শুধু স্থলচর শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে (জলচর নয়।) তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর আর (মনে রেখো) তোমরা সবাই তার কাছে-ই ফিরে যাচ্ছ। (আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া) (৫ মাইদাহঃ ৯৪-৯৬)

আইন ও বিধানঃ অধিকাংশ উলামার মতে জলচর সকল প্রাণী-ই হালাল। কারণ উক্ত আয়াতে সাগরের শিকার এবং খাদ্যকে ব্যাপক ভাবে হালাল বলা হয়েছে। হাদীছেও ব্যাপক ভাবে হালাল বলা হয়েছে, কোনো কিছুকে আলাদা করা হয়নি। তবে কুমির আর উভচর সাপ হালাল নয়। কারণ এটা জলচর নয়, উভচর।
কোনো কোনো আলিম ব্যাঙ খাওয়া অবৈধ বলেছেন। কারণ রাসূল সাঃ ব্যাঙ মারতে নিষেধ করেছেন আর মারতে নিষেধ করা অবৈধ হবার ইঙ্গিত বহন করে।
হানাফী আলিমগণের মতে জলচর প্রাণীদের মাঝে শুধু মাছ খাওয়া যাবে। মাছ ছাড়া অন্যকিছু খাওয়া মাকরুহ।

৫ম সেমিষ্টার ১৩ তম দিন

সকালে মুঅমিন, বিকালে কাফির

প্রারম্ভিক কথাঃ ঈমান আখেরাতে মুক্তির সনদ। ঈমান ব্যতীত আখেরাতের মুক্তি পাওয়া যাবে না। আর কুফর, শিরক ও মুনাফিকী ঈমান বিনষ্টকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম যে কোনোভাবে কোনো প্রকার কুফর, শিরক বা মুনাফিকীতে জড়িয়ে পড়লে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় আর সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক।
কিন্তু বর্তমান বিশ্বে কুফর শিরকের সয়লাব চলছে। বর্তমানে আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতিসহ সবকিছুতেই কুফর ও শিরকের ছড়াছড়ি। আজকাল আমাদের কেও কেও জেনে বুঝে আর কেও কেও না জেনে, না বুঝে প্রতিনয়ত যে কুফর বা শিরকে জড়িয়ে যাচ্ছি, এ অনুভুতিটুকুও অনেকের নেই।
আর এক সময় যে মুসলিম সমাজের অবস্থা এমন হবে একথা আগেই বলে গেছেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সা.। এক হাদীছে বর্নিত হয়েছে..
আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ (হে আমার উম্মতেরা!) তোমরা যে যত পারো নেক-কাজ করে নাও। কারনঃ সামনে এমন দিন আসবে যখন রাতের আধারের মত ফিতনাহ ছড়িয়ে পড়বে। মানুষ তখন সকালে মুঅমিন হবে আর বিকালে কাফির, বিকালে মুঅমিন হবে আর সকালে কাফির। তারা দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীন বদলে ফেলবে। (মুসলিম, কিতাবু-ল-ঈমানঃ ১১৮)

অর্থাত তখন সমাজে কুফর শিরকের সয়লাব হয়ে যাবে। তাদের সাহিত্য, সংস্কৃতিসহ সবকিছুতেই কুফর ও শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটবে। ফলে মানুষ তখন ঈমানের উপর অবিচল থাকতে পারবে না। সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও সামাজিকতার নামে মানুষ তখন অহরহ এসব কুফর ও শিরকে জড়িয়ে ঈমানহারা হয়ে যাবে। কিছুক্ষন পর আবার তারা দ্বীনি বিধান মেনে চলবে, আবার ঈমানের পথে উঠে আসবে। একটু পর আবার এসব কুফর ও শিরকে জড়িয়ে পড়বে। তখন তাদের জীবনটা ঈমান ও কুফরের খেলাঘরে পরিনত হবে।

মানুষ কীভাবে সকালে মুসলিম ও বিকালে কাফির হয়ে যায় নিম্নে এর কিছু উদাহরন পেশ করা হল..
উদাহরনঃ ১ = প্রথমেই আসি সাহিত্যের কথায়। আমাদের বাংলা সাহিত্যে এক সময় হিন্দু লেখক ও কবীদের প্রতাপ ছিল খুবই বেশী। তাই স্বাভাবিক কারনেই তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো আমাদের সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করেছে। এরমাঝে অনেক কিছুই শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন ধরুন দুটি কবিতার দুটি লাইন..

- আয় আয় চাদ **মামা** টিপ দিয়ে যা
- সূর্যি **মামা** জাগার আগে উঠব আমি জেগে

কবিতার এ দুটি লাইন আমরা কত সহজভাবে পড়ি এবং বলি। কিন্তু এমন বলা বা বিশ্বাস করা যে শিরক এবং তাতে যে লুকিয়ে রয়েছে বিরাট গল্প ও হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় বিশ্বাস তা আমরা জানি না।
লাইন দুটির প্রতি লক্ষ্য করুন! এখানে চাদ ও সূর্য দুটিকেই মামা বলা হয়েছে। এখন ভাবুনতো চাদ ও সূর্যের সাথে কীভাবে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক হল? চাদ ও সূর্য কীভাবে আমাদের মামা হল?

আসলে হিন্দুরা তাদের দেবীকে মা বলে ডাকে। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস মতে..

- গাভী আমাদেরকে দুধ দেও, তাই গাভী হচ্ছে দেবী তথা গো-মাতা
- দেশ আমাদেরকে আশ্রয় দেয়, তাই দেশ হচ্ছে দেবী তথা দেশ মাতা। আর এখান থেকেই তৈরি হয়েছে "ভারত মাতা, বাংলা মাতা, দেশ মাতৃকা" ইত্যাদি সাংস্কৃতিক নানান শব্দ।

ছোটবেলা যখন চন্দ্র গ্রহন হত তখন আমাদের দাদী নানীর মুখে এ সম্পর্কিত অনেক গল্প শুনতাম, এসব গল্প থেকে জানা যায় "চাদ ও সূর্য তারা ছিল দুই ভাই"। আর এ দুই ভাই-ই হচ্ছে আমাদের মামা। আপনারা অবশ্যই জানেনঃ মামাদের সাথে সম্পর্ক হয় মায়ের মাধ্যমে। এখন ভাবুনতোঃ চাদ ও সূর্য যদি আমাদের মামা হয় তবে উনাদের বোন অর্থাত আমাদের মা-টা আসলে কে? আপনারা হয়তো জানেনঃ হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাস মতে পৃথিবীটা হচ্ছে তাদের মা।

আশা করি এখন বুঝতে পেরেছেনঃ হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাস মতে আমাদের এ পৃথিবী হচ্ছে তাদের দেবী-মা আর চাদ ও সূর্য হচ্ছে দেবী-মার দুই ভাই তাই তারা মামা। আর এমন বিশ্বাস সুস্পষ্ট শিরক। এ ভাবে আমাদের সাহিত্যের রন্দ্রে রন্দ্রে কুফর ও শিরকের অনুপ্রবেশ ঘোটেছে। যেমন..

- **"বিসমিল্লাতেই গলদ"**। এটা একটা কুফরী কথা। আসলে বিসমিল্লাতে কোনো ভুল নেই।

- **"কষ্ট না করিলে কেষ্ট পাওয়া যায় না"**। এটা একটা শিরকী কথা। আসলে কেষ্ট হচ্ছে হিন্দুদের একটি দেবতা। তাই কেষ্ট পাওয়ার জন্য কষ্ট করলে অবশ্যই শিরক হবে।
- **"এতে কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে"**? এটি একটি কুফরী কথা। একথার মানে হচ্ছে মহাভারতকে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে সীকৃতি দেওয়া। অথচ আল্লাহর কতাব ব্যতীত আর কোনো কিতাবই পরিপূর্নভাবে বিশুদ্ধ নয়। আর মহাভারত হচ্ছে হিন্দু ধর্কের একটি বই। যা মানবরচিত এবং মিথ্যায় পরিপূর্ন।
- **"দেখদেখা ধর্ম আর শিখশিখা কর্ম"**। মানে সমাজ দেখে ধর্ম পালন করতে হয় আর কর্ম শিখতে হয়। আসলে একথাটি শুধু হিন্দু ধর্মের বেলায় প্রযোজ্য। হিন্দু ধর্ক অবশ্যই দেখ দেখা, যার কোনো মূল ভিত্তি নেই। তবে ইসলামের কোনোকিছুই দেখ দেখা নয়। ইসলামের প্রতিটি কাজেরই দলীল রয়েছে। ইসলাম হচ্ছে এভিডেন্স বেইস বা দলীল নির্ভর একটি জীবন আদর্শ।
- **"অমুক আমাদের ঘরের লক্ষ্মি, এমন করলে লক্ষ্মি আসবে"**। একথাটিও শিরকের অন্তর্গত। কারন লক্ষ্মি হিন্দুদের দেবীর নাম। হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস হচ্ছে লক্ষ্মি কল্যাণের দেবী। আর আসল ব্যাপার হচ্ছে কল্যাণ বা অকল্যাণ সবকিছুই আল্লাহর হাতে।

এভাবেই হিন্দু ধর্মের অনেক বিশ্বাস আমাদের সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করেছে। সুতরাং নিজেদের ঈমান বাচিয়ে রাখতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই এসব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

উদাহরনঃ ২ = এবার আসুন সংস্কৃতিতে। আমাদের সাহিত্যের মত সংস্কৃতিতেও হিন্দু ধর্মের অনেক কুফর ও শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যেমন ধরুন বৈশাখী মেলা। বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে প্রতি বছর বৈশাখ মাসে বৈশাখী মেলার প্রচন ইদানিং খুব ব্যাপক আকার ধারন করেছে। আর বৈশাখী মেলা উপলক্ষ্যে আয়োজন করা হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা নামে একটি আনুষ্ঠানিকতার। আয়োজকদের ভাষ্যমতে মঙ্গল শোভাযাত্রার মূল উদ্দেশ্য জাতির মঙ্গল কামনা করা।

এখন কথা হল জাতির এ মঙ্গলটা তারা কার কাছে কামনা করে। একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেনঃ মঙ্গল শোভাযাত্রার জন্য যে ব্যানার বানানো হয় এতে থাকে পেচার ছবি। আর হিন্দু ধর্কের ধরমীয় বিশ্বাস মতে পেচা হচ্ছে লক্ষ্মিদেবীর বাহন। এ বাহনের মাধ্যমে লক্ষ্মিদেবীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে।

আশা করি এখন বুঝতেই পারছেন জাতির জন্য কার কাছে মঙ্গল কামনা করা হচ্ছে। আসলে আমাদেরকে বোকা বানিয়ে এরা লক্ষ্মি দেবীর কাছে মঙ্গল কামনা করছে। আর এতে শরীক হয়ে সরাসরি শিরকে জড়িয়ে ঈমানহারা হচ্ছে আমাদের সন্তানেরা।

অনুরুপভাবে আমাদের দেশের নাটক সিনেমায় ইসলাম, ইসলামী ব্যক্তিত্ব আর অসত মানুষগুলোকে টুপী, দাড়ী, পাঞ্জাবী, বুরকা, ইত্যাদি মুসলিমদের পোশাক পরিয়ে মুসলিম সংস্কৃতি নিয়ে রং তামাশা উপহাস ও মশকারা করা হচ্ছে। যা কুফরেরই নামান্তর।

উদাহরনঃ ৩ = এবার আসা যাক রাজনীতিতে। আমাদের দেশের রাজনীতির ভূল ভিত্তি গণতন্ত্র আর গণতন্ত্রের মূল বিশ্বাস জানগণের সার্বভৌমত্ব। যা সরাসরি আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিপরিত। সুতরাং এটা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখ্য মালিকানা দুই প্রকার হয়ে থাকে। যথাঃ বিধিবদ্ধ মালিকানা ও সার্বিক মালিকানা।

- যে মালিকানা আইনের আওতাধীন, যে মালিকানায় জবাবদিহিতা আছে, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায় না, এটা হচ্ছে বিধিবদ্ধ মালিকানা বা আইনসম্মত মালিকানা।
- পক্ষানতরে যে মালিকানা সকল আইনের উর্ধ্বে, যে মালিকানায় কোনো জবাবদিহিতা নেই, যে মালিকানায় যা ইচ্ছা তাই করা যায় এটা হচ্ছে সার্বিক মালিকানা বা সার্বভৌম মালিকানা।
- একমাত্র আল্লাহর মালিকানাই সার্বিক ও সার্বভৌম আর আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের মালিকানা বিধিবদ্ধ বা আইনের আওতাধীন।

উদাহরনঃ ৪ = এবার আসা যাক সমাজনীতিতে। মহান আল্লাহ আমাদের জন্য যে সমাজনীতি ঠিক করে দিয়েছেন এর নাম ইসলামী শারীয়া'হ। মানব সমাজ পরিচালনার জন্য একমাত্র বৈধ আইন ও রীতি হচ্ছে শারীয়া'হ আইন। শারীয়া'হর বিপরীতে অন্য কোনোকিছু মেনে নেওয়া কুফর আর মেনে চলা মহাপাপ। কিন্তু আমাদের সমাজের অধিকাংশ আইন ও রীতি-নীতিই শারীয়া'হ পরীপন্থি। যেমন..

১- ঘোষঃ ইসলামী শারীয়া'হ ঘোষকে হারাম করে দিয়েছে। ইসলামী শারীয়া'হ মতে ঘোষ দাতা ও ঘোষ গ্রহিতা উভয়েই অপরাধী। তিরমিযী ও আবু-দাউদে বর্নিত এক হাদীছে "ঘোষ দাতা, ঘোষ গ্রহিতা উভয়কেই লা'নত করেছেন রাসূল সা.।

এখন মনে করুনঃ একব্যক্তি সরকারী চাকরিজীবি। লোকটি মস্তবড় অফিসার। তার কথায় ও কলমের খুচায় অনেক কিছুই হতে পারে। লোকটি ফজরের সালাত আদায় করে মসজিদে বসে তাসবীহ, তাহলীল, তিলাওয়াত, তাওবাহ, ইস্তিগফার করে একজন মুঅমিনের মতই দিনটি শুরু করেছে।

সকাল সাড়ে ৯টায় অফিসে গিয়েই লোকটি ২০হাজার টাকা ঘোষ খেল। হারাম জেনেও কাজটি সে করল। কাওন সে মনে করে এসব তেমন কিছু নয়। দুনিয়ায় বেচে থাকতে এমন একটু আধটু করতে হবে। এমন মনে করে লোকটি ঈমানহারা হয়ে হয়ে গেল।

পর্যালোচনাঃ ঘোষ খাওয়া হারাম। ঘোষ দেওয়া বা নেওয়া পাপ তবে কুফর নয়। তবে আল্লাহ বা রাসূল কর্তৃক হারামকৃত কোনো বিষয়কে যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে অবহেলা বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলে কুফর হয়। আর আজকাল এমন কুফর করে ঈমানহারা হচ্ছে আমাদের কত মানুষ।

২- সুদঃ আল-কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষনা মতে সুদ হারাম। সুদ খাওয়া মহাপাপ। যেব্যক্তি সূদী লেনদেনে জড়িয়ে পড়ল সে ফাসিক হয়ে গেল। আর যেব্যক্তি সুদকে বৈধ মনে করবে অথবা সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারটি অস্বীকার, অমান্য বা অবজ্ঞা করবে সে কুফর করবে। এখন মনে করুনঃ একব্যক্তু সূদী ব্যাংকে একাউন্ট খুলেছে। তার একাউন্টে সুদ জমা হচ্ছে আর সে এটা গ্রহন করছে। একদা তার এক বন্ধু বললঃ তুই হারামে জড়িয়ে পরেছিছ, এ থেকে বেরিয়ে আয়। লোকটি তখন ঠাট্টা করে বললঃ মৌলুভী হলে কবে রে? আর আজকাল এমন ঠাট্টা মশকারা কিন্তু সাভাবিক নিয়মে পরিনত হয়েছে।

পর্যালোচনাঃ সুদ আসলে কুফুর নয় বরং হারামকাজ এবং কবীরাহ গোনাহ আর এটাই আল্লাহর বিধান। তবে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর দ্বীন বা দ্বীনি কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা অবশ্যই কুফর। (এ সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৬৫-৬৬) আর আজকাল এমন কুফর করে চির জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের কত মানুষ।

৩- মিরাছঃ মিরাছের সমবন্টন উত্তরাধিকারীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার। মিরাছ বন্টনে ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখা আল্লাহর বিধান। এ বিধান মেনে নেওয়া ও মেনে চলা ফরজ, মেনে না নেওয়া কুফর আর মেনে না চলা মহাপাপ।

এখন মনে করেন আতিক সাহেব মারা গিয়েছেন একমাস গত হয়েছে। তিনি অনেক ধন সম্পদ রেখে গেছেন। উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে গেছেন এক স্ত্রী, এক ছেলে আর দুই মেয়ে। মেয়েরা বিবাহিতা। তাদের নিজেদের ঘর-সংসার আছে।
ছেলে যাচ্ছে বাপের পুরা সম্পদ একা ভোগ করতে। এ ব্যাপারে সে মাকেও হাত করে নিয়েছে। একদা মেয়েরা সম্পত্তির কথা উঠালে মা বললঃ "এমন কথাই মুখে আনবি না, এমন করলে ভাইয়ের সাথে তোদের সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে এবং এতে করে তোদের বাপের রুহ কষ্ট পাবে। অংশ নেওয়া খুবই নিন্দনীয় কাজ, যে নেয় অংশ তার থাকে না বংশ" ইত্যাদি আরো অনেক কথা।
অর্থাত ছেলের অন্যায় কাজের পক্ষ নিয়ে মা আল্লাহর বিধানের বিপরিতে নতুন বিধান বানিয়ে নিল। যা কুফর বৈ কিছুই নয়। আর এমন কুফর করে ঈমানহারা হয়ে জাহান্নামের দিকে ধাবিত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ।

৪- ঝগড়া থামানোর নামে কুফরঃ বিবাদ মিমাংসা করা বা ঝগড়া থামানো ভালো কাজ। আর যে কোনো বাহানায় কোনো প্রকার কুফর ও কুফরীকাজকে সমর্থন করলে কুফর হয়ে যায়। আর আজকাল ঝগড়া থামানোর নামে এমন কুফর করা অনেকের স্বভাবে পরিনত হয়ে গেছে।
যেমন ধরুনঃ এক বাপের দুই ছেলে। বাবা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে সফতা পাবার আশায় বড় ছেলেকে স্কুলে দিয়েছেন আর ছোট ছেলেকে দিয়েছেন মাদরাসায়। বড় ছেলে এখন কলেজে পড়ছে তাই সে শহরে থাকে। ছোট ছেলেও উচ্চ শিক্ষার জন্য শহরে বড় মাদরাসায় গিয়েছে। এখন রামাদ্বান মাস। স্কুল ও মাদরাসাহ দুটিই ছুটি। তাই উভয় ছেলেই বাড়ীতে আছে।
বড় ছেলে রোজা রাখে না, নামায পড়ে না, সে তার নাস্তিক বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে নাস্তিক্যবাদের চর্চা করছে। সে মনে করে ধর্মই সকল অথর্বের মূল।
বড় ভাইয়ের এমন কান্ড ছোট ভাইয়ের আর সহ্য হল না। একরাতে খাবার টেবিলে ছোটভাই বড়ভাইকে বুঝানোর চেষ্টা করল। সে তাকে আল্লাহর আযাব ও জাহান্নামের ভয় দেখালো। এতে রাগে ফুসে উঠল বড়ভাই। সে নাস্তিকের মত মাথা গরম করে আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে বে-আদবী মূলক অনেক কথা বলতে শুরু করে দিল। এতে জ্বলে উঠল ছোটভাইও। শুরু হল তুমুল বাক-বিতন্ডা ও ঝগড়া।
বাবা-মা সামাজিকভাবে স্বীকৃত ধার্মিক মানুষ। উনারা নিয়মিত নামায পড়েন, রোজা রাখেন, যাকাত আদায় করেন, হজ্জও করে এসেছেন দুই বছর আগে।
বড় ছেলের এমন আচরনে খুশী নয় তারাও। কিন্তু কী আর করবেন, ছেলেকেতো আর ফেলে দিতে পারবেন না? তাই চুপ করে থাকেন। আজ দুই ছেলের এমন ঝগড়া দেখে বাবাও খুব গুস্বা হলেন। আল্লাহ, রাসূল ও ইসলাম সম্পর্কে এমন কঠুক্তি করার কারনে বোড় ছেলেকে তিনি খুব ধমকালেন। তারপর ছোট ছেলেকে বললেনঃ "নামায-রোজা মানুষের ঐচ্ছিক ব্যাপার, যার ইচ্ছা পাল্লন করবে আর যার ইচ্ছা করবে না। এতে তোর কী? ঝগড়া থামানোর নামে এমন উক্তি করে বাবাও ঈমানহারা হয়ে গেলেন।
পর্যালোচনাঃ প্রতিটি ফরজ বিষয় মেনে নেওয়া ও মেনে চলা অত্যাবশ্যকীয়। কোনো ফরজকে নীতিগতভাবে মেনে না নিলে মানুষ ঈমানহারা মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায় আর নীতিগতভাবে মেনে নেওয়ার পর কোনো ফরজ মেনে না চললে মানুষ ফাসিক হয়ে যায় এবং তখন তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যায়। কোনো ফরজকে অবহেলা করলে বা ঐচ্ছিক মনে করলেও কুফর হয়। আর আজকাল এমন কুফর করে ঈমান শূন্য মুনাফিক হয়ে জাহান্নামের দিকে ধাবিত হচ্ছে আমাদের কত মানুষ।

৫- লিভ টুগেদারঃ নারী পুরুষের শারীরিক সম্পর্ক বা যৌন সম্পর্ক প্রাণীকুলের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। মানুষ,পশু-পাখিসহ প্রায় সকল প্রানীই এ প্রক্রিয়ার আওতাধীন। এ প্রাক্রিয়ায়ই প্রাণীকুলের বংশ বিস্তার ঘটে আর মানুষ তৈরি করে পরিবার ও সমাজ, শিয়ার করে তাদের মনের অনুভুতি আর শরীরের আকুতী। কিন্তু এর জন্য একটি বৈধ পন্থা ও সামাজিক সীমারেখা নির্ধারন করে দিয়েছে ইসলাম। শারীয়া'হ নির্ধারিত এ সীমারেখা অতিক্রম করা মহাপাপ আর নীতিগতভাবে এ সীমারেখাকে অমান্য, অবজ্ঞা বা অবহেলা করা কুফর।

এখন মনে করেনঃ কলেজ পড়ুয়া এক ছেলে অসত বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে এমন অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়েছে। সে বয়ফেন্ড-গার্লফ্রেন্ড নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে লিভ টুগেদারের পদ্ধতি মেনে নিয়ে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে। গ্রামের ও মহল্লার মানুষ ছেলের এমন কান্ডকে স্বভাবিক ভাবে নিচ্ছে না। তারা বিষয়টি নিয়ে কানাঘোষা করছে এবং নানা জনে নানা কথা বলছে।
লোকমুখে এমন কথা শোনে রেগে গেলেন ছেলের মা। তিনি বললেনঃ "দেখা আছে কার ছেলে মেয়েরা কেমন? কার ছেলে ধোয়া তুলসিপাতা আর কার মেয়ে ফিরিস্তা তা আমাদের জানা আছে। বয়সের সময় এমন একটু আধটু হতেই পারে। আমার ছেলেকে আমি খুব চিনি। সময় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে"। অর্থাত ছেলের এমন হারামকাজকে বয়সের দোষ বলে সমর্থন ও বৈধতা দিয়ে ঈমানহারা হলেন মা।
পর্যালোচনাঃ লিভ টুগেদার বা অবৈধ যৌনাচার কুফর নয় বরং পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট হারাম, মহাপাপ বা কবীরাহ গোনাহ। আর যে কোনো বাহানায় এমন কোনো বিষয়কে বৈধতা দেওয়া অবশ্যই কুফর হবে। আর আজকাল এমন কুফরে জড়িয়ে ঈমানহারা হয়ে চির জাহান্নামের দিকে ছোটে যাচ্ছে কত মানুষ।

৬- নেতার কুফরঃ রাজনীতি একটি ভালো জিনিষ। রাজনীতি মূল লক্ষ্যঃ দেশের সেবা করা এবং সমাজে ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফ কায়েম করা। রাজনীতি মূল উদ্দেশ্যঃ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর রাজ অথা মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কায়েম করা। কিন্তু রাজনীতি যখন উল্টা পথে চলবে, যখন রাজনীতির মূল লক্ষ্য হবে দেশের সম্পদ লুটে খাওয়া তখন এ রাজনীতি পাপ হিসেবে গন্য হবে, যখন রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ ছাড়া অন্যের সার্বভৌমত্ব কায়েম করা তখন এ রাজনীতি কুফর হয়ে যাবে।
যেমন ধরুনঃ আজ বাদ বাজারের পাশের কলেজ মাঠে বিশাল গণ-সমাবেশ। এতে বক্তব্য রাখবেন বিশেষ দলের বিরাট বড় নেতা। নেতাজী দুপুরের আগেই চলে এসেছেন এবং বাজার মসজিদে জোহরের নামায আদায় করে সোজা চলে গেছেন বক্তব্য দিতে। শুরুতে সালাম ও বিসমিল্লাহ না বলেই নেতাজী দলীয় প্রথামত বক্তব্য শুরু করলেন। তারপর আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও রাসূলের আদর্শের বিপরীতে গিয়ে জনগণের সার্বভৌমত্ব আর অমুক নেতার আদর্শ বাস্তবায়নে বুকের রক্ত ঢেলে দেওয়ার ঘোষনা দিলেন এবং ইসলামের নাম না নিয়ে মৌলবাদ ও মোল্লাতন্ত্রের মূলোতপাঠনে যুদ্ধ ঘোষনা করে মূলত ইসলাম ও ইসলাম পন্থী মুসলিমদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষনা করে ঈমানহারা মুনাফিক হয়ে জাহান্নামের পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলেন।

পর্যালোচনাঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া /রাসূল সা.র আদর্শের বিপরীতে অবস্থান নেওয়া /যারা আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে চায় তাদের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া কুফর। আর আজকাল এমন কুফর করে ঈমানহারা মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামের পথে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের কত মানুষ।

৭- ধর্মহীন রাজনীতিঃ ইসলাম মহান আল্লাহর প্রেরিত একমাত্র দ্বীন তথা একমাত্র জীবন আদর্শ। ইসলাম সর্বকালীন, সার্বজনীন। মানুষ তার বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে ইসলামী আদর্শ মেনে নেবে এবং ইসলামী বিধান মেনে চলবে, এটাই ইসলামের মূলকথা আর এটাকেই বলে ইসলাম গ্রহন।

এখন মনে করুনঃ আজ আমজাদ সাহেবের বাড়িতে পারিবারিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অনেক আত্মীয়স্বজন জড় হয়েছেন। খাওয়াদাওয়া হচ্ছে গল্পগোজব হচ্ছে। মানুষের স্বভাবজাত অভ্যাস মত নানা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে।
এক পর্যায়ে উঠল রাজনীতির কথা আর প্রসঙ্গত এসেগেলো ইসলামের কথাও। ইসলাম ও ইসলামী রাজনীতির পক্ষেবিপক্ষে নানান কথার পর একজন বলে উঠল "ধর্ম মানুষের একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনা মোতেই উচিত নয়"। আরেকজন বললঃ "না ভাই! আপনি ভুল বলেছেন। কোনো মুসলিম এমন কথা বলতে পারে না। এক সময় আমিও তাই মনে করতাম। এখন কুরআন হাদীছ অধ্যয়ন করে বুঝতে পেরেছিঃ মুসলিম হতে হলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে ইসলামী বিধিবিধান মেনে চলতে হবে"।
পর্যালোচনাঃ ইসলাম আসলে গতানুগতিক কোনো ধর্ম নয়। ইসলাম সর্বকালীন, সার্বজনীন। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে ইসলামী বিধিবিধান মেনে নেবে এবং মেনে চলবে কেবল সে-ই মুসলিম হতে পারবে।
বাস্তব জীবনের কোনো ক্ষেত্রে বা কোনো বিষয়ে ইসলামের বিপরিতে অন্য কিছু মেনে নেওয়া কুফর ও মেনে চলা মহাপাপ। আর যে মুসলিম কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পরবে সে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে।

৮- ৪ বিয়েঃ একজন পুরুষ একসাথে ৪জন স্ত্রী রাখতে পারবে, এটা তার ন্যায্য অধিকার। তাকে এ অধিকার দিয়েছেন মহান আল্লাহ তায়া'লা। একাধিক বিয়ে করা এবং একসাথে ৪জন স্ত্রী রাখা দোষের নয় বা মন্দকাজ নয়। বরং পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ননা মতে এটা আল্লাহর বিধান মতে বৈধকাজ। মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..
..তোমরা তোমাদের পছন্দমত দুইদুই জন, তিনতিন জন ও চারচার জন করে নারীদেরকে বিয়ে করবে। (নিসাঃ ৩)

আপনি যদি মুঅমিন হতে চান এবং মুঅমিন হিসেবে জীবন কাটাতে চান তবে অবশ্যই আল্লাহর দেওয়া যাবতীয় বিধিবিধান আনন্দ চিত্তে মেনে নিতে হবে এবং মেনে চলতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে..
না, তোমার রবের কসম! তারা মুঅমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের যাবতীয় বিষয় মিমাংসার জন্য তোমার (শারীয়াহ আইনের) কাছে আসবে, তোমার দেওয়া সিদ্ধান্ত বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে আর সম্পূর্নরূপে আত্মসমর্পণ করবে। (নিসাঃ ৬৫)
এখন ধরুনঃ একব্যক্তি ৩টি বিয়ে করেছে। আর এ তিন বিয়ের কারনে অনেকেই তাকে হাসি-কৌতুক ও রঙ্গ-তামাশার পাত্র বানিয়েছে, যা আজকাল আমাদের সমাজের সাধারন বিষয়ে পরিনত হয়েছে।
পর্যালোচনাঃ আসলে আল্লাহর দেওয়া কোনো বিধান নিয়ে হাসি-কৌতুক বা রঙ্গ-তামাশা কুফর। আর এভাবে কুফর করে ঈমানহারা মুনাফিক হয়ে জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের কত মানুষ।

৫ম সেমিষ্টার ১৪তম দিন

ন্যায়, সাম্য, ইনসাফ ও অধিকার

ন্যায়, সাম্য, ইনসাফ ও অধিকার আমাদের দ্বীন ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই এসব বিষয় সম্পর্কে জানা ও বুঝা এবং এসব বিষয় সমাজে কায়েম করা এবং বজায় রাখা আর সবাইকে তাদের ন্যায় সঙ্গত অধিকার দেওয়া আমাদের ফরজ দায়িত্ব। আর এ দায়িত্বের কথা বিবেচনা করেই আমাদের এ আয়োজন। বিষয়গুলোকে আমরা এটি পাঠে বিন্যস্ত করেছি।

১ম পাঠঃ ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফ কায়েম করা ও বজায় রাখাঃ এ ব্যাপারে আদেশ ও বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)

নিশ্চয় আল্লাহ আদেশ দিচ্ছেন আ'দল (ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ) ইহসান (নিজের ঈমান, ইসলাম, ইবাদাত, স্বভাবচরিত্র ও কথাবার্তা সুন্দর করার) এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার। আর তিনি নিষেধ করছেন অশ্লীলতা, অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন থেকে। তিনি আদেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা এসব মেনে চল। (১৬ নাহ'লঃ ৯০। এ আয়াতে ইসলামী সমাজনীতির মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে।)

ইসলামী সমাজের মূলনীতিঃ

- ইসলামী সমাজনীতির মূলভিত্তি হল আদল ও ইহসান। বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আ'দল তথা ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখা এবং সমাজে আদল প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর আদেশ এবং আল্লাহর এ আদেশের বাস্তব বায়ন প্রতিটি মুসলিমের ফরজ দায়িত্ব। মুঅমিন হতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই এ দায়িত্ব পালন করতে হবে, এতে অবজ্ঞা বা অবহেলা করে কেউ মুঅমিন হতে পারবে না।
- ইহসান অর্থ সুন্দর করা। নিজের ঈমান, ইসলাম, ইবাদাত, স্বভাবচরিত্র ও কথাবার্তা সুন্দর করার নাম ইহসান। ইহসান মুঅমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইহসানের পরিচয় দেয়া মুঅমিনের অন্যতম গুণ।
- আত্মীয়স্বজনকে তাদের অধিকার দিতে হবে। এটা হল সমাজ, পরিবার ও আত্মীয়তা রক্ষার মূল কথা।
- সকল প্রকার অশ্লীলতা, অন্যায় ও পাপাচার থেকে বিরত থাকতে হবে। নতুবা সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে।

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29)

(হে নবী! সবাইকে) বলে দাওঃ আমার প্রভু আদেশ দিচ্ছেন ন্যায় ও সাম্যের। আর তোমরা প্রত্যেক সালাতে নিজেদের মুখ (কিবলার দিকে) স্থির রাখবে। আর আল্লাহর ইবাদাত করবে ভেজালমুক্ত দ্বীন মেনে, শুধু-ই তাঁর জন্য। তিনি তোমাদেরকে যে ভাবে প্রথম সৃষ্টি করেছেন সে ভাবে-ই তোমরা পুনরায় উত্থিত হবে। (৭ সূরাহ আ'রাফঃ ২৯)

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ আদেশ দিচ্ছেন ন্যায় ও সাম্যের। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখা আমাদের ফরজ দায়িত্ব। এটা আমাদের ঈমানের দাবী এবং আল্লাহর ইবাদাতের অংশ। আল্লাহর ইবাদাত করতে হয় সঠিক দ্বীন মেনে, ইখলাস্বের সহিত ভেজালমুক্ত থেকে, শুধু-ই আল্লাহর জন্য। ভেজালযুক্ত কাজ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

উল্লেখ্য নিজের ঈমান, আ'মাল ও নিয়্যাতকে খাঁটি তথা ভেজালমুক্ত রাখার নাম ইখলাস্ব আর জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে তথা সঠিকভাবে ঈমান গ্রহণ করে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে মহান আল্লাহর প্রদত্ব বিধিবিধান মেনে নেওয়া ও মেনে চলার নাম আল্লাহর ইবাদাত করা।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)

(হে মুসলিম জাতি!) আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেনঃ তোমরা প্রতিটি আমানত তার প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেবে, (তথা সবাইকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেবে) আর মানুষের মাঝে যখন বিচার ও শাসন করবে তখন অবশ্যই আ'দল (ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফ) করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে খুবই কল্যাণকর আদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ হলেন সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (৪ নিসাঃ ৫৮)

জ্ঞাতব্যঃ এ আয়াতের মর্ম অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। শারীয়া'হর প্রায় সবকিছুই এর আওতায় এসে যায়। তাই মুফাসসীরগণ এ আয়াতকে "উম্মুহাতু-ল-আহকাম" (বিধানের জননী বা আইন ও বিধানের মূলনীতি) বলে অভিহিত করেছেন। (কুরতুবী)

আইন ও বিধানঃ আ'দল করা তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ করা আমাদের ফরজ দায়িত্ব।

সাম্য ও ইনসাফের কিছু উপমাঃ মহান আল্লাহ আমাদেরকে ন্যায় সাম্য ও ইনসাফের আদেশ দিয়েছেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করা এবং বজায় রাখা আমাদের ফরজ দায়িত্ব।

বাবা-মা তার সন্তানদের মাঝে, ভাই ও বোন তার ভাইবোনদের মাঝে, স্বামী তার স্ত্রীদের মাঝে, নেতা জনতার মাঝে, ইমাম সাহেব তার মুসল্লিদের মাঝে, শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের মাঝে, বিচারক ও আইনজীবিগণ বাদি-বিবাদির মাঝে তথা সমাজের সকল স্ত্রে এবং সকলের মাঝে ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখতে হবে। অন্যতায় জুলম হবে, পাপ হবে এবং বিচার দিনে এজন্য মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

সন্তানদের মাঝে ইনসাফঃ আপন সন্তানদের মাঝেও ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখতে হয়। অন্যতায় জুলম হয়, পাপ হয়। কিন্তু আমাদের সমাজের অনেকেই বিষয়টি বুঝেন না। অনেক বাবা-মাকে দেখা যায় এক সন্তানকে অন্য সন্তানের উপর প্রাধান্য দিচ্ছেন এবং একজনকে অতি গুরুত্ব দিয়ে অন্যদের উপর অবিচার করছেন। যেমন..

- অনেক মা খাবারের বেলায় ছেলেদেরকে অতি গুরুত্ব দিয়ে মেয়েদেরকে অহবেলা করে থাকেন। অথবা একজনকে অতি গুরুত্ব দিয়ে অন্যজনকে অবহেলা করে থাকেন।
- অনেক বাবা আবার মেয়েদেরকে দামী দামী পোশাক কিনে দিয়ে ছেলেদেরকে অবহেলা করে থাকেন।
- অনেক বাবা-মা এক সন্তানকে অধিক সম্পদ দিয়ে অন্যদের উপর অবিচার করেন। অথচ হাদীছে উল্লেখ আছে..

لحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير أن أباه أعطاه غلاما فقالت أمه :لا أرضى حتى يشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فذهب بشير بن سعد إلى النبي ﷺوأخبره بما فعل فقال :أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان فقال :لا، فقال الرسول :اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

নু'মান বিন বাশীর রা.র বাবা একদা নু'মানকে একটি দাস দান করলেন। কিন্তু নু'মান রা.র মা (তার স্বামীর এ কাজটিকে ভাল চুখে দেখলেন না। তিনি) বললেনঃ রাসূল সা. সত্যায়ন করার আগ পর্যন্ত আমি বিষয়টি মেনে নিতে পারব না। (নু'মান রা.র বাবা) বাশীর বিন সাঈদ রা. তখন রাসূল সা.র কাছে গেলেন এবং সব খুলে বললেন। রাসূল সা. জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি নু'মানকে যা দিয়েছ তোমার অন্য সন্তানদেরকেও কী তা দিয়েছ? তিনি বললেনঃ না..। তখন রাসূল সা. বললেনঃ (হে মানুষ!) আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর এবং নিজ নিজ সন্তানদের মাঝে আ'দল (ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ) বজায় রাখো! (বুখারী ও মুসলিম)

স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফঃ একাধিক বিয়ে করলে স্ত্রীদের মাঝেও ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখতে হয়। স্ত্রীদের থাকার ঘর, খাবারের মান, পোশাকের মান, প্রসাধনী, তথা জীবনমান নির্ধারণের ক্ষেত্রে ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখতে হবে। যে ব্যক্তি এমন করতে পারবে না তাকে এক স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বলা হয়েছে। (দেখুন সূরাহ নিসাঃ ৩)

এভাবে নেতা তার জনতার মাঝে ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ বজায় রাখবে এবং আইনের চুখে সবাইকে সমান করে দেখতে হবে। অন্যতায় জুলম (অন্যায়, অবিচার, অধিকারহরণ) হবে। আর জুলম সর্বদা-ই নিন্দনীয় ও ঘৃনিত পাপ। ইরশাদ হচ্ছে..

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (42)

(তখন বলা হবে) আজ তোমাদের কেউ কারো কোনো উপকার করতে পারবে না, ক্ষতিও করতে পারবে না। (দুনিয়ার জীবনে) যারা জুলম (শিরক, পাপাচার, অধিকার হরণ) করবে (আখেরাতে) আমরা তাদেরকে বলবঃ জাহান্নামের আযাব আস্বাদন কর যা তোমরা অস্বীকার করতে। (৩৪ সাবাঃ ৪২)

২য় পাঠঃ ন্যায় বিচারের স্বার্থে সঠিকভাবে সাক্ষ্য দেওয়া

আমাদের উপর অন্যতম আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হল ন্যায় বিচারের স্বার্থে সঠিকভাবে সাক্ষ্য দেওয়া। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)

ওহে যারা ঈমান এনেছো (শোনো!) তোমরা ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফের জন্য উঠে দাঁড়াও এবং নিজের বিরুদ্ধে, বাবা-মার বিরুদ্ধে, আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও আল্লাহর (ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার) জন্য সঠিক সাক্ষ্য দাও। (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে) সে ধনী হোক বা গরীব, (মনে রেখবে) আল্লাহর অধিকার এদের চেয়েও বেশী। তাই (ধনীর ভয়ে বা ধনের লোভে, অথবা গরীবের প্রতি করুণা বশত মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।) আর তোমরা "হাওয়া"র অনুকরণ করবে না। বরং সদা ন্যায় বিচার করবে। তোমরা যদি (বিচার বা সাক্ষ্য) পালটে দেও অথবা (ন্যায় ও সাম্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেও তবে (মনে রেখো) আল্লাহ তোমাদের সকল কাজের খবর রাখেন। (তাই এর উপযুক্ত ফল তোমরা অবশ্যই পাবে) (৪ নিসাঃ ১৩৫)

হাওয়া পরিচিতিঃ হাওয়া অর্থ প্রবৃত্তি, মনগড়া, মানব রচিত। আল্লাহর আইন বিধান ও রীতিনীতির বাইরে যা আছে সবই মনগড়া ও মানবরচিত তাই এসবকে হাওয়া বলা হয়। মানুষ নানা ভাবে হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে। যেমন..

- অনেক মানুষ আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানবরচিত কোনো আইন, বিধান, মতবাদ, দর্শন বা আদর্শ মেনে নেয় এবং মেনে চলে। এসব-ই হাওয়ার অনুকরণ।
- অনেকে আবার আল্লাহর বিধানের বিপরীতে গিয়ে মনগড়া মসলক, মিনহজ বা তরিকার নামে উম্মতের মাঝে বিভক্তি ও বিভাজন তৈরি করে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ।
- অনেকে আবার বাস্তব জীবনে আল্লাহর দেওয়া রীতিনীতি ও আদর্শের তোয়াক্কা না করে মনে যা চায় তাই করে। এগুলোও হাওয়ার অনুকরণ। এভাবে অনেকে অনেকভাবে নিজের বা অন্যের হাওয়ার অনুকরণ করে থাকে।

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)

..তোমরা সাক্ষী প্রতিষ্ঠিত করবে আল্লাহর জন্য (সাক্ষী হল বিচারের মূল। সাক্ষি ভুল হলে বিচার ভুল হবার সম্ভাবনাই বেশী। তাই ন্যায় বিচারের স্বার্থে আল্লাহর বিধান পালনের জন্য সাক্ষ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে বলা হয়েছে।) তোমাদের যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে তাকে এমন আদেশ দেয়া হচ্ছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করে আল্লাহ তার জন্য পথ খুলে দেন। (৬৫ তালাক্বঃ ২)

৩য় পাঠঃ সবাইকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেওয়া

আমাদের উপর অর্পিত ফরজ দায়িত্বসমূহের মাঝে অন্যতম আরো একটি হল সবাইকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেওয়া।

অধিকার পরিচিতিঃ অধিকার বাংলা শব্দ। অধিকারের আরবী প্রতি শব্দ "হাক্ব, বহুবচনে হুক্বুক্ব"। উর্দু ফার্সিতে বলা হয় "হক, বহুবচনে হুকুক"। আর ইংরেজীতে বলা হয় "রাইট, বহুবচনে রাইটস"।

মৌলিক অধিকারঃ স্রষ্টা এবং সৃষ্টি সকলেরই কিছু মৌলিক অধিকার রয়েছে। এ অধিকার আল্লাহ প্রদত্ব, স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত। আমাদের উপর অর্পিত ফরজ দায়িত্ব হল সবাইকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেওয়া। কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা যে কাউকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অবিচার ও অন্যায়, এতে পাপ হয়।

মানুষের মৌলিক অধিকারঃ প্রতিটি মানুষের জন্মগত কিছু অধিকার রয়েছে। মানুষের অধিকার রয়েছে অন্য মানুষের উপর, সরকারের উপর, সমাজের উপর। এমনকি মহান আল্লাহ সদয় হয়ে স্বয়ং আল্লাহর উপরও মানুষকে কিছু অধিকার দিয়েছেন। এসবই মানুষের মৌলিক অধিকার।

প্রতিটি মানুষের উপরই সরকার বা সমাজের কিছু অধিকার রয়েছে। অধিকার রয়েছে কুরআনের, রাসূলের এবং আল্লাহ তায়া'লার। এসকল অধিকার আল্লাহ প্রদত্ব। মহান আল্লাহ যাকে যে অধিকার দিয়েছেন এটা-ই তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার। ন্যায়সঙ্গত অধিকার সকলের প্রাপ্য। সবাইকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিতে হবে। এটা-ই ইসলামের বিধান, এটাই আল্লাহর আদেশ আর এটাই নবীর তরীকা।

অধিকার বঞ্চিত করাঃ কাউকে তার অধিকার বঞ্চিত করা অন্যায় ও জুলম তথা মহাপাপ। জুলমের পরিণতি ভয়াবহ। একটি জুলম হাজারো পাপের জন্ম দেয়। একটি সমাজ ও জাতি ধ্বংসের জন্য জুলম-ই যথেষ্ট। আল্লাহ জুলুম সহ্য করেন না।

ইসলাম ও অধিকারঃ ইসলাম সবাইকে সকলের অধিকার দিতে আদেশ দিয়েছে। এবং জুলুম ও জুলুমের পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করেছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26)

আত্মীয়স্বজনকে তাদের অধিকার দাও। অধিকার দাও অসহায়, পথিক (সবাইকে) এবং এতে সামান্যতম হেরফের করো না। (১৭ ইসরাঃ ২৬)

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আবু-জুহা'ইফাহ ওয়াহাব বিন আব্দুল্লাহ রাঃ বলেনঃ রাসূল সাঃ (মদিনাতে আসার পর মুসলমানদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন। সেই সুবাদে) সালমান ফারসী ও আবু-দারদাকে ভাই বানিয়ে ছিলেন। একদা সালমান আবু-দারদার সাক্ষাতে এসে আবু-দারদার স্ত্রীকে জীর্ন পোষাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনার এ অবস্থা কেন? আবু-দারদার স্ত্রী বললেনঃ তোমার ভাই আবু-দারদা দুনিয়া বিমুখ। (সে তেমন রোজী রোজগার করে না।) আবু-দারদা (বাইরে ছিলেন) ঘরে এসে (ভাইকে দেখে খুশী হলেন এবং) ভাইয়ের জন্য খাবার তৈরি করে বললেনঃ আপনি খান, আমি আজ রোজা রেখেছি।

সালমান বললেনঃ তুমি না খেলে আমি খাব না। আবু-দারদা (নফল রোজা ভেঙ্গে ভাইয়ের সাথে) খাবার খেলেন। রাতে আবু-দারদা (তাহাজ্জুদ) নামাযে দাড়াতে গেলেন।

সালমান বললেনঃ "ঘুমিয়ে পড়ো"।

আবু-দারদা (বড় ভাইয়ের কথা মেনে) ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার দাড়াতে চাইলেন।

সালমান বললেনঃ "ঘুমিয়ে পড়ো"। রাতের শেষ প্রহরে সালমান বললেনঃ এবার উঠো! দুই ভাই একসাথে (তাহাজ্জুদ) আদায় করলেন। সালাত শেষে সালমান বললেনঃ তোমার উপর অবশ্যই আল্লাহর অধিকার আছে। অধিকার আছে তোমার শরীরের, অধিকার আছে তোমার পরিবারের। সুতরাং "সবাইকে নিজ নিজ অধিকার দাও"।

আবু-দারদা রাসূল সাঃর কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূল সাঃ বললেনঃ সালমান ঠিক বলেছে। (বুখারীঃ রোজা অধ্যায়)

অধিকার না দেওয়ার পরিণতিঃ কাউকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার না দেওয়া জুলম। জুলমের পরিণতি ভয়াবহ। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (42)

(সরকার, সমাজ ও আদালত) শুধু তাদের বিরুদ্ধে-ই (আইনগত) ব্যবস্থা নিবে যারা মানুষের উপর জুলম (মানুষের অধিকার হরণ) করে, অন্যায় ভাবে (ইসলামী সরকার ও সমাজের বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ করে। (যারা এমন করে) তাদের তরে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৪২ শূরাঃ ৪২)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (168)

যারা কুফর করে, জুলম (শিরক, পাপাচার, অধিকার হরণ) করে, আল্লাহ কখনো তাদের ক্ষমা করেন না, পরিচালিত করেন না সঠিক পথে। (৪ নিসাঃ ১৬৮)

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13)

ইতোপূর্বে অনেক জাতিকে আমরা ধ্বংস করেছি, যখন তারা জুলমে (শিরকে, পাপাচারে, অধিকার হরণে) লিপ্ত হয়েছে। রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তাদের কাছে এসেছিল। কিন্তু তারা ঈমান আনেনি (ফলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি।) পাপিষ্ঠদের প্রতিদান আমরা এভাবে-ই দিয়ে থাকি। (১০ ইউনুসঃ ১৩)

সুতরাং আসুন! আমরা সকলের অধিকার সম্বন্ধে জানি। সবাইকে তার প্রাপ্য অধিকার দেই। জুলম থেকে বাঁচি। মহান আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে রক্ষা করি। হে আল্লাহ! আমাদের সহায় হও। আমাদের সাহায্য কর। আমীন।

অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৫ম বই "অধিকার" দেখে নিন।

৫ম সেমিষ্টার ১৫ তম দিন

বিবাহ ও তালাক

বিবাহ ও তালাক মানব সমাজের অতি গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়। এ বিষয়ে ইসলামী বিধান না জানার কারনে আমাদেরকে অনেক সময় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই এ বিষয়টিকেও আমরা আমাদের এ কোর্সে স্থান দিয়েছি এবং সহজভাবে বুঝার জন্য আমরা বিষয়টিকে দুটি পাঠে বিন্যস্ত করেছি।

১ম পাঠঃ বিবাহ

বিবাহ পরিচিতিঃ বিবাহ একটি সামাজিক ও ধর্মীয় বন্ধন।

বিবাহের উপকারিতাঃ একজন পুরুষ ও একজন নারী আল্লাহ প্রদত্ব বন্ধনের মাধ্যমে একে অপরের আপন হয়ে যায় এবং পরস্পর থেকে শারীরিক ও জৈবিক চাহিদা মিটানো ও পরস্পরের দেহ সম্ভোগ করা বৈধ হয়ে যায়। বিবাহের মাধ্যমে..

- আমাদের অন্তরে দায়িত্ববোধ তৈরি হয়
- প্রথমে আমরা একে অপরের প্রতি তারপর সন্তানের প্রতি এবং সর্বোপরি সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে উঠি
- বিবাহের মাধ্যমে আমরা সংসারী হই
- নিজে সংসারী হওয়ার কারনে আমরা আয়রোজগারের প্রতি মনোনিবেশ করি, সম্পদ উপার্জন ও সঞ্চয়ী হই
- বিবাহের মাধ্যমে আমরা বৈধ ভালোবাসায় জড়িয়ে যাই এবং জগতকে ভালোবাসতে শিখি
- আমাদের ভালোবাসার ফসল হিসেবে আসে সন্তান এবং তখনই আমরা মূলত অন্যের জন্য ত্যাগ করার বাস্তব শিক্ষা পাই, তখনই আমরা বাবা-মার কষ্ট ও আদরের বাস্তবতা অনুভব করতে শিখি। ইত্যাদি

বিবাহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ বিবাহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনেক। নিম্নে এর কয়েকটি তুলে ধরা হল..

- পরিবার গঠন করা
- আল্লাহ মানব অন্তরে যে প্রেমভালোবাসা দিয়েছেন এর সঠিক, সুন্দর ও বৈধ ব্যবহার নিশ্চিত করা
- বিবাহের মাধ্যমে নারী তার জীবন সঙ্গী আর পুরুষ তার জীবন সঙ্গীনি বেচে নেয়
- নিজের শারীরিক, জৈবিক ও যৌন চাহিদা মিটানোর বৈধ সঙ্গী/সঙ্গীনি বেচে নেওয়া
- বৈধ পন্থায় সন্তান জন্ম দিয়ে মানব জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। ইত্যাদি

বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কঃ বিবাহের মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে দুই ধরনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যথা..

- বিবাহের মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর থেকে দৈহিক সম্ভোগ বা শারীরিক ও যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ হয়ে যায়। তালাক বা কোনো একজনের মৃত্যুর মাধ্যমে যার সমাপ্তি ঘটে।
- শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করার পর স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের অঙ্গে পরিনত হয়ে যায়। ফিক্বহের পরিভাষায় একে বলা হয় "জুযিয়্যাত ও বা'দ্বিয়্যাত"। মৃত্যুও এ সম্পর্ককে নষ্ট করতে পারে না। এক হাদীছে বলা হয়েছে "কিয়ামতের দিন স্ত্রী তার স্বামীর হাত ধরে উঠবে"। (হাদীছটি বর্ননা করেছেন ত্বাবারানী আর শাইখ আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন) আর তাইতো স্বামী মারা যাওয়ার পরও বলা যায় "অমুকের স্ত্রী" আর স্ত্রী মারা যাওয়ার পরও বলা যায় "অমুকের স্বামী"।

বিবাহের পাত্র-পাত্রীঃ মানুষ তার বিপরিত লিঙ্গের সাথে বিবাহ করবে এবং বিপরিত লিঙ্গ থেকেই পাত্র বা পাত্রী ঠিক করবে। সমলিঙ্গের সাথে বিবাহ করা বৈধ নয়। এ কথা আমরা বুঝতে পেরেছি সূরাহ নিসার ৩য় আয়াত থেকে। তবে পাত্র ও পাত্রী বৈশিষ্ট হিসেবে দ্বীনকে প্রাধান্য দিতে আদেশ দিয়েছেন রাসূল সা.। এ কথা আমরা একটি হাদীছ থেকে জানতে পেরেছি।

বিবাহের মোহরঃ বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয় আর পরিবার পরিচালনার জন্য আর্থিক দায়ভার পুরুষকেনিতে হয়। আর এ দায়িত্ব শুরু হয় বিবের সূচনা থেকেই। বিয়ের সূচনাতে স্ত্রীকে মোহর আদায় করতে হয় এবং মোহর আদায় করা পুরুষের উপর ফরজ হয়ে যায়।

নগদ অর্থ, সোনা, রুপা, জায়গা, সম্পত্তি, ইত্যাদি যে কোনো ধরনের সম্পদই মোহর হিসেবে পরিশোধ করা যায়।

স্বামী-স্ত্রী মিলে যে পরিমান সম্পদ নির্ধারন করবে এটাই মোহর হিসেবে গন্য হবে। তবে হানাফী মতে মোহর কমপক্ষে ১০ দিরহাম (প্রায় ৩০ গ্রাম) রৌপ্য সমান হতে হবে।

মোহর একবার নির্ধারন করার পর স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে সম্মত হলে এতে পরিবর্তন আনতে পারবে। মোহর নগদ পরিশোধ করা উচিত এবং মোহর আদায়ের মাধ্যিমেই বিবায়ের কাজ শুরু করা উচিত।

মোহর পরিশোধ না করলে পাপ হবে এবং স্বামী তখন আত্মস্যাতের অপরাধে অপরাধী হবে।

বিবাহ সম্পাদনের নিয়মঃ বিবাহ সম্পন্ন করার বেশ কয়েকটি নিয়ম বা পদ্ধতি রয়েছে। এসবের যে কোনো একটি পালন করে বিবাহ সম্পন্ন করা যায়। যেমন..

- পুরুষ বা নারী যে কোনো একজন বিবাহের প্রস্তাব করবে আর অন্যজন গ্রহন করবে। যেমন দুইজন মানুষকে সাক্ষ্যি রেখে একজন বলবে "আমি তোমাকে বিয়ে করিলাম" এর প্রতি উত্তরে অন্যজন বলবে "আমি গ্রহন করিলাম"। বস বিয়ে হয়ে গেছে।
- পুরুষ বা নারীর পক্ষ থেকে তাদের অভিভাবক ও বিয়ের কাজ সম্পাদন করতে পারবেন। যেমনঃ পাত্র বা পাত্রীর অভিভাবক বলবে "আমি আমার মেয়েকে /ছেলেকে তোমার কাছে বিয়ে দিলাম" এর প্রতি উত্তরে পাত্র অথবা পাত্রী অথবা তাদের অভিভাবক বলবে "আমি গ্রহন করলাম"। বস বিবাহ হয়ে গেছে।
- অন্যান্য লেনদেনের মত বিবাহের জন্য উকিলও নিয়োগ করা যায়। আপ্নার উকিল আপ্নার পক্ষ থেকে প্রস্তাবও করতে পারবে আবার গ্রহনও করতে পারবে।
- আপনার অভিভাবক বা উকিল আপনার অজান্তেও আপনার বিয়ের কাজ সম্পাদন করতে পারবে। তবে আপনার সম্মতি দেওয়ার পরই কেবল এ বিয়ে কার্যকর হবে। আপনি সম্মতি না দিলে বাতিল হয়ে যাবে।

বিবাহের সাক্ষ্যি ও ঘোষনাঃ বিবাহের জন্য দুটি সাক্ষ্যির প্রয়োজন হয়। দুইজন মুসলিম পুরুষ দুটি সাক্ষ্যি অথবা একজন মুসলিম পুরুষ আর দুইজন মুসলিম নারী সাক্ষ্যির দ্বারা একটি বিবাহ সম্পূর্ণ হতে পারে।

বিবাহে অভিভাবকঃ বাস্তব জীবনেযে বা যারা আপনার অভিভাবক বিবাহের সময়ও তারাই আপনার অভিভাবক। বিবাহের সময় নিজে উপস্থিত থাকলে বিবাহ সম্পাদনে অভিভাবকের কোনো করনীয় থাকে না।

বিবাহে উকিলঃ আপনার বিবাহ সম্পাদনের জন্য আপনি যাকে উকিল নিযুক্ত করবেন সেই আপনার উকিল হবে। বিবাহের অনুষ্ঠানে আপনি নিজে উপস্থিত থাকলে এবং নিজে প্রস্তাব করলে বা গ্রহন করলে উকিলের কোনো করনীয় থাকে না।

২য় পাঠঃ তালাক

তালাক পরিচিতিঃ তালাক অর্থ বিবাহ বিচ্ছেদ। এক তালাক মানে একবার বিবাহ বিচ্ছেদ আর দুই তালাক মানে দুইবার বিবাহ বিচ্ছেদ আর তিন তালাক মানে তিনবার বিবাহ বিচ্ছেদ।

বিবাহের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারী একে অপরের আপন হয়ে যায় এবং উভয়ে মিলে শুরু করে নতুন সংসার। শুরু হয় প্রেমময় জীবনের নতুন যাত্রা। কিন্তু মাঝে মাঝে সংগত কারণে-ই এ বিবাহ ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন হয়। বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য শারীয়া'হ আইন সম্মত যে বৈধ পদ্ধতি রেয়ছে এটা-ই তালাক নামে পরিচিত।

তালাক দেয়ার ধরণ ও পদ্ধতিঃ বিয়ের জন্য পুরুষ ও নারী উভয়ের সম্মতির প্রয়োজন হয়। পুরুষ বা নারী কোনো একজনের আপত্তি থাকলে বিয়ে শুদ্ধ হয় না। তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ কিন্তু এমন নয়। বিবাহ বিচ্ছেদ..

- স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতে হতে পারে;
- শুধু স্বামীর পক্ষ থেকে হতে পারে;
- শুধু স্ত্রীর পক্ষ থেকেও হতে পারে।

উভয়ের সম্মতিতে তালাকঃ উভয়ের সম্মতিতে তালাক হলে উত্তম পদ্ধতি হল এক তালাক দিয়ে ইতি টানা। ইসলামী শারীয়া'হ মতে এটা-ই তালাকের উত্তম পদ্ধতি এবং এতে বেশ কিছু সুবিধাও পাওয়া যায়। যে আলোচনা সামনে আসছে, ইন শা-আল্লাহ।

স্বামীর পক্ষ থেকে তালাকঃ শুধু পুরুষের পক্ষ থেকে তালাক হলে উত্তম পদ্ধতি হল এক তালাক দিয়ে সমাপ্ত করা। পুরুষ এক তালাক দিয়ে সমাপ্ত করবে এবং নারী তার ইদ্দত পর্যন্ত অপেক্ষা করে অন্যত্র বিয়ে হতে পারবে।

স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাকঃ আর নারী তার স্বামী থেকে তালাক প্রত্যাশী হলে নিম্নে বর্ণিত ৩টি পদ্ধতির যে কোনো একটি বেঁছে নিতে পারবে..

- বিয়ের সময় বা বিয়ের পরে নারী যদি তার স্বামী থেকে তালাকের ক্ষমতা নিয়ে থাকে তবে নারী নিজে-ই নিজেকে তালাক দিতে পারবে এবং তখনও উত্তম হল এক তালাক দিয়ে সমাপ্ত করা। আর এতালাকের নাম প্রদেয় ক্ষমতা বলে তালাক।
- নারী তার স্বামী থেকে তালাকের ক্ষমতা না নিলে তার স্বামীকে তালাকের জন্য অনুরোধ করতে পারবে অথবা কোনোকিছুর বিনিময়ে তালাকের চুক্তি করতে পারবে। বিনিময় দিয়ে তালাক নেয়ার পদ্ধতিকে খোলা বলা হয়। খোলা এক তালাক বাইনের সমান।
- নারী বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদালতে যেতে পারবে। আদালত তালাক দিতে পারে না তবে বিবাহ ভেঙ্গে ভিতে পারে। আদালতের মাধ্যমে বিবাহ ভঙ্গ করা এক তালাক বাইনের সমান।

তালাকের প্রকার ভেদঃ ইসলামী বিধানে তালাক দুই প্রকার হয়ে থাকে। যথাঃ রাজয়ী' তালাক ও বাইন তালাক।

ক. রাজয়ী' তালাকঃ বিবাহ ভঙ্গের জন্য দুই প্রকার তালাক রয়েছে। এরমধ্যে এক প্রকার তালাক হল রাজয়ী' তালাক তথা প্রত্যাবর্তনশীল তালাক। স্পষ্টভাবে শব্দ উচ্চারন করে তালাক দিলে রাজয়ী' তালাক হয়। যেমনঃ কেউ তার স্ত্রীকে বললঃ আমি তোমাকে তালাক দিলাম। এতে ১ তালাক রাজয়ী' হয়।

তালাক দেবার উত্তম পন্থা হল এক তালাক রাজয়ী' দিয়ে-ই বিষয়টির সমাপ্তি ঘটানো। এতে কিছু বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন..

- রাজয়ী' তালাকে তৎক্ষণাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না।
- রাজয়ী' তালাক ১ম বার বা ২য় বার দেয়ার পরও স্বামীর হাতে ক্ষমতা থাকে।
- রাজয়ী' তালাক দেবার পর স্বামী চাইলে স্ত্রীর ইদ্দতের ভিতর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে।
- তবে ইদ্দত পার হয়ে গেলে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না। (ইদ্দত সম্পর্কে জানতে ইদ্দত পাঠ দেখে নিন)
- ইদ্দত পার হয়ে যাবার পর রাজয়ী' তালাক বাইন তালাকে রূপান্তরিত হয় এবং বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।
- বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একে অপরের জন্য অন্য দশজন নারী পুরুষের মত হয়ে যায়, তখন স্ত্রী ইচ্ছা করলে অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে আর উভয়ের সম্মতি হলে তারাও আবার একে অপরকে বিয়ে করতে পারবে।

১ম ও ২য় তালাকের বিধানঃ একবার বা দু'বার রাজয়ী' তালাক দেয়ার পর স্বামী চাইলে স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে তালাক ফিরিয়ে আনতে পারবে। রাজয়ী তালাক ফিরিয়ে আনার নিয়ম হল মুখে বলবেঃ আমি তালাক ফিরিয়ে নিলাম। স্ত্রীকে চুম্বন করলে বা সঙ্গম করলেও রাজয়ী' তালাক ফিরিয়ে নেয়া হয়।
১ম বার রাজয়ী তালাকের পর ইদ্দত পার হয়ে গেলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। অর্থাৎ রাজয়ী' তালাক তখন বাইন তালাকে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তখন স্বামীর হাতে আর ক্ষমতা থাকে না। বরং স্ত্রী তার ইচ্ছামত যে কাউকে বিয়ে করতে পারবে, চাইলে প্রথম স্বামীকেও বিয়ে করতে পারবে।
২য় বার রাজয়ী' তালাকের পরও একই বিধান কার্যকর হবে। (সূরাহ বাক্বারার ২৩২তম আয়াতে এ বিধান বর্ণিত হয়েছে)

খ. বাইন তালাকঃ আরো এক প্রকার তালাক হল বাইন তালাক তথা বিবাহ বিচ্ছেদকারী তালাক। যে তালাক দেবার পর সাথে সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

বাইন তালাক দেওয়ার পদ্ধতিঃ
পদ্ধতিঃ ১ = তালাকের উদ্দেশ্যে (বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় এমন) ইঙ্গিতপূর্ন শব্দ ব্যবহার করে তালাক দিলে বাইন তালাক হয়। যেমন কোনো ব্যক্তি তালাকের উদ্দেশ্যে তার স্ত্রীকে বললঃ তুমি আমার জন্য হারাম হয়ে গেছ, আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও, ইত্যাদি। তালাকের উদ্দেশ্যে এমন শব্দ ব্যবহার করলে এক তালাক বাইন হয়। আর স্ত্রীকে ভয় দেখানোর জন্য বা উদ্দেশ্যহীনভাবে এমন করলে তালাক হয় না।
পদ্ধতিঃ ২ = স্বামী যদি স্ত্রীকে কোনো শর্ত দিয়ে বলে "অমুকের ঘরে গেলে বা অমুক কাজ করলে তুমি তালাক হয়ে যাবে"। এরপর স্ত্রী এ কাজ করে ফেলে তবে এক তালাক বাইন হয়।
পদ্ধতিঃ ৩ = আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘোটালেও এক তালাক বাইন হয়।

১ম ও ২য় বার বাইন তালাকের বিধানঃ বাইন তালাক ১বার দিলেও বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তখন স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে স্বামীর হাতে কোনো ক্ষমতা থাকে না। এর একমাত্র পথ নতুন বিবাহ। উভয় সম্মত হলে ইদ্দতের মধ্যে বা ইদ্দতের পর যে কোনো সময়ে তারা আবার বিয়ে করতে পারবে। বাইন তালাক একবার বা দু'বার দিলে এমন করা যায়। তিন তালাক দিলে আর সুযোগ থাকে না।
বাইন তালাক দেবার পর স্বামীর হাতে আর ক্ষমতা থাকে না। স্বামী চাইলেও এ তালাক আর ফিরাতে পারবে না। তখন তারা হয়ে যায় অন্য দশজন নারী পুরুষের মত। অর্থাৎ ১ম বার বা ২য় বার বাইন তালাক দেবার পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে চাইলে উভয়ের সম্মতিতে তারা আবার বিয়ে করতে পারবে।

৩য় বার তালাকের বিধানঃ তালাক রাজয়ী' হোক বা বাইন, তিনবার তালাক দেবার পর ওই স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য কঠিনতর হারাম হয়ে যায়। ফিক্বহের পরিভাষায় একে বলা হয় "মুগা'ল্লাযাহ"। মুগা'ল্লাযাহ হয়ে গেলে ওই স্বামী-স্ত্রী আর একে অন্যের জন্য হালাল থাকে না। তখন তারা উভয়ের জন্য বিবাহ নবায়নের সুযোগও বন্ধ হয়ে যায়, তখন তারা চাইলেও আর বিয়ে করতে পারবে না।
তবে ওই নারী যদি স্বাভাবিকভাবে অন্য পুরুষকে বিয়ে করে এবং (স্বভাবিক নিয়মে) তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তখন মুগা'ল্লাযাহ ভেঙ্গে গিয়ে আবার উভয়ের বিবাহ বৈধ হয়ে যায়। তখন ওই স্ত্রী ইচ্ছা করলে তার ১ম স্বামীকে আবার বিয়ে করতে পারবে। (এ বিধান বর্ণিত হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ২৩০তম আয়াতে)

হিল্লা বিয়েঃ তবে হিল্লা বিয়ের নামে আমাদের সমাজে যে নাটক করা হয় এটা দ্বীন নিয়ে তামাশার শামিল। দ্বীন নিয়ে এমন তামাশা করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। এমন করা মহাপাপ।

এক সাথে ৩ তালাকঃ এক সাথে তিন তালাক দেয়া বৈধ নয়। তাই ফিক্বহের প্রভাষায় এটাকে বিদয়ী' তালাক বা অবৈধ তালাক বলা হয়। তবে অধিকাংশ আলীমের মতে একসাথে ৩ তালাক দিলেও তালাক হয়ে যায় কিন্তু এমন করলে পাপ হয়।

তালাক থেকে যায়ঃ রাজয়ী বা বাইন, কোনো প্রকার প্রদেয় তালাক রহিত হয় না। রাজয়ী' তালাক ফিরিয়ে নিলে বা বাইন তালাকের পর পুনরায় বিয়ে করলেও এ তালাক রয়ে যায়। অর্থাৎ এক তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনলে আর ২ তালাক বাকি থাকবে, ২ তালাকের পর ফিরিয়ে আনলে আর ১ তালাক বাকি থাকবে।

তালাকের উত্তম পদ্ধতিঃ তালাকের উত্তম পদ্ধতি হল এক তালাক দিয়ে ছেড়ে দেয়া। ফিক্বহের পরিভাষায় একে বলা হয় "আহসান তালাক" তথা তালাক দেবার উত্তম পদ্ধতি। এতে দুটো সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন..
ক. স্বামী চাইলে ইদ্দতের ভিতর তালাক ফিরিয়ে নিতে পারবে।
খ. ইদ্দত পার হয়ে গেলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। তখন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে তারা সাধারণ নারী পুরুষে পরিণত হবে। তখন স্ত্রী ইচ্ছা করলে তার পছন্দ মত অন্য পুরুষকে বিয়ে হতে পারবে অথবা উভয়ে সম্মত হলে আবার নতুন করে বিয়ে করতে পারবে। এভাবে দুই বার করা যায়।

তালাকের জন্য উকিল নিয়োগ করাঃ অন্য সব কাজের মত তালাকের জন্যও উকিল নিযুক্ত করা যায় বা প্রতিনিধি বানানো যায় বা নিজের স্ত্রীকে তালাক দেবার জন্য অন্যকে ক্ষমতা (পাওয়ার অব এটর্নি) দেয়া যায়।

অবাধ্য স্ত্রীকে শাসন করার পদ্ধতিঃ স্ত্রী অবাধ্য হলে নিয়ম হলঃ প্রথমে বুঝানো। তাতে কাজ না হলে বিছানা আলাদা করে দিতে হয়। তাতেও সংশোধন না হলে হাল্কা প্রহার করে সাজা দিতে পারবে। (এ বিধান বর্ণিত হয়েছে সূরাহ নিসার ৩৪তম আয়াতে)
আর তাতেও কাজ না হলে উভয় পরিবারের সালিশ ডেকে সতর্ক করে দেবে। আর তাতেও কাজ না হলে এবং স্বামী তালাক দিতে চাইলে এক তালাক রাজয়ী দিয়ে ছেড়ে দিতে হয়। (এ বিধান বর্ণিত হয়েছে সূরাহ নিসার ৩৫তম আয়াতে)

স্ত্রী তালাক চাইলেঃ স্ত্রী তালাক বা বিচ্ছেদ চাইলে সে সরাসরি নিজেকে বা স্বামীকে তালাক দিতে পারে না। তবে অধিকার বঞ্চিত হয়ে বা নির্যাতন সহ্য করে ঘর সংসার করতেও স্ত্রী বাধ্য নয়। স্ত্রী তালাক চাইলে বা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে চাইলে তার জন্য বেশ কয়েকটি পথ খোলা রেখেছে ইসলামী শারীয়াহ। যেমন..

১. প্রদেয় ক্ষমতাঃ স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করে তবে স্ত্রী নিজেকে তালাক দিতে পারবে। একে বলা হয় প্রদেয় ক্ষমতা বলে তালাক বা তাফওয়ীজ তালাক। আর এ ক্ষমতাকে বলা হয় "প্রদেয় ক্ষমতা" যার ইংলিশ হল "ডেলিগেটেড পাওয়ার"। স্ত্রী চাইলে বিবাহকালে অথবা বিয়ের পর যে কোনো সময়ে স্বামী থেকে (লিখিত বা মৌখিক) তালাকের ক্ষমতা নিয়ে নিতে পারবে। তখন স্ত্রী প্রদেয় ক্ষমতা বলে নিজেকে তালাক দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে।

২. তালাকের অনুরোধ বা চুক্তিঃ স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীর কাছে তালাক চাইতে পারবে। তাকে তালাক দেবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করতে পারবে। এমনকি কিছু দেয়ার বিনিময়ে হলেও চুক্তি করে তালাক নিতে পারবে। কোনো কিছুর বিনিময়ে চুক্তি করে তালাক নেয়াকে "খুলা" বলা হয়। খুলা এক বাইন তালাকের সমান হয় এবং এতে ১ তালাক বাইনের বিধান কার্যকর হয়।

৩. আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদঃ স্ত্রী চাইলে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদালতে যেতে পারবে। আদালত তালাক দিতে পারবে না। তবে বিবাহ ভেঙ্গে দিতে পারবে। আদালতের মাধ্যমে বিবাহ ভেঙ্গে দিলে এক তালাক বাইনের সমান হয় এবং এতে ১ তালাক বাইনের বিধান কার্যকর হয়।

ঈমান ও আক্বীদাহঃ আজকাল অনেক দেশে আইন করে স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা দেয়া হয়। এটা আল্লাহর বিধানের সরাসরি লঙ্ঘন, সুস্পষ্ট কুফর। (নারীর ইচ্ছায় বিবাহ বিচ্ছেদ চাইলে আদালতের মাধ্যমে বিবাহ ভেঙ্গে দিতে হয়। এটা ইসলামী বিধান মেনে সঠিক সমাধান)

৬ষ্ঠ সেমিষ্টার ১৬তম দিন

তাক্বওয়া ও মুত্তাক্বী

একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের উপর অন্যতম আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হলো আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করা। আমাদের সবাইকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করতে হবে। সুতরাং আসুন! তাকওয়া সম্পর্কে একটু স্ববিস্তারে জেনে নেই।

শব্দ পরিচিতিঃ তাক্বওয়ার মূল আরবী শব্দ বিক্বায়াহ (وقاية) অর্থ বেঁচে থাকা, বিরত থাকা, ইত্যাদি। ইরশাদ হচ্ছে..

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (24)

..সুতরাং (হে জিন্ন ও ইনসান!) তোমরা সবাই (আল-কুরআনের আনুগত্য করে) ওই আগুন থেকে বাঁচো, যার ইন্ধন হবে মানুষ আর পাথর। যা তৈরি করা হয়েছে কাফিরদের তরে। (২ বাক্বারাহঃ ২৪)
উল্লেখ্য এখানে তাকওয়া শব্দটি বেঁচে থাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাকওয়া পরিচিতিঃ আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার বা বিরত থাকার নাম তাক্বওয়া। আর যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করল তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী। উল্লেখ্য তাক্বওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। যথা. অত্যাবশ্যকীয় তাক্বওয়া, আবশ্যকীয় তাক্বওয়া এবং পরিপূর্ণ তাক্বওয়া।

অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাকওয়া হলো সকল প্রকার কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। মুসলিম পুরুষ নারী সবাইকে ফরজ দায়িত্ব হিসেবে তথা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে এ তাকওয়া অর্জন করতে হবে। কারণ সনাতন বা আধুনিক যে কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে গেলে আর ঈমান ও আমল বাঁচানো সম্ভব হবে না। বরং তখন ওই ব্যক্তির ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে চির জাহান্নামী মুনাফিক। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206)

পটভূমিঃ উবাই বিন শারীক্ব মদীনার এক ধূর্ত লোক। বাহ্যত মুসলিম হলেও তার সখ্যতা ছিল কাফিরদের সাথে। সাহাবাদের কাছে সে আখনাস নামে পরিচিত ছিল। আখনাস অর্থ পলায়নকারী। বদর যুদ্ধে বানী-যুহরার ৩০০লোক নিয়ে পালিয়ে ছিল বিধায় তাকে আখনাস বলা হত।
আখনাস ছিল খুবই মিষ্টভাষী এবং কথায় পটু। সাহাবাগণ যুদ্ধ জয় করে ফিরে এলে সে বাহ্যত নিজের অপরাধ স্বীকার করে তাওবাহ করল এবং বললঃ আমার অন্তরের খবর আল্লাহ জানেন, আমি সত্য বলছি। (রাসূল সাঃ তাকে তাকওয়ার উপদেশ দিলেন। বাহ্যত তাওবাহ করলেও ভিতরে ভিতরে সে অপমান বোধ করল এবং মুসলিমদের প্রতি তার হিংসা ও জ্বালা আরো বেড়ে গেল। কিছু করতে না পেরে) হিংসার জ্বালায় সে গোপনে মুসলমানদের কয়েকটি গাধাকে মেরে ফেলল এবং কিছু ফসলী জমি নষ্ট করল। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে নাযিল হলঃ (কুরতুবী)
দুনিয়ায় এমন লোকও আছে যারা কথা দিয়ে তোমাকে মুগ্ধ করে ফেলবে এবং তার অন্তরের ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষী বানাবে কিন্তু আসলে সে চরম ঝগড়াটে। সে ফিরে গিয়ে যমীনে ফাসাদ করে, নষ্ট করে ফসল ও নসল (বংশ।) অথচ আল্লাহ কোনো প্রকার ফাসাদ পছন্দ করেন না। আর তাকওয়ার কথা বলা হলে পাপিষ্ঠের ইজ্জতে লাগে। (যে ব্যক্তি এমন হয়ে যায়) তার জন্য জাহান্নাম-ই যথেষ্ট, নিকৃষ্টতম আবাস। (২ বাক্বারাহঃ ২০৪-২০৬)

আবশ্যকীয় তাকওয়াঃ প্রতিটি মুঅমিনের জন্য আবশ্যকীয় তাক্বওয়া হল সকল প্রকার কাবীরাহ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। মুঅমিন হতে হলে এবং মুঅমিন হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে অবশ্যই এমন তাকওয়া অর্জন করতে হবে। নতুবা ওই ব্যক্তি ফাসিক হয়ে যাবে এবং তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196)

..তোমরা সবাই আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর আর মনে রেখো! আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। (২ বাক্বারাহঃ ১৯৬)

পরিপূর্ণ তাকওয়াঃ অর্থাৎ ছোটবড় সকল প্রকার পাপ ও বদ-স্বভাব থেকে বেঁচে থাকা, যা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মহান আল্লাহ্-ই কেবল তার পছন্দের বান্দাকে এমন তাওয়ার অধিকারী করতে পারেন। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)

ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর, যথাযথ তাকওয়া। আর (শোনো! পরিপূর্ণ ভাবে) আত্মসমর্পণ না করে যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়। (৩ আ-ল ই'মরামঃ ১০২)

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াত নাযিলের পর সাহাবাগণ ভাবনায় পড়ে গেলেন, বললেনঃ এমন সাধ্য কার আছে (যে যথাযথ ভাবে আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে)? রাসূল সাঃ বললেন আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ কর। সাহাবাগণ আল্লাহর বিধানকে পরিপূর্ণ ভাবে মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণের ঘোষণা দিলেন। পরে নাযিল হলঃ তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী। (তাগাবুনঃ ১৬) অর্থাৎ সূরাহ তাগাবুনের আয়াত দ্বারা উক্ত আয়াতের বিধানকে রহিত করা হয়েছে।

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16)

আর তোমরা সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে (আল্লাহর কথা) শুনবে এবং আনুগত্য করবে। এবং (আল্লাহর পথে) খরচ করবে (এতে কার্পণ্য করবে না।) এটা-ই তোমাদের জন্য উত্তম পন্থা। কারণ যাদেরকে মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হবে কেবল তারা-ই সফল হতে পারবে। (৬৪ তাগাবুনঃ ১৬)

তাকওয়া ও মুত্তাক্বী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আরো কিছু তথ্য

১. মুঅমিনের জন্য তাকওয়া হলো আবশ্যক বিষয়। তাকওয়া ব্যতীত মুঅমিন হওয়া যায় না এবং ঈমানের উপর অবিচল থাকা যায় না। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (57)

ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!) তোমরা এমন কাউকে ওয়ালী (মিত্র, অভিভাবক) বানিও না / ওয়ালী হিসেবে মেনে নিও না, যারা তোমাদের দ্বীন নিয়ে হাসি-তামাশা করে তারা তোমাদের আগেকার আহলে কিতাব হোক অথবা কাফির। (কারণ এসব হলো তাক্বওয়া পরিপন্থী কাজ।) আর মুঅমিন হতে চাইলে তোমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করতে হবে। (দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে হাসি-কৌতুক করা কুফর) (৫ মা-ইদাহঃ ৫৭)

২. তাকওয়া অর্জন করতে পারলে আল্লাহ্ আপনাকে ফুরক্বান দান করবেন। তখন ভালো মন্দ যাচাই করা আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29)

ওহে যারা ঈমান এনেছি! (শুনো!) তোমরা সবাই আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর। (তাকওয়া অর্জন করতে পারলে) তিনি তোমাদেরকে ফুরক্বান (ভালো-মন্দ নির্ণয়ের সঠিক জ্ঞানও নীতিমালা) দান করবেন, তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ হলেন মহা অনুগ্রহশীল। (৮ আনফালঃ ২৯)

জ্ঞাতব্যঃ যে ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করতে পারবে আল্লাহ তাকে ফুরক্বান দান করবেন। তখন সে নিজেই ভালোমন্দের বিভেদ বুঝতে পারবে। আর হয়ত এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেই রাসূল সা. ওয়াবিস্বাহ রা.কে বলেছিলেনঃ ওয়াবিস্বাহ! অন্যকে জিজ্ঞেস করার আগে প্রথমে নিজের মনকে জিজ্ঞেস কর...। (মুসনাদে আহমদঃ ১৮০০৬। হাদীছটি দীর্ঘ, হাদীছটি সাহীহ)

৩. আপনি মুত্তাক্বী হয়ে গেলে আল্লাহ্ আপনার সঙ্গী হয়ে যাবেন। ইরশাদ হচ্ছে..

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

..তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর আর জেনে রাখো! আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদের সঙ্গী। (২ বাক্বারাহঃ ১৯৪)

৪. আপনি তাক্বওয়া অর্জন করতে পারলে আল্লাহ আপনার রিজকের জিম্মাদার হয়ে যাবেন। ইরশাদ হচ্ছে...

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

...যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে আল্লাহ্ তার জন্য পথ খুলে দেবেন এবং এমন জায়গা থেকে রিজক দান করবেন যা সে ভাবতেই পারবে না।... (৬৫ ত্বালাক্বঃ ২-৩)

৫. আল্লাহ্ কেবল মুত্তাক্বীদের থেকেই তাদের আ'মাল ও ইবাদাত কবুল করেন। সুতরাং আপনি মুত্তাক্বী হতে পারলেই কেবল আল্লাহ্ আপনার সকল আ'মাল ও ইবাদাত কবুল করবেন নতুবা আপনার আ'মাল ও ইবাদাত কবুল হওয়ার কোনো নিশ্চয়তা থাকবে না। ইরশাদ হচ্ছে...

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27)

(হে নবী!) তাদের কাছে বর্ণনা কর আদমের দুই ছেলের (হাবিল ও কাবিলের) কাহিনী। যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল এবং একজনের (হাবিলের) কুরবানী কবুল করা হল আর অন্য জনের (কাবিলের কুরবানী) কবুল করা হল না। (কাবিল এ জন্য হাবিলকে দায়ী করল) সে বললঃ আমি তোমাকে মেরে ফেলব। (হাবিল) বললঃ (তোমার কুরবানী কবুল হয়নি। এ জন্য আমি দায়ী নয়। তুমি পাপ ছেড়ে মুত্তাক্বী হয়ে যাও। তবেই তোমার কুরবানী কবুল হবে। কারণ) আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের থেকেই (তাদের আ'মাল) কবুল করে থাকেন। (পাপিষ্ঠরা সর্বদাই নিজের অপরাধের জন্য অন্যকে দায়ী করে) (৫ মা-ইদাহঃ ২৭)

৬. আপনি মুত্তাক্বী হতে পারলে আল-কুরআন আপনার সঙ্গী হয়ে যাবে এবং আপনাকে জান্নাতে পৌঁছানো পর্যন্ত আপনার সঙ্গে থাকবে। ইরশাদ হচ্ছে..

ওই কিতাবে (আল-কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই। (এ কুরআন) মুত্তাক্বীদের জন্য হেদায়াত। (বাক্বারাহঃ ২)	ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

৭. আপনি মুত্তাক্বী হতে পারলে আল্লাহ্ আপনার সকল পাপ মোচন করে দেবেন। ইরশাদ হচ্ছে..

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)

এটা-ই আল্লাহর হুকুম /আল্লাহর দ্বীন /আল্লাহর বিধান, যা তিনি তোমার প্রতি নাযিল করেছেন। আর (এর স্বার কথা হচ্ছে) যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে আল্লাহ তার পাপসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তাকে দান করবেন মহা পুরস্কার। (৬৫ ত্বালাক্বঃ ৫)

৮. তাক্বওয়া সফলতার চাবিকাঠি। আপনি মুত্তাক্বী হতে পারলে আপনার জীবন সফল হবে এবং আপনি হয়ে যাবেন চির জান্নাতী। ইরশাদ হচ্ছে..

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133)	

(হে মানব ও দানব!) তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ছুটে চলো, যার প্রশস্ততা হলো আসমান যমীন (সমতুল্য) যা তৈরি করা হয়েছে মুত্তাক্বীদের জন্য। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৩৩)

সুতরাং বুঝতেই পারছেন জান্নাতে যাওয়ার মূল বিষয়ই হচ্ছে ঈমান ও তাকওয়া তথা ঈমান আনার পর আল্লাহর ইবাদাত করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকা।

৯. আখেরাতে তাকওয়ার উপ্র ভিত্তি করেই মানুষের সম্মান নিরদ্ধারিত হবে।ইরশাদ হচ্ছে..

নিশ্চয় তোমাদের মাঝে যার তাকওয়া যত বেশি হবে আল্লাহর কাছে সে-ই বেশী সম্মানিত হবে। (হুজরাতঃ ১৩)	ان اكرمكم عند الله اتقيكم

৬ষ্ঠ সেমিষ্টার ১৭তম দিন

তাওবাহ, ইস্তিগফার ও তাযকিয়্যাহ

তাওবাহ, ইস্তিগফার ও তাযকিয়্যাহ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ন ৩টি বিষয় এবং এবিষয় সম্পর্কে স্টহিক জ্ঞান রাখা আমাদের জন্য অপরিহার্য। আর এ সম্পর্কে আপনাদেরকে সঠিক জ্ঞান দেওয়ার জন্যই বিষয় ৩টিকে আমাদের এ কোর্সে শামিল করা হয়েছে। সহজভাবে বুঝার সুবিধার্থে বিষয় ৩টিকে আমরা ৩টি আলাদা পাঠে বিন্যস্ত করেছি।

১ম পাঠঃ তাওবাহ

আমাদের নৈতিক ও আদর্শিক ফরজে আইন সমূহের মাঝে অন্যতম একটি হলো তাওবাহ। প্রতিটি মানুষ ও জিনের উপর সর্ব প্রথম ফরজ দায়িত্ব হলো তাওবাহ করা তথা সকল প্রকার কুফর, শিরক, পাপাচার ও ত্বাগূতকে বর্জন করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসা।

তাওবাহ পরিচিতিঃ তাওবাহ অর্থ ফিরে আসা। তাওবাহ একটি আদর্শিক বিষয়। কুফর শিরক ও পাপের পথ ত্যাগ করে ঈমান ও ইসলামের পথে ফিরে আসার নাম তাওবাহ। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (71)	

যে ব্যক্তি তাওবাহ করল (অর্থাৎ পাপের পথ ত্যাগ করে আদর্শগত ভাবে ইসলামের পথে ফিরে এলো) আর সৎকাজ করল; সে আল্লাহর কাছে-ই ফিরে এলো আর এটা-ই হলো ফিরে আসার সঠিক জায়গা। (২৫ ফুরক্বানঃ ৭১)

জ্ঞাতব্যঃ এখানে তাওবাহ শব্দটি বিভিন্ন ক্রিয়া পদে রূপান্তরিত হয়ে ৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। ১ম বার আমরা অর্থ করেছি "তাওবাহ করল" মানে পাপের পথ ত্যাগ করে আদর্শগত ভাবে সৎপথে ফিরে এলো, ২য় বারে অর্থ করেছি "ফিরে এলো" আর ৩য় বারে অর্থ করেছি "ফিরে আসার সঠিক জায়গা"।

তাওবাহর প্রকার ভেদঃ সকল প্রকার মন্দ কাজ ও মন্দ পথ ত্যাগ করে তথা মন্দ থেকে ফিরে এসে আদর্শগত ভাবে ভালো হয়ে যাবার নাম তাওবাহ। মন্দের অনেক প্রকার রয়েছে। তাই তাওবাহ বা ফিরে আসাও অনেক প্রকার হতে পারে। যেমন..

- এক প্রকার তাওবাহ হচ্ছে শিরক ছেড়ে ইসলামের পথে ফিরে আসা। এটা একটা আদর্শিক তাওবাহ তথা জীবনের আদর্শিক পরিবর্তন। (ইসলাম গ্রহণের আগে এমন তাওবাহ করতে হয় এবং ইসলাম গ্রহণের পরও এটা অব্যাহত রাখতে হয়।)
- কুফর ছেড়ে ঈমানের পথে ফিরে আসাও এক প্রকার তাওবাহ। এটাও আদর্শিক তাওবাহ তথা জীবনের আদর্শিক পরিবর্তন। (যে তাওবাহ করতে হয় ইসলাম গ্রহণের আগে এবং ইসলাম গ্রহণের পরও এটা অব্যাহত রাখতে হয়।)
- আরো এক প্রকার তাওবাহ হলো পাপ ছেড়ে পূণ্যের পথে ফিরে আসা। (এমন তাওবাহ প্রতিনিয়ত করতে হয়)
- সকল প্রকার মন্দকে বিসর্জন দিয়ে সৎপথে ফিরে আসা হচ্ছে সার্বিক তাওবাহ। (এমন তাওবাহ প্রতিনিয়ত করতে হয়)

আমাদেরকে কোন ধরণের তাওবাহ করতে হবেঃ মুঅমিন হতে হলে এবং ঈমানের উপর অবিচল থাকতে হলে আমাদেরকে সকল প্রকার তাওবাহ-ই করতে হবে। প্রথম তাওবাহ হচ্ছে কুফর শিরক ছেড়ে ইসলাম ও ঈমানের পথে ফিরে আসা। ইসলাম গ্রহণের আগে-ই প্রথমে কুফর শিরক পরিত্যাগ করতে হবে এবং কুফর ও শিরকের সকল পথ পরিহার করে ইসলামের পথে ফিরে আসতে হবে এবং জীবন আদর্শ হিসেবে একমাত্র ইসলামকে-ই মেনে চলতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে...

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70)	

তবে যে ব্যক্তি (কুফর শিরক থেকে) তাওবাহ করল এবং ঈমান আনল আর (ওই ঈমানের সহিত) সৎকাজ করল আল্লাহ তাদের মন্দকে ভালোয় রূপান্তরিত করে দেন (তথা সাজার বদলে পুরস্কার দেন) আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল দয়াময়। (২৫ ফুরক্বানঃ ৭০)

জ্ঞাতব্যঃ এখানে বর্ণনার ধারাবাহিকতায় প্রথমে এসেছে তাওবাহ, তারপর ঈমান, তারপর সৎকাজ। অর্থাৎ প্রথমে কুফর শিরক পরিত্যাগ করে ইসলামের পথে ফিরে আসতে হবে, তারপর ঈমান আনতে হবে। তারপর সৎকাজ করলে এসব কাজ ফলপ্রসু হবে, ইন শা-আল্লাহ।

পর্যালোচনাঃ মুঅমিন হতে হলে প্রথমে তাওবাহ করতে হবে। এ তাওবাহ হচ্ছে কুফর শিরক পরিত্যাগ করে ইসলামের পথে ফিরে আসা তথা বাস্তব জীবনে আদর্শগত পরিবর্তন। মুঅমিন হয়ে গেলেও তাওবাহ শেষ হয় না বরং মুঅমিন হবার পরও তাওবাহ অব্যাহত রাখতে হয়। কারণঃ শয়তান ও নাফসের (অশুভ আত্মার) ধোঁকায় পড়ে পাপ করা মানুষের স্বভাব। স্বভাবগত কারণেই মানুষ বারবার পাপে জড়িয়ে পড়ে। মানুষ কখনো জেনে বুঝে পাপ করে এবং কখনো না জেনে। তাই জানা অজানা সকল প্রকার পাপের জন্য বারবার তাওবাহ করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8)	

ওহে যারা ঈমান এনেছো! (শুনো!) তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবাহ কর, বিশুদ্ধ তাওবাহ (যে তাওবাহর পর আর পাপ করা হয় না এমন তাওবাহকে বলা হয় নাসূহা' তাওবাহ তথা বিশুদ্ধ তাওবাহ। এমন করলে) আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত কত নহর। আল্লাহ সেদিন নবীকে অপদস্থ করবেন না এবং তাদেরকেও (অপদস্থ করবেন না) যারা নবীর (আদর্শিক) সঙ্গী হয়ে ঈমান গ্রহণ করেছে। (সেদিন) তাদের (ঈমান ও আমলের) নূর তাদের সামনে ও ডানে চলমান থাকবে (এ নূর হল ঈমান ও আ'মালের নূর। অন্তর থেকে বের হবে ঈমানের নূর আর ডান দিক থেকে বের হবে আ'মালের নূর।) তারা বলবেঃ হে রাব্ব! আমাদের নূরকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে মহাক্ষমতাবান। (৬৬ তাহরীমঃ ৮)

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)	

..হে মুঅমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে আসো! এতে তোমরা সফল হতে পারবে। (২৪ নূরঃ ৩১)

২য় পাঠঃ ইস্তিগফার

ইস্তিগফারঃ ইস্তিগফার অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা, মাফ চাওয়া। নিজের পাপ স্বীকার করে নিয়ে পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়াকে ইস্তিগফার বলা হয়। তাওবাহর পরপরই ইস্তিগফার করতে হয়। মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

..আর তোমরা আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (২/১৯৯)	وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করার পর পাপ ছেড়ে দিয়ে ভালো পথে চলতে হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90)	

তোমরা প্রভুর কাছে ক্ষমা চাও অতঃপর তার দিকে ফিরে আসো। নিশ্চয় আমার প্রভু দয়াময়, স্নেহময়। (১১ হূদঃ ৯০)

তবে ৩টি পূন্য এমন আছে যা অতীতের ছোট বড় সকল পাপকে মোচন করে দেয়। আর তা হচ্ছেঃ ইসলাম, হিজরত আর হাজ্ব। যেমন বর্নিত হচ্ছে..

فلمَّا جعل اللهُ الإسلامَ في قلبي أتيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقلتُ يا رسولَ اللهِ ابسُطْ يمينَك لأبايعَك فبسط يدَه فقبضْتُ يدي فقال ما لك يا عمرُو قال أردْتُ أن أشترِطَ قال تشترِطُ ماذا قال أن يُغفرَ لي قال أما علمتَ يا عمرُو أنَّ الإسلامَ يهدِمُ ما كان قَبلَه وأنَّ الهجرةَ تهدِمُ ما كان قبلَها وأنَّ الحجَّ يهدِمُ ما كان قبلَه

মুসলিমে বর্নিত এক দীর্ঘ হাদীছে আ'মর বিন আ'স্ব রা. বলেনঃ ...আল্লাহ যখন আমার অন্তরে ইসলামকে স্থাপন করলেন আমি তখন নবী সাঃর কাছে এলাম এবং বললামঃ আপনার ডানহাত বাড়িয়ে দিন আমি বাইয়াত (আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ) করব। তিনি হাত বাড়ালে আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। তিনি বললেনঃ আ'মর, তোমার কী হয়েছে! আমি বললামঃ আমি একটি শর্ত দিতে চাই। তিনি বললেনঃ শর্ত দিতে চাও! কী সেটি? আমি বললামঃ আমার অতীতের সকল পাপ মাফ করে দেওয়া হক। তিনি বললেনঃ তুমি কি জানো নাঃ ইসলাম অতীতের সকল পাপকে বিনাশ করে দেয়, হিজরত অতীতের সকল পাপকে বিনাশ করে দেয় এবং হাজ্ব অতীতের সকল পাপকে বিনাশ করে দেয়?... (মুসলিমঃ ১২১)

উল্লেখ্য এছাড়াও কবীরাহ ধরনের পাপসমূহ তাওবাহও ইস্তিগফারের দ্বারা আর ছোটছোট পাপসমূহ অন্যান্য নেক আমলের দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাফ হতে থাকে।

৩য় পাঠঃ তাযকিয়্যাহ

ইসলাম গ্রহণের পর আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ দায়িত্ব হচ্ছে তাযকিয়্যাহ। মুঅমিন হতে হলে এবং ঈমানের উপর অবিচল থাকতে হলে যেসব কাজ করতে হয় তাযকিয়্যাহ এসবের মাঝে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি। তাযকিয়্যাহ মুঅমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট।
তাযকিয়্যাহ সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই সঠিক ধারণা নেই। আর এ সুযোগের অপব্যবহার করে এক শ্রেণীর ভন্ডপীর জীবনভর আমাদেরকে প্রতারিত করে যাচ্ছেন, উনারা তাযকিয়্যাহ শব্দটিকে অপব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকেন। তাই তাদের বিভ্রান্তি থেকে বাঁচতে হলে এবং ঈমানের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হলে তাযকিয়্যাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। সুতরাং আসুন! বিষয়টি সম্পর্কে একটু জেনে নেই।

তাযকিয়্যাহ পরিচিতিঃ তাযকিয়্যাহ অর্থ বিশুদ্ধ করণ, শুদ্ধি করণ, পরিচ্ছন্ন করণ, সত্যায়ন করা, পাপমুক্ত করণ, ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাফসীর জালালাইনে এর অর্থ লিখা হয়েছে অন্তরকে "শিরকমুক্ত করা"। আর তাফসীর ক্বুরতুবীতে এর অর্থ লিখা হয়েছে..

- অন্তর দিয়ে ঈমান আনা
- নিজেকে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে মুক্ত করা এবং মুক্ত রাখা
- সম্পদের যাকাত আদায় করা।

তাযকিয়্যাহর সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ ভালোভাবে অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় তাযকিয়্যাহর ৩টি ধাপ রয়েছে। যথা..
১ম ধাপের তাযকিয়্যাহ হচ্ছে কুফর শিরক থেকে নিজেকে বিশুদ্ধ করা ও পরিচ্ছন্ন রাখা। এমন ধরণের তাযকিয়্যাহ করা এবং এজন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা ফরজ। যে ব্যক্তি নিজেকে কুফর শিরক থেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারবে না সে কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়বে এবং এতে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে এবং তখন সে আর মুঅমিন থাকতে পারবে না। বরং মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হতে হবে। পবিত্র কুরআনে সূরাহ বাক্বারাহর ১২৯ এবং ১৫১তম আয়াতে, সূরাহ আ-ল ই'মরানের ১৬৪তম আয়াতে, সূরাহ জুমুয়া'হর ২য় আয়াতে এবং সূরাহ নাযিয়াতের ১৮তম আয়াতে এ ধরণের তাযকিয়্যাহর কথা বলা হয়েছে। যেমন..

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129)

হে রাব্ব! তাদেরই (মক্কায় বসবাসকারী আরবদেরই) একজনকে তাদের কাছে রাসূল বানিয়ে পাঠিও, যে তাদের কাছে তোমার বিধান পাঠ করবে, শিখাবে কিতাব ও হিকমাহ (সুন্নাহ) আর তাদেরকে তাযকিয়্যাহ (কুফর শিরক থেকে মুক্ত) করবে। নিশ্চয় তুমি মহা-পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২ বাকারাহঃ ১২৯)

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে..

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151)

যেমন তোমাদের কাছে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি তোমাদেরি একজনকে। সে তোমাদের কাছে আমার আয়াত (কিতাব, বিধান) পাঠ করবে, তোমাদেরকে তাযকিয়্যাহ (কুফর শিরক থেকে মুক্ত) করবে, শিক্ষা দেবে কিতাব ও হিকমাহ (কুরআন ও সুন্নাহ) শিক্ষা দেবে যা তোমরা জানতে না। (২ বাকারাহঃ ১৫১)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ..

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (164)

আল্লাহ মুঅমিনদের প্রতি দয়া করেছেন, যখন তাদের কাছে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন তাদেরই একজনকে, যে তাদের কাছে আল্লাহর আয়াত (কিতাব ও বিধান) পাঠ করবে, তাদেরকে তাযকিয়্যাহ (কুফর শিরক থেকে মুক্ত) করবে, শিখাবে কিতাব ও হিকমাহ (কুরআন ও সুন্নাহ) যদিও আগে তারা চরম ভাবে বিভ্রান্ত ছিল। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৬৪)

২য় ধাপের তাযকিয়্যাহ হচ্ছে যাবতীয় কাবীরাহ (মহাপাপ) থেকে বিশুদ্ধ হওয়া ও পরিচ্ছন্ন থাকা। এ ধরণের তাযকিয়্যাহর জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা ফরজ। কাবীরাহ থেকে বেঁচে থাকতে না পারলে মানুষ কাবীরাহ গুনাহে জড়িয়ে ফাসিক হয়ে যায় এবং তখন তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174)

যারা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবের কোনোকিছু গোপন করে অথবা সামান্য (দুনিয়ার) বিনিময়ে বদলে ফেলে, তারা আগুন দিয়েই উদরপূর্তি করছে। পরকালে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের তাযকিয়্যাহ (পাপ থেকে মুক্ত) করবেন না। আর তাদের তরে কঠিন আযাব। (২ বাকারাহঃ ১৭৪)

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)

আর যারা সামান্য (দুনিয়ার) বিনিময়ে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আখেরাতে তাদের জন্য কিছুই নেই। আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের তাযকিয়্যাহ (পাপ থেকে মুক্ত) করবেন না এবং তাদের তরে কঠিন আযাব। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৭৭)

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াতের বিশ্লেষণে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

45/1852-وعنْ أبي هريرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يوْمَ الْقِيَامةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلا ينْظُرُ إِلَيْهِمْ ولَهُمْ عذَابٌ أَليمٌ شَيْخٌ زَانٍ ومَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ. رواهُ مسلم

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ পরকালে তিন ধরণের মানুষের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের তাযকিয়্যাহ (পাপ থেকে মুক্ত) করবেন না এবং তাদের তরে আছে কঠিন আযাব। (আর এ ৩ ব্যক্তি হচ্ছে..)
বৃদ্ধ যিনাকারী, মিথ্যুক শাসক আর দাম্ভিক ভিক্ষুক। (মুসলিমঃ ৪৫/১৮৫২)

৩য় ধাপের তাযকিয়্যাহ হচ্ছে সকল প্রকার পাপ ও বদ অভ্যাস থেকে নিজেকে বিশুদ্ধ করা ও পরিচ্ছন্ন রাখা তথা নিজেকে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত করে ফেলা, যা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা কেবল আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব। সূরাহ নাজম এর ৩২ তম আয়াতে এ ধরণের তাযকিয়্যাহর কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে..

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ (32)

যারা (কুফর শিরক ও নেফাকসহ) বড় বড় পাপ আর (যিনা, সমকামিতাসহ সকল) অশ্লীলতা পরিহার করে চলবে (তাদের) ছোট পাপসমূহ (আল্লাহ মাফ করে দেবেন।) নিশ্চয় তোমার প্রভূর ক্ষমা অপরিসীম। তিনি তখন থেকেই তোমাদের ব্যাপারে অবগত; যখন তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, যখন তোমরা ভ্রূণ আকারে মাতৃগর্ভে ছিলে। সুতরাং (হে মানুষ ও জিন্ন জাতি!) তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে /একে অপরকে তাযকিয়্যাহ করো না /নিজেদের তাযকিয়্যাহ হয়ে গেছে এমন মনে কর না। আসলে শুধু তিনিই জানেন; কে মুত্তাক্বী হতে পেরেছে। (৫৩ নাজমঃ ৩২) (যে ব্যক্তি কুফর, শিরক ও পাপচার থেকে বেঁচে থাকল সেই মুত্তাক্বী)

তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতিঃ ১ম ধাপের তাযকিয়্যাহর জন্য আল্লাহর কালাম এবং রাসূল সাঃর সুন্নাহ অধ্যয়ন করতে হবে এবং কুরআন সুন্নাহর নীতিমালা মেনে নিজের জীবন এবং আত্মাকে যাবতীয় কুফর শিরক থেকে মুক্ত করতে হবে এবং মুক্ত রাখতে হবে। এটা-ই হলো ১ম শ্রেণীর তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতি। মুঅমিন হতে হলে এতোটুকু তাযকিয়্যাহ আমাদেরকে করতেই হবে।

২য় ধাপের তাযকিয়্যাহর জন্য আল্লাহর কালাম এবং রাসূল সাঃর সুন্নাহ অধ্যয়ন করতে হবে এবং কুরআন সুন্নাহর নীতিমালা মেনে নিজের জীবন ও আত্মাকে যাবতীয় পাপাচার, হিংসা-বিদ্বেষ, দম্ভ-অহমিকাসহ সকল প্রকার অবৈধ কামনাবাসনা থেকে পরিচ্ছন্ন করার এবং পরিচ্ছন্ন রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এটা-ই হবে ২য় শ্রেণীর তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতি। মুঅমিন হতে হলে এতোটুকু প্রচেষ্টা করতেই হবে। তবে এমন বিষয়ে চূড়ান্ত তাযকিয়্যাহ হবে পরকালে। বিচার দিনে মহান আল্লাহ্ মানুষের পাপসমূহ মোচন করে মানুষকে এমন তাযকিয়্যাহ দান করবেন।

৩য় ধাপের তাযকিয়্যাহ মানে যাবতীয় পাপ কাজ এবং দোষত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল আল্লাহই পারেন মানুষকে সকল প্রকার পাপ থেকে মুক্ত করতে এবং মুক্ত রাখতে। তাই এ জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে।

একটি ভুলের অবসানঃ আমাদের সমাজের কিছু ভন্ডপীর তাযকিয়্যাহ শব্দ ব্যবহার করে লোকজনকে বুঝায় পীরের কাছে মুরিদ হয়ে পীরের বানানো তরিকা মেনে মারিফত ও তরিকতের নামে মনগড়া যিকির ও অযিফা পাঠ করা এবং পীর থেকে সনদ ও ইজাজত নিয়ে সমাজে পীরের খালীফাহ (প্রতিনিধি) হিসেবে কাজ করা।

তাযকিয়্যাহ সম্পর্কিত কয়েকটি বিধানঃ

বিধানঃ ১. আল্লাহ্ রাসূল পাঠিয়েছেন মানুষকে তাযকিয়্যাহ তথা যাবতীয় কুফর ও শিরক থেকে মুক্ত করার জন্য এবং পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য। ইরশাদ হচ্ছে...

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (2)

তিনিই উম্মীদের (আরবদের) মাঝে তাদেরই একজনকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে আল্লাহর কিতাব পাঠ করবে, (যাবতীয় কুফর ও শিরক থেকে) তাদেরকে তাযকিয়্যাহ করবে এবং শিক্ষা দেবে কিতাব ও হিকমাহ (কুরআন ও সুন্নাহ) যদিও ইতোপূর্বে তারা চরম ভাবে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল। (৬২ জুমুয়া'হঃ ২)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ (15) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (16) اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (17) فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ (18)

(হে নবী!) তোমার কাছে কী এসেছেঃ মূসার খবর? তাঁর রাব্ব যখন তাকে পবিত্র তোয়া উপত্যকায় ডেকে নিয়ে বলেছিলেনঃ ফেরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে, তাকে বলঃ তুমি কি নিজেকে তাযকিয়্যাহ (কুফর ও শিরক থেকে বিশুদ্ধ) করতে চাও?
(৭৯ নাযিয়াতঃ ১৫-১৮)

বিধানঃ ২. তাযকিয়্যাহ সফলতার মাপকাঠি। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেকে যাবতীয় কুফর ও শিরক থেকে পরিচ্ছন্ন করতে এবং পরিচ্ছন্ন রাখতে পারল সে তার জীবনের লক্ষ্য অর্জনে অবশ্যই সফল হয়ে গেলো। এ ব্যাপারে ঘোষণা দিয়ে মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেন..

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ (15)

ওই ব্যক্তি সফল যে তাযকিয়্যাহ (কুফর ও শিরক থেকে মুক্ত) হতে পারল, প্রভুর নাম স্মরণ করল আর সালাত (নামায, দ্বীন) পালন করল।
(৮৭ আ'লাঃ ১৪-১৫)

বিধানঃ ৩. পাপ মোচনকেও তাযকিয়্যাহ বলা হয়। আর পাপ মোচন শুধুই আল্লাহর কাজ। তাই পাপ মোচনের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে...

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)

আর যারা সামান্য (দুনিয়ার) বিনিময়ে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করল আখেরাতে তাদের জন্য কিছুই নেই। আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের তাযকিয়্যাহ (পাপ মুক্ত) করবেন না। তাদের তরে কঠিন আযাব।
(৩ আ-ল ই'মরানঃ ৭৭)

বিধানঃ ৪. তাযকিয়্যাহ যেহেতু নৈতিক, আদর্শিক ও আত্মীক ব্যাপার, তাযকিয়্যাহ যেহেতু নীতি, আদর্শ ও আত্মার সাথে সম্পর্কিত, তাই পরিপূর্ণ ভাবে তাযকিয়্যাহ করার একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ্ তায়া'লা। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ পরিপূর্ণ তাযকিয়্যাহ করতে পারে না /পারবেও না। ইরশাদ হচ্ছে...

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (49) انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا (50)

তাদের দেখনি? যারা নিজে নিজেকে /একে অপরকে তাযকিয়্যাহ করে /তাযকিয়্যাহ হয়ে গেছে বলে মনে করে। অথচ আসল ব্যাপার হলো (কেউ কাউকে তাযকিয়্যাহ করতে পারে না। তাযকিয়্যাহ করার একমাত্র ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। আর) আল্লাহ তাযকিয়্যাহ করেন যাকে খুশী। (তাযকিয়্যাহ অর্থ কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে বিশুদ্ধ করা এবং বিশুদ্ধ রাখা। যে ব্যক্তি নিজেকে কুফর শিরক থেকে বিরত রাখবে আল্লাহ তাকেই তাযকিয়্যাহ করবেন) কারো প্রতি অবিচার করা হবে না। লক্ষ্য করঃ তারা কী ভাবে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করছে। সুস্পষ্ট পাপের জন্য এটা-ই যথেষ্ট। (৪ নিসাঃ ৪৯-৫০)

জ্ঞাতব্য ও পটভূমিঃ তাযকিয়্যাহ অর্থ পবিত্র করণ, বিশুদ্ধ করণ, আত্মশুদ্ধি করণ। যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপ কাজ থেকে নিজের জীবন এবং আত্মাকে পবিত্র করা ও পবিত্র রাখার নাম তাযকিয়্যাহ। যে ব্যক্তি কুফর শিরক ও পাপ কাজ ছেড়ে দেয় আল্লাহ তাকেই বিশুদ্ধ করেন।
অথচ কিছু মানুষ মনে করে মনগড়া তরিকায় সাধনা করলেই তাযকিয়্যাহ হয়ে যায়। কেউ কেউ মনে করে পীর সাহেবই পারেন মুরিদকে তাযকিয়্যাহ করতে। অনেক ভন্ডপীর তার মুরিদের তাযকিয়্যাহ হয়ে গেছে বলে সনদ ও দিয়ে দেয়। যারা এমন করে তারা আল্লাহর উপর মিথ্যাচারে রত। এদের প্রতি ইঙ্গিত করে আয়াত দুটি নাযিল হয়েছে।

বিধানঃ ৫. নিজের তাযকিয়্যাহ হয়েগেছে বা অন্যকারো তাযকিয়্যাহ হয়েগেছে; এমন মনে করা নিষেধ। ইরশাদ হচ্ছে..

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ (32)

তারা (যদি কুফর, শিরক, নেফাকসহ) বড় বড় পাপ আর অশ্লীলতা পরিহার করে চলে তবে তাদের ছোট ছোট পাপসমূহ (আল্লাহ্ মাফ করে দেবেন।) নিশ্চয় তোমার প্রভূর ক্ষমা অপরিসীম। তিনি তখন থেকেই তোমাদের ব্যাপারে অবগত; যখন তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা ভ্রূণ আকারে মাতৃগর্ভে ছিলে। তোমরা নিজে নিজেকে /একে অন্যকে তাযকিয়্যাহ /তাযকিয়্যাহ হয়ে গেছে মনে) করো না। তিনিই জানেন; কে মুত্তাক্বী হতে পেরেছে। (৫৩ নাজমঃ ৩২) (যে ব্যক্তি কুফর, শিরক ও পাপচার থেকে বেঁচে থাকল সেই মুত্তাক্বী)

যাকাত ও সূদ

১ম পাঠঃ যাকাত

প্রারম্ভিক কথাঃ যাকাত অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মানবতার কল্যাণে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামের ৫টি মূলনীতির ৩য়টি হচ্ছে যাকাত। যাকাত ইসলামী অর্থনীতির একটি মূল চালিকা শক্তি।

বর্তমান বিশ্বের দেশে দেশে ট্যাক্স, ভ্যাট, খাজনা, ব্যবসা, ইত্যাদি যেভাবে সরকারী অর্থ ব্যবস্থার মূল বিষয় ঠিক তদ্রুপ ইসলামী সরকার অর্থের মূল উৎস হলো যাকাত, উশুর, খারাজ, জিযিয়া, ব্যবসা, ইত্যাদি।

এ অধ্যায়ে আমরা যাকাত, উশুর ও খারাজ নিয়ে আলোচনা করব। বিষয়টিকে সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য এ অধ্যায়কে আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিন্যস্থ করেছি। যথা...

১ম অনুচ্ছেদঃ যাকাত পরিচিতি
২য় অনুচ্ছেদঃ যাকাতের গুরুত্ব ও বিধান
৩য় অনুচ্ছেদঃ যাকাতের নিস্বাব বা পরিমাণ
৪র্থ অনুচ্ছেদঃ যার উপর যাকাত ফরজ হয়
৫ম অনুচ্ছেদঃ যেসব সম্পদের যাকাত দিতে হয়
৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ কখন যাকাত দিতে হয়
৭ম অনুচ্ছেদঃ যাকাতের হিসাব
৮ম অনুচ্ছেদঃ যাকাত আদায়ের পদ্ধতি
৯ম অনুচ্ছেদঃ যাকাত কোন খাতে খরচ করতে হয়
১০ম অনুচ্ছেদঃ যাকাত আদায়ে নিয়ত
১১শ অনুচ্ছেদঃ পশুর যাকাত
১২শ অনুচ্ছেদঃ ফসলের যাকাত /উশুর
১৩শ অনুচ্ছেদঃ খারাজ
১৪শ অনুচ্ছেদঃ জিযিয়াহ

১ম অনুচ্ছেদঃ যাকাত পরিচিতি

মূল আরবী শব্দ (زكاة) যাকাহ, আমাদের সমাজে উর্দু/ফার্সি উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় যাকাত। যাকাহ অর্থ পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা, পরিচ্ছন্নতা, বৃদ্ধি, বরকত, ইত্যাদি।

নাম করণঃ আমরা সাধারণত সম্পদ অর্জন বা উপার্জন করি। আমাদের অর্জন বা উপার্জনে ভুল ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। এ ছাড়া আল্লাহ তায়া'লা ধনীর সম্পদে গরীবের অধিকার দিয়েছেন। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদ ত্রুটিমুক্ত ও পবিত্র হয় এবং অন্যের হক মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন হয়, যাকাত আদায়ের ফলে সম্পদে বরকত হয়। আর এসব কারণে একে যাকাত বলা হয়।

আমাদের অর্জিত বা উপার্জিত সম্পদের একটা অংশ মানবতার কল্যাণে দান করার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন আল্লাহ তায়া'লা। মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারণ করা অংশ নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাই যাকাতের মূল বিষয়।

২য় অনুচ্ছেদঃ যাকাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী শারীয়া'হ মতে যাকাত আদায় করা অত্যাবশ্যকীয় ফরজ। নীতিগত ভাবে যাকাতের গুরত্বকে অবজ্ঞা করা অথবা যাকাতের বিধান অমান্য বা অস্বীকার করা কুফর আর যাকাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা নীতিগত ভাবে মেনে নিয়ে এটা আদায় না করা মহাপাপ। ইরশাদ হচ্ছে..

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)

তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর আর রুকুকারীদের (তথা আনুগত্যকারীদের) সাথে রুকু (আল্লাহর আনুগত্য) কর।

(বাক্বারাহঃ ৪৩)

যাকাত না দেওয়ার পরিণামঃ যাকাত না দেওয়া মহাপাপ। নীতিগতভাবে যাকাতের বিধান অমান্য করা কুফর। যাকাত অস্বীকার করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। তখন সকল আ'মাল বরবাদ ও বেকার হয়ে যায়। রাসূল সাঃর ইন্তেকালের পর কিছু মানুষ যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল বিধায় আবু-বাকর রাঃ তাদের সাথে যুদ্ধ করে ছিলেন। বর্ণিত হচ্ছে..

وعَن ابن عُمَر رَضِيَ الله عنْهما قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺأُمِرْتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ويُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذا فَعَلوا ذلكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهم إِلاَّ بِحَقِّ الإِسلامِ، وحِسابُهُمْ عَلى اللهِ . مُتفقٌ عليه.

আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন মানুষের সাথে যুদ্ধ করি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং সালাত কায়েম করবে আর যাকাত আদায় করবে। যারা এসব মেনে নেবে তাদের জানমাল আমার থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে তবে ইসলামের অধিকার (নষ্ট করলে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।) আর তাদেরকে জবাবদিহিতা করতে হবে আল্লাহর কাছে। (বুখারী ও মুসলিম। হাদীছটি অনেক সাহাবী থেকে বর্নিত। হাদীছটি মুতাওয়াতির)

৩য় অনুচ্ছেদঃ যাকাতের নিসাব

নিসাব অর্থ পরিমাণ। ইসলামী সমাজে যে পরিমাণ সম্পদ সঞ্চিত থাকলে একজন ব্যক্তিকে ধনী হিসেবে নিবন্ধিত করা হয় এ পরিমাণ সম্পদকে বলা হয় যাকাতের নিসাব। যে ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে..

- ইসলামী সরকার তার কাছ থেকে যাকাত আদায় করবে
- সে যাকাত, ফিতরা গ্রহণ করবে না এবং কাফফারাহ, ফিদইয়া বা মান্নতের খাবার খাবে না।

ইসলামী বিধানে যাকাতের নিসাব দুই ভাবে হিসাব করা যায়। যথা স্বর্ণের হিসাব ও রৌপ্যের হিসাব।

- স্বর্ণের হিসাবে ২০ দিনার (প্রায় ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ) বা সমপরিমাণ সম্পদ হলো যাকাতের নিসাব।
- আর রৌপ্যের হিসাবে ২০০দিরহাম (৬১২.৩৬/৫৯৫ গ্রাম রুপা) বা সমপরিমাণ সম্পদ হলো যাকাতের নিসাব।

পর্যালোচনাঃ রাসূল সা.র সময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য তথা সোনা ও রুপাকে নগদ অর্থের মূল ধাতু হিসেবে বিবেচনা করা হত এবং তখনকার বিশ্বে সরাসরি সোনা ও রুপাকে-ই নগদ অর্থ হিসেবে ব্যবহার করা হত। তাই রাসূল সা. সোনা ও রুপা উভয়টিকেই নিসাব ঠিক করার পরিমাণ হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তখনকার সময়ে ২০ দিনার আর ২০০ দিরহামের নগদ মূল্য প্রায় সমান ছিল।

কিন্তু পরে স্বর্ণের মূল্য বেড়ে যায় আর রুপার মূল্য কমতে থাকে। আর বর্তমান বিশ্বে নগদ অর্থের মূল ধাতু হিসেবে একমাত্র স্বর্ণকে-ই নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে নগদ অর্থ এবং দেশীয় মুদ্রার মূল্য নির্ধারণ করা হয় শুধু-ই স্বর্ণের উপর ভিত্তি করে। তাই বৈশ্বিক অর্থ ব্যবস্থা বিবেচনা করলে যাকাতের নিসাব হিসেবে শুধু স্বর্ণের নিসাব-ই এখন নির্ধারণ হবার কথা। এখনকার দিনে ইসলামী খিলাফাহ বিদ্যমান থাকলে হয়ত তাই হতো। খালীফাহ হয়ত স্বর্ণের নিসাবকেই যাকাতের নিসাব হিসেবে নির্ধারণ করে দিতেন। কারণ এটাল হচ্ছে বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থার চাহিদা। তাই বিষয়টি সরকারী ব্যাপার এবং সরকারের আওতাধীন।

কিন্তু এখনকার দুনিয়ায় খিলাফাহ বিদ্যমান নেই বিধায় গরীব জনতার সুবিধার্থে আমাদের উলামা সমাজ মানুষকে রুপার নিসাব হিসাব করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

রুপার নিসাবঃ যে ব্যক্তি তার (নিজের, পরিবারের ও সামাজিক) প্রয়োজন মিটিয়ে অতিরিক্ত ২০০দিরহাম পরিমাণ মালের মালিক হয় তার উপর যাকাত ফরজ হয়। এই পরিমাণ মালকে বলা হয় "যাকাতের নিসাব" তথা ইসলামী সমাজে ধনী-গরীব নির্ধারণের মাপকাটি। অর্থাৎ যার ২০০ দিরহামের কম সম্পদ সঞ্চিত আছে সে গরীব আর যার এ পরিমাণ বা এরচেয়ে বেশী সম্পদ সঞ্চিত আছে সে ধনী।

জ্ঞাতব্যঃ রাসূল সাঃর সময়ে নগদ অর্থ হিসেবে দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) ও দিনার (স্বর্ন মুদ্রা) ব্যবহৃত হত। তাই ইসলামী শারীয়া'হ যাকাতের নিস্বাব বা পরিমাণ নির্ধারণে দিরহাম ও দিনারকে নির্ধারণ করেছে।

পরবর্তীতে বৃটিশ পদ্ধতি মেনে সের ও তোলার হিসাব চালু হয়। তখন হিসাব করা হয় দুইশত দিরহাম = সাড়ে ৫২ তোলা রুপা। আর বর্তমান বিশ্বের একক পদ্ধতি হিসেবে গ্রাম ও কেজির হিসাব চালু রয়েছে। তাই বর্তমান সমাজে যাকাতের নিসাব বুঝার সুবিধার্থে গ্রামের হিসাব দেয়া হল।

তখনকার ২০০ দিরহাম সমান বর্তমানের ৬১২.৩৬ (অন্য হিসাবে ৫৯৫) গ্রাম রুপা হয়। সুতরাং...

- যে ব্যক্তির কাছে ৬১২.৩৬/৫৯৫ গ্রাম রুপার সমমূল্যের নগদ অর্থ বিদ্যমান থাকবে তাকে যাকাত দিতে হবে।
- যে ব্যক্তির ব্যবসায় ৬১২.৩৬/৫৯৫ গ্রাম রুপার সমমূল্যের পণ্য মজুদ থাকবে তাকে যাকাত দিতে হবে।

৪র্থ অনুচ্ছেদঃ যার উপর যাকাত ফরজ

ধনী (নিসাবের মালিক) মুসলিমের উপর যাকাত ফরজ হয়। সুতরাং কোনো...

- কোনো অমুসলিমের উপর যাকাত ফরজ হয় না।
- যাকাতের নিসাব পরিমাণ মালের মালিক নয় এমন ব্যক্তির উপর যাকাত ফরজ হয় না।
- যাকাত পুরুষ নারী সবার উপর ফরজ হয়।
- ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের পর নিসাবের মালিক না থাকলে যাকাত ফরজ হয় না।
- নাবালিগ তথা অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর উপর যাকাত ফরজ কি না এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি, প্রতিষ্ঠিত সুন্নতেও তেমন কিছু পাওয়া যায় না। তাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে গিয়ে ফিক্বহী ইমামগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। যথা..

ক. একদল আলিমের মতে নাবালিগ যেহেতু শিশু আর শিশুর উপর কোনো কিছু ফরজ হয় না। তাই নাবালিগের উপর যাকাত ফরজ হবে না।

খ. একদল আলিমের মতে যাকাত সম্পদের উপর ফরজ হয়, ব্যক্তির উপর নয়। তাই নাবালিগ ব্যক্তির সম্পদ থেকেও যাকাত দিতে হবে এবং এ যাকাত পরিশোধ করবে সম্পদের অভিভাবক।

জ্ঞাতব্যঃ সাধারণত ছেলেরা স্বপ্নদোষ আর মেয়েরা ঋতুস্রাবের মাধ্যমে বালিগ হয়। বালিগ হবার পর কিরামান কাতিবীন আমলনামা সংরক্ষণ শুরু করেন। তখন থেকে তাদের উপর সালাত ও সাওম তথা নামায ও রোজা ফরজ হয়, শরীয়তের বিধিবিধান ও সামাজিক আইন প্রযোজ্য হয় এবং তারা পুরুষ বা নারী হিসেবে গণ্য হয়। এটা-ই ইসলামের সামাজিক বিধান।

বিঃ দ্রঃ = পাগল ও মানসিক প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের সম্পদের যাকাতের ব্যাপারেও শিশুদের সম্পদের মত একই বিধান প্রযোজ্য হবে।

৫ম অনুচ্ছেদঃ যে সব মালের যাকাত দিতে হয়

বিধানঃ ১. সোনা, রুপা, নগদ অর্থ ও ব্যবসা সামগ্রীর যাকাত দিতে হয়।

বিধানঃ ২. ব্যবহারিক সামগ্রী (যেমনঃ আপনার ব্যবহৃত গাড়ি ও বাড়ি) বা রক্ষিত মাল (যেমনঃ পতিত জমি, পরিত্যাজ্য ঘর, গৃহ পালিত পশু) ইত্যাদির যাকাত দিতে হয় না।

বিধানঃ ৩. যে সব বস্তু উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় এসবের যাকাত দিতে হয় না। যেমন..

উদাহরণঃ ১. এক ব্যক্তির ৫টি ঘর আছে। একটিতে সে নিজে বাস করে আর ৪টি ঘর ভাড়া দিয়ে উপার্জন করে। তাকে এসব ঘরের যাকাত দিতে হবে না।

উদাহরণঃ ২. আপনার ১০টি গাড়ী আছে। আপনি গাড়ীগুলো ভাড়া দিয়ে আয়-রোজগার করেন। আপনাকে এসব গাড়ীর যাকাত দিতে হবে না।

উদাহরণঃ ৩. ফয়সল সাহেব একটি ক্লিনিকের মালিক। ক্লিনিকে ব্যবহারের জন্য উনার অনেক টাকার যন্ত্রপাতি আছে। তাকে এসব যান্ত্রপাতির যাকাত দিতে হবে না।

উদাহরণঃ ৪. এক ব্যক্তির ৩টি দোকান আছে। সে দোকানগুলো ভাড়া দিয়েছে। তাকে এসব দোকানের যাকাত দিতে হবে না।

উদাহরণঃ ৫. আপনি একটি প্রিন্টিং প্রেসের মালিক। আপনার প্রেসে প্রিন্টার, কম্পিউটার, ফটো মেশিন, ফার্নিচারসহ প্রায় এক কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে। আপনাকে এসব সম্পদের যাকাত দিতে হবে না।

বিধানঃ ৪. ব্যবসার সামগ্রীর উপর যাকাত ফরজ হয়। তাই আপনি ব্যবসায়ী হলে আপনার দোকান, শো রোম বা অন্যান্য পণ্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।
এমনকি কেউ জমির ব্যবসা, পশুর ব্যবসা, মেশিনারীর ব্যবসা, গাড়ীর ব্যবসা, বাড়ীর ব্যবসা করলেও ব্যবসার সামগ্রী হিসেবে এসব পণ্যের মূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।
বিষয়টিকে সহজ ভাবে বুঝার জন্য নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হল..
উদাহরণঃ ১. এক ব্যক্তি জমির ব্যবসা করে। সে ব্যবসার জন্য বিশ একর জমি কিনেছিল। দশ একর বেচা হয়েছে আর দশ একর বাকি আছে। তাকে এই দশ একরের মূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।
উদাহরণঃ ২. আপনি গাড়ীর ব্যবসা করেন। আপনার কাছে এখন ব্যবসার ৪টি গাড়ী আছে। আপনাকে এসব গাড়ীর মূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।
উদাহরণঃ ৩. এক ব্যক্তি যন্ত্রপাতি ও মেশিনারীর ব্যবসা করে। তার কাছে ব্যবসার যত মাল আছে সব হিসাব করে যাকার দিতে হবে। ইত্যাদি।

বিধানঃ ৫. মেয়েদের ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত দিতে হবে কী না? বিষয়টি নিয়ে ইমামগণের মাঝে ভিন্নমত লক্ষ্য করা যায়। যথা..
- ইমাম আবু-হানিফা রাহি.'র মতে মেয়েরা তাদের অলংকারে ব্যবহৃত সোনা ও রুপা হিসাব করে যাকাত দেবে।
- ইমাম মালিক, শাফী ও আহমদ রাহি.'র মতে মেয়েদের ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত দিতে হয় না। (দেখুন তিরমিযী, যাকাত অধ্যায়)

বিধানঃ ৬. যারা গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশু খামার করেন; তাদেরকে এসব পশুর হিসাব করে পশুর সংখ্যা অনুপাতে যাকাত দিতে হবে। তবে এ হিসাব সম্পূর্ণ আলাদা, যা সামনে পশুর যাকার অনুচ্ছেদে বর্ণিত হচ্ছে।

বিধানঃ ৭. ধান, গম, ভুট্টা, সরিষা ইত্যাদি কৃষি খামারীগণকে নিয়মমত যাকাত দিতে হয়। তবে এর হিসাব আলাদা এবং একে যাকাত না বলে উশুর ও খারাজ বলা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত সামনে ফসলের যাকাত অনুচ্ছেদে বর্ণিত হচ্ছে।

৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ কখন যাকাত দিতে হয়

ধনী (নিসাব পরিমাণ মালের মালিক) হওয়ার এক বছর পর যাকাত দেওয়া শুরু করতে হয়। বর্ণিত আছে..

ما ورد عن رسول الله صلّى لله عليه وسلّم من قوله لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذّهَبِ حتّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ عَليها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذٰلِكَ،

বর্ণিত আছেঃ আলী রা.কে উদ্দেশ্য করে রাসূল সা. বলেছিলেন "স্বর্ণ ২০ দিনার (৮৫ গ্রাম) এর কম হলে তোমাকে কিছুই দিতে হবে না। যখন তোমার স্বর্ণ ২০ দিনার হয়ে যাবে এবং (এ সম্পদের মালিক হবার পর) এক বছর অতিবাহিত হবে তখন তোমাকে অর্ধ দিনার যাকাত দিতে হবে। আর এরচেয়ে বেশী হলে এ হিসাবে যাকাত আদায় করবে। (সাহীহ আবু-দাউদ লি-আলবানী)
জ্ঞাতব্যঃ রাসূল সাঃর সময়ে সরাসরি স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রার প্রচলন ছিল। তখন স্বর্ণমুদ্রাকে বলা হত দিনার আর রৌপ্যমুদ্রাকে বলা হতো দিরহাম। তখনকার দিনে ২০ দিনার স্বর্ণ আর ২০০ দিরহাম রুপার বাজার মূল্য প্রায় সমান ছিল। তাই তিনি যাকাতের নিস্বাব হিসেবে ২০ দিনার এবং ২০০ দিরহামকে মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে সোনার দাম অনেক উপরে আর রুপার দাম অনেক নীচে। তাই এখনকার দিনে যাকাতের নিস্বাব হিসেবে আমরা সোনা নির্ধারণ করব নাকি রুপা, এটা এক বিরাট প্রশ্ন?
ইসলামী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত থাকলে যাকাতের মূল বিষয়টি সরকারের আওতাধীন থাকত এবং সরকারই বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে যেহেতু ইসলামী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত নেই তাই আমাদের নিজেদেরকেই বিষয়টি নিস্পত্তি করতে হবে।
এ বিষয়ে ফিক্বহী ইমামগণের মতামত হচ্ছেঃ যে নিস্বাবে গরীবের কল্যাণ হয় এমন নিস্বাবে হিসাব করাই উত্তম। আর এ কথা বিবেচনায় নিয়েই আমরা রুপার নিস্বাব তথা ২০০ দিরহামের হিসাবকে প্রাধান্য দিয়েছি।

যাকাত কখন দিতে হবে; এ সম্পর্কিত কয়েকটি ফিক্বহী বিধান নিম্নে পেশ করা হল ..
বিধানঃ ১. যে দিন আপনার কাছে ৬১২.৩৬ গ্রাম রুপার সমমূল্যের সম্পদ সঞ্চিত হলো সেদিন থেকে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আপনি যাকাত আদায় করবেন।
যেমন ধরুনঃ আপনি রজব মাসে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হয়েছেন। আপনাকে আগামী রজব মাসে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

বিধানঃ ২. এক বছর পূর্ণ হবার আগে আপনার সম্পদ নিস্বাব থেকে কমে গেলে আর যাকাত দিতে হবে না।
বিধানঃ ৩. যে দিন আপনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবেন সেদিন থেকে বছর গণনা শুরু করবেন।
বিধানঃ ৪. যাকাতের হিসাব করার সময়ে তখনকার নগদ সকল সম্পদের হিসাব করতে হবে।
যেমন ধরুনঃ আজ থেকে এক বছর আগে আপনি নিসাবের মালিক হয়েছেন। আজ আপনার এক বছর পূর্ণ হয়েছে তাই যাকাতের হিসাব করছেন। গত কাল আপনার একাউন্টে যে ১লাখ টাকা জমা হয়েছে এই টাকাও যাকাতের হিসাবে যুক্ত করবেন।
বিধানঃ ৫. যাকাতের হিসাবের বেলায় চন্দ্র মাসের বছর গণনা করতে হয়। কারণ রাসূল সাঃ ও সাহাবাগণ চন্দ্র মাসের বছর হিসাব করেছেন।
বিধানঃ ৬. যাকাত অগ্রিম দিয়ে দিলেও সমস্যা হয় না। সুতরাং প্রয়োজন হলে এবং আপনি চাইলে আপনার যাকাত অগ্রিম আদায় করতে পারবেন।
যেমন ধরুনঃ আপনি প্রতি বছর রজব মাসে যাকাত আদায় করেন। রজব আসতে এখনো ৩ মাস বাকি আছে। এখন কাউকে দেওয়া প্রয়োজন। আপনি যাকাতের নিয়ত করে কিছু টাকা দিয়ে দিন। রজব আসলে আপনার যাকাতের হিসাব করার সময় ওই টাকা আদায় ধরে নেবেন।

৭ম অনুচ্ছেদঃ যাকাতের হিসাব

সম্পদের সমষ্টি থেকে ২.৫% হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। মানে..

- প্রতি চল্লিশ টাকায় এক টাকা,
- প্রতি একশত টাকায় আড়াই টাকা
- প্রতি হাজার টাকায় ২৫ টাকা,
- প্রতি দশ হাজার টাকায় ২৫০ টাকা,
- প্রতি এক লাখ টাকায় ২৫০০ টাকা।
- এভাবে হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। যেমন ধরুন..

আপনি একজন ব্যবসায়ী। আপনার যাকাতের বছর পূর্ণ হয়েছে। এখন আপনার কাছে আছে..

নগদ	২,৫০,০০০ টাকা	
স্বর্ণ	২০,০০০ টাকা	
ব্যবসার সামগ্রী	৩,৪০,৫৫০ টাকা	
আপনার সর্বমোট আছে	**৬,১০,৫৫০ টাকা**	
২.৫% হিসেবে আপনার যাকাত হবে	১৫,২৬৩.৭৫ টাকা	

৮ম অনুচ্ছেদঃ যাকাত আদায়ের পদ্ধতি

পদ্ধতিঃ ১. যাকাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি হলঃ ইসলামী সরকার আলাদা যাকাত বিভাগ কায়েম করবে। সরকারি যাকাত বিভাগ ধনীদের থেকে হিসাব করে যাকাত আদায় করবে এবং নির্ধারিত খাতে খরচ করবে।
সরকারী ব্যবস্থা বলবত থাকলে জনগণ তাদের যাকাত সরকারকে দিতে বাধ্য থাকবে। কেউ না দিলে বা না দিতে চাইলে সরকার তাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নিতে পারবে, এমনকি প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করতেও পারবে।

পদ্ধতিঃ ২. সরকারী ব্যবস্থা না থাকলে জনগণ নিজ দায়িত্বে যাকাত আদায় করবে।

৯ম অনুচ্ছেদঃ যাকাত কোন খাতে খরচ করতে হয়

যাকাত খরচ করার নির্ধারিত খাত ৮টি। সরকার জনগণ থেকে যাকাত আদায় করে এ ৮টি খাতে খরচ করবে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)

সাদাকাত (যাকাত) শুধুমাত্র ফকীর, মিসকিন, যাকাত বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, যাদের চিত্তাকর্ষন প্রয়োজন, ঘাড় মুক্তি (তথা দাস মুক্তি/মানবতার মুক্তি,) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ, আল্লাহর পথে আর পথিকের জন্য। এটা হচ্ছে (যাকাত বন্টনের জন্য) আল্লাহ থেকে নির্ধারিত (খাত।) আল্লাহ আলীম, হাকীম। (৯ তাওবাহঃ ৬০)

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াতের বর্ণনা মতে যাকাত খরচের খাতসমূহ হচ্ছে..

- ফকীর। অর্থাৎ যার সামান্য সম্পদ আছে কিন্তু যথেষ্ট নয় তাকে যাকাত দেওয়া যাবে। (ইসলামী পরিভাষায় ওই ব্যক্তিকে ফকির বলা হয়)
- মিসকীন। অর্থাৎ যে ব্যক্তির তেমন কিছুই নেই, যাকাতের সম্পদ তাকে দেয়া যাবে। (ইসলামী পরিভাষায় ওই ব্যক্তিকে মিসকীন বলা হয়)
- যাকাত বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের বেতন যাকাতের অর্থ থেকে পরিশোধ করা হবে।
- ইসলামী সরকার জাতীয় স্বার্থে কাউকে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলে যাকাতের অর্থ দিয়ে তার চিত্তাকর্ষণ করতে পারবে যদিও সে কাফির হয়। (শাফী ও আহমদ)
- যে দাস অর্থ দিয়ে মুক্ত হতে চায় যাকাত দিয়ে তাকে সাহায্য করা যাবে।
- ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাত দিয়ে সাহায্য করা যাবে।
- ইসলামী সরকার সামরিক ও জাতীয় নিরাপত্তা জনিত খাতে যাকাত ব্যয় করতে পারবে। (ইসলামী পরিভাষায় এটাকে বলা হয় "ফী সাবীলিল্লাহ"।)
- সফররত মুসাফিরকে যাকাতের সম্পদ দিয়ে সাহায্য করা যাবে।

বিঃ দ্রঃ = যাকাত খরচের ৪র্থ খাত "যাদের চিত্তাকর্ষন প্রয়োজন"। এ খাতটি আসলে এমারজেন্সি খাত। ইসলামী সরকার প্রয়োজন মনে করলে এ খাতে খরচ করতে পারবে। এটা মহান আল্লাহ কর্তৃক নিরধারিত বিধান। তাই এ বিধান পরিবর্তন করার এখতিয়ার কারো নেই।
কথিত আছেঃ উমর রা. যখন ইসলামের খালীফাহ তখন তিনি বলেছিলেনঃ "আমরা এখন শক্তিশালী। তাই কোনো কাফিরের চিত্তাকর্ষণের জন্য আমরা আমাদের সম্পদ ব্যয় করব না"।
উমর রা. যেহেতু সরকার প্রধান ছিলেন তাই তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন এবং এমন ঘোষণা দিতেই পারেন। তবে অর্থ এই নয় যে তিনি আল্লাহর বিধান বদলে ফেলেছেন বা বদলে দিয়েছেন। বরং সরকার প্রধান হিসেবে আল্লাহর ও রাসূলের দেওয়া ক্ষমতা বলে তিনি একটি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।
তবে উমর রা.র এ কথাকে কেন্দ্র করে পরবর্তী ফিকহী ইমামগণ উনাদের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে সামান্য দ্বিমত করেছেন। যথা..

- ইমাম আবু-হানীফাহ ও মালিক রাহিঃর মতে ইসলামের সূচনাতে কাফিরদের চিত্তাকর্ষণ প্রয়োজন ছিল। কারণ ইসলাম তখন সামাজিক ও সামরিক ভাবে দুর্বল ছিল। পরে ইসলাম শক্তিশালী হয়ে গেছে তাই এখন কোনো কাফিরের চিত্তা কর্ষণে যাকাত ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।
- ইমাম শাফী ও আহমদ রাহিঃর মতে এ খাতের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়নি এবং এ বিধান রহিত হয়নি। বরং সময়ের প্রয়োজনে জাতীয় স্বার্থে কোনো অমুসলিমের চিত্তাকর্ষনে দরকার হলে ইসলামী সরকার এটা করতে পারবে। সৌদি আরবের গ্রান্ড মুফতী বিন বায রাহি. ও এ মত পছন্দ করেছেন। (এবং এটা-ই আজকের বাস্তবতা)
- যাকাত খরচ করার ৭ম খাত হচ্ছে "ফী সাবীলিল্লাহ"। অধিকাংশ ইমামের মতে "ফী সাবীলিল্লাহ" বলে শুধু সামরিক খাতকে বুঝানো হয়েছে। কারণ রাসূল সা. এবং সাহাবাদের সময়ে 'ফী সাবীলিল্লাহ" বলে শুধু সামরিক খাতকেই বুঝানো হত। আর কিছু কিছু আলিমের মতে "ফী সাবীলিল্লাহ" একটি ব্যাপক শব্দ। সামরিক খাতসহ দ্বীনি সেবার সকল খাত-ই "ফী সাবীলিল্লাহ"র আওতাধীন।

১০ম অনুচ্ছেদঃ যাকাত আদায়ে নিয়ত

যাকাত একটি ফরজ ইবাদত আর প্রতিটি ইবাদতের জন্যই নিয়ত আবশ্যক। তাই যাকাত আদায়ের জন্যও নিয়তের প্রয়োজন, যাকাত আদায় কালে অথবা যাকাতের সম্পদ আলাদা করার সময়ে নিয়ত করতে হয়। যেমন ধরুন..

আপনি আজ যাকাতের হিসাব করেছেন। এ বছর আপনার যাকাত হয়েছে ১০,৫৫২ টাকা। আপনি যাকাতের ১০,৫৫২ টাকা আলাদা করে রেখে দিয়েছেন। যাকাতের এ সম্পদ আলাদা করার সময়ে আপনার নিয়ত প্রয়োজন। যাকাত আলাদা করার সময়ে আপনি নিয়ত করবেন "এসব টাকা যাকাত হিসেবে আলাদা করলাম"। পরে এ আলাদা টাকা থেকে কাউকে দেওয়ার সময়ে আর নিয়তের প্রয়োজন হবে না।

আর যদি আপনি যাকাতের টাকা আলাদা না করে থাকেন। বরং শুধু হিসাব করেছেন এবং আপনার ১০,৫৫২ টাকা যাকাত হয়েছে। সাধারণত আপনি প্রয়োজন মত আপনার তহবিল থেকেই যাকাত আদায় করে থাকেন। তখন প্রতিটি ব্যক্তিকে দেওয়ার সময়ে যাকাতের নিয়ত করতে হবে।

বিঃ দ্রঃ = যাকাতের অর্থ কাউকে দেবার সময়ে তাকে বলার প্রয়োজন নেই যে "এটা যাকাতের টাকা"।

১১শ অনুচ্ছেদঃ পশুর যাকাত

পশু খামারীকে অবশ্যই তার পশু অনুপাতে যাকাত দিতে হবে এবং এ যাকাতের হিসাব নিম্নে দেওয়া হল..

ক. ছাগল ও মেষঃ ছাগল, ভেড়া, মেষ, দুম্বা খামারীর জন্য এসব পশুর যাকাত হচ্ছে..

- কোনো খামারীর ১-৩৯ টা ছাগল, ভেড়া, মেষ বা দুম্বাজাতীয় পশু থাকলে তাকে যাকাত দিতে হবে না।
- কোনো খামারীর ৪০-১২০টা এ ধরণের পশু থাকলে সে যাকাত হিসেবে ১ টা পশু দেবে
- কোনো খামারীর ১২১-২০০টা এমন পশু থাকলে সে যাকাত হিসেবে ২ টা পশু দেবে
- কোনো খামারীর ২০১-৩৯৯টা এ ধরণের পশু থাকলে সে যাকাত হিসেবে ৩ টা পশু দেবে
- কোনো খামারীর ৪০০-৪৯৯টা এমন পশু থাকলে সে যাকাত হিসেবে ৪ টা পশু দেবে
- কোনো খামারীর ৫০০-৫৯৯টা এমন পশু থাকলে সে যাকাত হিসেবে ৫ টা পশু দেবে
- এভাবে প্রতি ১০০টি পশুর বদলে ১ টা করে পশু যাকাত দিতে হবে। (দেখুন বুখারীঃ যাকাত অধ্যায়)

খ. গরুর যাকাতঃ গরু খামারীরা তাদের পশুর হিসাব করে যাকাত দেবে এবং এ হিসাব নিম্নরুপ..

- কোনো খামারীর ১-২৯ টা গরু থাকলে তাকে যাকাত দিতে হবে না
- কোনো খামারীর ৩০-৩৯ টা গরু থাকলে সে ১টা তাবি' (এক বছরের কম বয়সী বাছুর) দেবে
- কোনো খামারীর ৪০-৫৯ টা গরু থাকলে সে ১টা মুসিন্না (এক বছর বয়সী বাছুর) দেবে
- কোনো খামারীর ৬০-৬৯ টা গরু থাকলে সে ২টা তাবি' (এক বছরের কম বয়সী বাছুর) দেবে
- কোনো খামারীর ৭০-৭৯ টা গরু থাকলে সে ১টা তাবি' আর ১টা মুসিন্না দেবে
- কোনো খামারীর ৮০-৮৯ টা গরু থাকলে সে ২টা মুসিন্না (এক বছর বয়সী বাছুর) দেবে
- কোনো খামারীর ৯০-৯৯ টা গরু থাকলে সে ৩টা তাবি' (এক বছরের কম বয়সী বাছুর) দেবে
- কোনো খামারীর ১০০-১০৯ টা গরু থাকলে সে ২টা তাবি' আর ১টা মুসিন্না দেবে
- কোনো খামারীর ১১০-১১৯ টা গরু থাকলে সে ১টা তাবি' আর ২টা মুসিন্না দেবে
- কোনো খামারীর ১২০-১২৯ টা গরু থাকলে সে ৪টা তাবি' অথবা ৩টা মুসিন্না দেবে
- এভাবে প্রতি ৩০টি গরুতে ১টা তাবি' আর প্রতি ৪০টি গরুতে ১টা করে মুসিন্না দেবে। (দেখুনঃ আল-মুগ'নী খন্ডঃ ৪ পৃঃ ৩০-৩৪)
- মহিষের হিসাব হবে গরুর হিসাবের মত।

গ. উটের যাকাতঃ উট খামারী তার খামারের উট হিসাব করে যাকার দেবে এবং এ হিসাবটি নিম্নে দেওয়া হলো..

- কোনো খামারীর ৪টি মাত্র উট থাকলে তাকে যাকাত দিতে হবে না
- কোনো খামারীর ৫-৯ টি উট থাকলে সে তার উটের যাকাত হিসেবে ১টা ছাগল দেবে
- কোনো খামারীর ১০-১৪ টি উট থাকলে সে এসবের যাকাত হিসেবে ২টা ছাগল দেবে
- কোনো খামারীর ১৫-১৯ টি উট থাকলে সে এসবের যাকাত হিসেবে ৩টা ছাগল দেবে
- কোনো খামারীর ২০-২৪ টি উট থাকলে সে এসবের যাকাত হিসেবে ৪টা ছাগল দেবে
- কোনো খামারীর ২৫-৩৫ টি উট থাকলে সে ১টা বিনত মাখাদ্ব (১বছর বয়সী বাচ্ছা উট) দেবে
- কোনো খামারীর ৩৬-৪৫ টি উট থাকলে সে ১টা বিনত লাবূন (২বছর বয়সী বাচ্ছা উট) দেবে
- কোনো খামারীর ৪৬-৬০ টি উট থাকলে সে ১টা হিক্কাহ (৩ বছর বয়সী বাচ্ছা উট) দেবে
- কোনো খামারীর ৬১-৭৫ টি উট থাকলে সে ১টা জিযআ'হ (৪ বছর বয়সী বাচ্ছা উট) দেবে
- কোনো খামারীর ৭৬-৯০ টি উট থাকলে সে ২টা বিনত লাবূন (২বছর বয়সী বাচ্ছা উট) দেবে
- কোনো খামারীর ৯১-১২০ টি উট থাকলে সে ২টা হিক্কাহ (৩বছর বয়সী বাচ্ছা উট) দেবে
- খামারে উটের সংখ্যা ১২০ টি থেকে বেশী হলে প্রতি ৪০টি উটের বদলে ১টা করে বিনত লাবূন আর প্রতি ৫০টি উটের বদলে ১টা করে হিক্কাহ দেবে। (দেখুন বুখারীঃ ১৪৫৪)

বিঃ দ্রঃ = গৃহস্থলি কাজের জন্য ব্যবহৃত কোনো পশুর যাকাত দিতে হবে না

১২শ অনুচ্ছেদঃ ফসলের যাকাত/উশুর

অন্যান্য সম্পদের মত জমী থেকে উৎপাদিত ফসলেরও যাকাত দিতে হয়। মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141)

আল্লাহ সৃজন করেছেন বৃক্ষ গুল্ম ও লতা বিশিষ্ট বাগান (যাতে উৎপন্ন হয়) খেজুরসহ নানান স্বাদের হরেক রকমের ফসল, যাইতুন, ডালিম (ইত্যাদি কতকিছু। যার অনেকটা স্বাদে গন্ধে এবং আকার আকৃতিতে একটি অপরটির সাথে) সামঞ্জস্যপূর্ণ আর (অনেকটা) সামঞ্জস্যহীন। এসব (গাছ ও বাগান) যখন ফলবান হয় তোমরা তখন এগুলোকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে থাকো। আর (শুনো!) ফসল আহরণকালে তোমরা অবশ্যই এর হক (যাকাত, উশুর, খারাজ, সাদাকাহ) আদায় করবে এবং এসবের অপব্যবহার করবে না। কারণ আল্লাহ কোনো অপব্যবহারকারীকে পছন্দ করেন না।

জ্ঞাতব্যঃ ইসলামী বিধান হলোঃ সরকার কৃষককে জমি দেবে, বীজ দেবে, সেচের ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে। আর কৃষক নির্দিষ্ট পরিমাণে সরকারকে ফসলের অংশ দেবে। অবস্থা ও অংশের ব্যবধানে এটা-ই উশুর ও খারাজ নামে খ্যাত আর এসব-ই ফসলের হক তথা উৎপাদিত ফসলের উপর গরীব মানুষের অধিকার।

উশর পরিচিতিঃ উশুর অর্থ একদশমাংশ তথা ১০%। ইসলামী সরকার তার দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য কৃষককে জমি, বীজ, সার, সেচসুবিধাসহ নানা ভাবে সাহায্য করবে এবং বাণিজ্যিকভাবে ফসল উৎপাদনকারীদের থেকে (সুবিধা অনুপাতে) ৫% বা ১০% হারে উসুল করবে। শারীয়া'হ আইনে এটাই উশুর নামে খ্যাত। বর্ণিত হয়েছে..

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, নদী, ঝর্ণা, বৃষ্টির পানি তথা কুদরতী (অথবা সরকারী সেচ প্রকল্পের) পানি দিয়ে উৎপাদিত ফসলে উশুর (১০% হারে যাকাত) দিতে হবে আর নিজ উদ্যোগে সেচের ব্যবস্থা করে উৎপাদিত ফসলে দেবে নিস্বফ উশুর তথা ৫%। (বুখারী, মুসলিমেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে)

তবে যেসব কৃষক নিজের বা পরিবারের প্রয়োজন মিটাতে অতি সামান্য ফসল উৎপাদন করবে তাদেরকে কিছুই দিতে হবে না। বর্ণিত হচ্ছে..

ما ورد عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال وليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ

রাসূল সা. বলেছেন ৫ ওয়াসাক্বের (৬৪৫ কেজির) কম খেজুরের উপর কোনো প্রকার "সাদাক্বাহ" (তথা উৎপাদন কর) দিতে হবে না। (মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় এসেছে

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقةٌ

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ ৫ ওয়াসাক্বের (৬৪৫ কেজির) কম ফসলের উপর কোনো প্রকার কর আরুপ করা হবে না। (নাসায়ী, হাদীছটি সাহীহ)

জ্ঞাতব্যঃ ১ ওয়াসাক্ব সমান ১২৯ কেজি। সে মতে ৫ ওয়াসাক্ব সমান ৬৪৫ কেজি হয়। অর্থাৎ ৬৪৫ কেজির কম ফসল উৎপাদন করলে কোনো প্রকার কর দিতে হবে না। আর ৬৪৫ কেজি বা এরচেয়ে বেশী ফসল উৎপাদন করলে নির্ধারিত হারে (৫% বা ১০%) কর দিতে হবে। এটা হলো ফসলের যাকাৎ আর এর নাম উশর।

১৩শ অনুচ্ছেদঃ খারাজ

প্রারম্ভিক কথাঃ আজকাল সরকারী অর্থের উৎস হিসেবে জনগণের উপার্জনের উপর এক ধরণের "কর" বা রাজস্ব আরোপ করা হয়। দেশের জনগণ সরকারকে এ কর বা রাজস্ব দিতে বাধ্য থাকে। জনগণ থেকে উসুলকৃত রাজস্বের অর্থ দেশ ও জনগণের নিরাপত্তা এবং উন্নয়নে খরচ হয়।

খারাজ পরিচিতিঃ ইসলামী সরকারও দেশ ও জাতির উন্নয়নে তার নাগরিকদের থেকে রাজস্ব বা কর উসুল করতে পারবে। তবে রাজস্ব বা করের নামে জনগণের উপর জুলম করতে পারবে না তথা সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপাতে পারবে না। ইসলামী সরকারের ধার্যকৃত এবং উসুলকৃত কর বা রাজস্বকে "খারাজ" বলা হয়।

রাজস্ব বা কর আদায়ের এ ধারনাটা আমরা কুরআন থেকেই পেয়েছি। যেমন "যুল-ক্বারনাইন"র ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হচ্ছে..

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (93) قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (95) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا (96)

(উত্তর দিকে মধ্য এশিয়ার আরমেনিয়া ও আজারবাইজানের কাছাকাছি) দুই প্রাচীরের (পর্বতমালার) মধ্যখানে পৌঁছে এমন এক জাতিকে দেখতে পেল যারা কোনো কথা-ই বুঝে না/যাদের কথা বুঝা যায় না। (যু-ল-ক্বারনাইনের পরিচয় জানার পর তার কাছে নতিস্বীকার করে দোভাষীর মাধ্যমে) তারা বললঃ যু-ল-ক্বারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ (গ্রীষ্মকালে) আমাদের দেশে এসে ফাসাদ (তথা লুটপাট ও খুনখারাবী) করে থাকে। (শীতকালে তারা আসতে পারে না। কারণ শীতকালে এসব এলাকা বরফে আচ্ছাদিত থাকে) সুতরাং আমরা আপনাকে "**খারাজ**" (খাজনা/শুল্ক/রাজস্ব/কর) দেব, আপনি কী আমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন?

যু-ল-ক্বারনাইল বললঃ প্রভু আমাকে যা (যেসব ধনসম্পদ) দান করেছেন আমার জন্য এসব-ই যথেষ্ট। (তোমাদেরকে খাজনা দিতে হবে না) তোমরা শুধু শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে প্রাচীর বানিয়ে দিচ্ছি।

(প্রাচীরের স্থান ও নকশা সম্পন্ন হবার পর যু-ল-ক্বারনাইন বলল) তোমরা (আশপাশের পাহাড় থেকে) লোহার পাত সংগ্রহ করে এখানে এনে জমা কর। (কথামত তারা কাজে লেগে গেল এবং খুঁজে খুঁজে লোহার টুকরা এনে প্রাচীর নির্মাণস্থলে ফেলতে লাগল) লোহার পাত যখন দুই পাহাড়ের বরাবর হয়ে গেল তখন (যু-ল-ক্বারনাইন) বললঃ এতে আগুন ধরিয়ে দাও। আগুন জ্বলে উঠলে বললঃ আসো, এবার (প্রাচীরকে টেকসই করতে) এর উপর (জ্বলন্ত আগুনের উপর) তামা ঢেলে দেই। (১৮ কাহাফঃ ৯৩-৯৬)

যু-ল-ক্বারনাইনঃ যু-ল-ক্বারনাইন অর্থ দুই শিং বিশিষ্ট। যু-ল-ক্বাইরনাইন একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। তিনি দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে তার শাসনকৃত এলাকা ভ্রমণ করে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অনেকের মতে তার নাম ছিল ইস্কান্দার। কেউ কেউ তাকে নবী মনে করলেও অনেকের মতে তিনি নবী ছিলেন না। তার সময়কাল ছিল ইবরাহীম ও ঈসা আঃর মধ্যবর্তী সময়। তাকে যু-ল-ক্বারনাইন বলার কারণ নির্দিষ্ট করে জানা যায়নি। তবে কারো কারো মতে তার মাথায় ছোট শিঙ্গের মত দুটি মাংশ পিন্ড ছিল আর কারো মতে তিনি পৃথিবীর দুই প্রান্তে রাজত্ব করেছেন বলে তাকে এ উপাধি দেয়া হয়েছে।

দেয়ালঃ যু-ল-ক্বারনাইন যে দেয়াল নির্মাণ করেছিলেন এর নাম সাদ্দে ইস্কান্দারী তথা ইস্কান্দারী দেয়াল। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী লোহার দেয়ালের উপর তামার প্রলেপ দেয়া। পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে মধ্য এশিয়ার কয়েকটি স্থানে এমন দেয়াল বিদ্যমান আছে। এর মাঝে কোনটি বাদশা ইস্কান্দারের নির্মাণাধীন দেওয়াল এটা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন।

ইয়াজুজ মাজুজঃ ইয়াজুজ মাজুজ মানুষের-ই দুটি গোত্র। উভয় গোত্র-ই নূহ আঃর ছেলে ইয়াফিছের বংশধর। (কারো কারো মতে চায়নিজ ও রাশিয়ানরা হল ইয়াজুজ ও মাজুজ) কিয়ামতের আগে এরা আরব ভূখন্ডে অভিযান চালিয়ে সারা আরব দখল করে নেবে। তখন এদের মোকাবেলা করার শক্তি থাকবে না মুসলিমদের। খৃষ্টান ও ইয়াহুদ জাতির সাথে যুদ্ধ করে মুসলিমদের শক্তি প্রায় শেষ হয়ে যাবে। ঈসা আঃ মুসলিমদের নিয়ে পাহাড়ে অবস্থান নেবেন। আল্লাহর গজবে ধ্বংস হবে ইয়াজুজ মাজুজ। তাদের মরদেহ বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়ে থাকবে এবং দুর্গন্ধ ছড়াবে। তখন এসব থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে আল্লাহ পাঠাবেন বিরাট বড় বড় পাখি। পাখি মৃতদেহগুলো খাবে এবং সাগরে নিক্ষেপ করবে। পরে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করা হবে। বৃষ্টিতে ধোয়ে-মুচে যমীন সাফ হয়ে যাবে। তখন যমীনে খুব বরকত হবে। ফসলের বাম্পার ফলন হবে, বের হয়ে আসবে সোনারুপার পাহাড়।

কিয়ামতঃ ঈসা আঃর মৃত্যুর পর মানুষ আবার খারাপ হয়ে যাবে। পাপাচারে ভরে উঠবে চারদিক। তখন পশ্চিম থেকে সূর্য উদয় হবে। চাঁদ সুরুজ একত্রে পশ্চিম থেকে উদয় হয়ে কিছুক্ষন পর অস্ত যাবে। ভয়ে সকল মানুষ ইমানদার বনে যাবে। কিন্তু তখন কারো ঈমান কবুল হবে না। যারা আগ থেকে ঈমানদার ছিল শুধু তাদের আমল ফলপ্রসূ হবে। তারপর এক অজানা রোগে মুঅমিনগণ মারা যাবে। ভেঙ্গে ফেলা হবে কাবাঘর। পৃথিবীর অনেক দেশ সোনামীতে ভেসে যাবে। থাকবে শুধু আরব ভূমি। পরে ইয়ামেনের আদন বন্দর থেকে আগুন বের হবে। আগুন লোকজনকে শামদেশে নিয়ে জমা করবে। তারপর সিঙ্গা ফুঁকা হবে। হয়ে যাবে মহাপ্রলয় কিয়ামত।

খারাজের পরিমাণঃ খারাজের পরিমাণ নিরধারিত নয়। সরকার জাতীয় স্বার্থে এবং জাতির প্রয়োজনে জনতার উপর রাজস্ব ধার্য করবে তবে কারো উপর জুলম করবে না।

১৪শ অনুচ্ছেদঃ জিযিয়াহ

প্রারম্ভিক কথাঃ যাকাত ইসলামী সরকারের অর্থের প্রধান উৎস হলেও এটি একটি ইবাদাত। সাভাবিক জ্ঞানসম্পন্ন ধনবান মুসলিমের উপরই শুধু যাকাত ফরজ হয় এবং ইসলামী সরকার শুধু এমন মুসলিমদের থেকেই যাকাত আদায় করে থাকে এবং করতে পারে।
উল্লেখ্য ইসলামী দেশে কাফির, মুশরিক বা নাস্তিকরাও বসবাস করতে পারে, তারাও ইসলামী দেশের নাগরিক হতে পারে এবং নিরাপত্তা, শিক্ষা, চিকিৎসা, চাকরীসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধা ভোগ করতে পারে। তাই ইসলামী সরকার সামর্থবান অমুসলিম নাগরিকদের থেকে যে কর আদায় করবে এটাকে "জিযিয়াহ" বলা হয়।
ইসলামী সরকার যেভাবে তার দেশের অমুসলিম নাগরিকদের থেকে জিযিয়াহ আদায় করবে ঠিক তদ্রুপভাবে অন্য দেশের আহলে কিতাব সরকারদের থেকেও জিযিয়াহ নিয়ে পারবে এবং এর বিনিময়ে সে দেশকে নিরাপত্তা দেবে। ইরশাদ হচ্ছে..

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)

(হে মুসলিমগণ!) তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; আহলে কিতাবের যারা..

- আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান আনবে না,
- আল্লাহ ও রাসূল যা হারাম করেছেন এসবকে হারাম মানবে না,
- জীবন বিধান হিসেবে সঠিক দ্বীন মেনে চলবে না;

যতক্ষণ না তারা নতি স্বীকার করে নিজ হাতে জিযিয়াহ দেবে। (৯ তাওবাহঃ ২৯)

জ্ঞাতব্যঃ অমুসলিমদের থেকে নেয়া খাজনাকে জিযয়াহ বলে। ইসলামী সরকার মুসলিমদের থেকে যাকাত আর অমুসলিমদের থেকে জিযিয়াহ উসুল করবে।

আইন ও বিধানঃ ইসলাম শিরক ভিত্তিক সমাজ নির্মুল করার আদেশ দিয়েছে। কিন্তু ইসলামী সরকারের শ্রেষ্টত্ব মেনে নিয়ে জিযয়াহ দেবার শর্তে আহলে কিতাবের সমাজ মেনে নিতে আদেশ দিয়েছে।
জিযিয়াহর পরিমাণ ও ইতিহাসঃ জিযিয়াহর পরিমাণ ও ইতিহাসের ব্যাপারে বুখারীসহ হাদীছের অনেক কিতাবে আলাদা কয়েকটি অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে। তাফসীরের কিতাবাদিতেও উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে অনেক দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া সুরাহ আ-ল ই'মরানের ৬১তম আয়াতের তাফসীরেও জিযিয়াহ বিষয়ক আনেক আলোচনা আছে। সংক্ষেপ করার জন্য বিষয়গুলো এখানে উল্লেখ করা হল না।

৭ম সেমিষ্টার **১৯তম দিন**

আনুগত্য ও অনুকরণ

মুঅমিনের জন্য আনুগত্য ও অনুকরণ খুব-ই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুঅমিন হতে হলে অবশ্যই সঠিক নীতি মেনে সঠিক স্বত্বা ও সঠিক ব্যক্তির আনুগত্য করতে হবে এবং অবৈধ আনুগত্যের নামে বিভ্রান্তির সকল পথ পরিহার করতে হবে। সাথে সাথে সঠিক নীতি মেনে সঠিক দর্শন, সঠিক বিধান, সঠিক ব্যক্তি ও সঠিক সমাজের অনুকরণ করতে হবে এবং সকল প্রকার অবৈধ অনুকরণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

আনুগত্য ও অনুকরণ পরিচিতিঃ কারো আদেশ নিষেধ মেনে চলার নাম আনুগত্য। আর কারো বাতানো বা শিখানো পদ্ধতি মেনে কাজ করার নাম অনুকরণ।

আনুগত্য ও আনুকরণের বিধানঃ ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন। ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকলের জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন আদর্শ।

মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, জাতীয় জীবন, আন্তর্জাতিক জীবন তথা ব্যক্তি থেকে বিশ্ব পর্যন্ত সবকিছু পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতিমালা ও মূলসূত্র নির্ধারণ করে দিয়েছে ইসলামী শারীয়া'হ। মানব সমাজের জন্য শারীয়া'হ নির্ধারিত বিষয় সমূহের অন্যতম হচ্ছে আনুগত্য ও অনুকরণ।

আনুগত্য ও অনুবকরণ পরিচিতিঃ কারো আদেশ নিষেধ মেনে চলার নাম আনুগত্য। আর কারো বাতানো বা শিখানো পদ্ধতি মেনে কাজ করার নাম অনুকরণ।

আনুগত্যের আরবী শব্দ ইত্বায়া'হ। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় এতায়াত। আর অনুকরণের আরবী শব্দ ইত্তিবা'। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় ইত্তেবা।

আনুগত্যের বিধানঃ ইসলামে আনুগত্যের তিনটি স্তর রয়েছে। যথা..

- আল্লাহর আনুগত্য
- রাসূলের আনুগত্য
- কর্তৃত্বশীল ব্যক্তি বর্গের আনুগত্য। ইরশাদ হচ্ছে...

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)

মুঅমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর (কারণঃ এটা-ই আনুগত্যের মূল) আর আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের কর্তাব্যক্তিদের। তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের ব্যাপারে ইমানদার হয়ে থাকলে অমিমাংসিত যাবতীয় বিষয় নিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের (শারীয়া'হ আইনের) কাছে ছুটে যাও। (কারণ শারীয়া'হ আইন-ই ন্যায় সাম্য ও ইনসাফপূর্ণ আইন এবং আল্লাহর অনুমোদনকৃত একমাত্র আইন।) (৪ নিসাঃ ৫৯)

আল্লাহর আনুগত্যঃ আয়াতে তিন জনের আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। আনুগত্য করতে হবে আল্লাহর, আনুগত্য করতে হবে রাসূলের, আনুগত্য করতে হবে কর্তাব্যক্তিদের। তবে এ তিন জনের আনুগত্যের মান সমান নয়।

আল্লাহর আনুগত্য হবে শর্তহীন। যে আনুগত্যের মূলভিত্তি দাসত্ব। ইরশাদ হচ্ছে...

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16)

তোমরা সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে। (আল্লাহর কথা) শোনবে এবং আনুগত্য করবে আর (আল্লাহর পথে) খরচ করবে (এতে কার্পন্য করবে না) তোমাদের জন্য এটাই উত্তম। কারনঃ মনের কার্পন্য থেকে যাকে বাঁচিয়ে রাখ হয় তারাই সফল। (৬৪তাগা'বুনঃ ১৬)

পর্যালোচনাঃ আল্লাহর আনুগত্য হবে শর্তহীন, সীমাহীন এবং প্রশ্নাতিত। আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে আনন্দ চিত্তে, শুধু-ই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করলে বা আল্লাহর আনুগত্যে অসন্তুষ্ট হলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর ঈমান নষ্ট হয়ে গেলে ইবাদাত বন্দেগী সব নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে।

রাসূলের আনুগত্যঃ রাসূলের আনুগত্য হয় আল্লাহর অনুমোদন সাপেক্ষে, আল্লাহর আদেশে। রাসুলের আনুগত্য করতে আল্লাহ্ অনুমোদন দিয়েছেন এবং আদেশ করেছেন। তাই রাসূলের আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্য হিসেবেই দেখা হয়। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

আমি রাসূল পাঠা-ই যেন আল্লাহর অনুমোদনে তাদের আনুগত্য করা হয়।... (৪ নিসাঃ ৬৪)

পর্যালোচনাঃ আল্লাহ্ আমাদের মালিক। আমরা আল্লাহর দাস। তাই আনুগত্য হবে শুধু-ই আল্লাহর। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য ততোটুকু-ই করতে হবে; যতোটুকু করতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলের আনুগত্য করতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন তাই আমরা রাসূলের আনুগত্য করব। কারণ রাসূল কখনো এমন কিছু বলেন না; যাতে আল্লাহর অনুমোদন নেই। মহান আল্লাহ্ বলেছেন..

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى

সে (রাসূল) মনগড়া কিছু বলে না। (আল্লাহর কালাম হিসেবে সে যা বলছে) এটা-ই ওহী, (এসব) ওহী-ই (তার কাছে) পাঠানো হয়। (৫৩ নাজমঃ ৩-৪)

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে..

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80)

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল সে (মূলত) আল্লাহর-ই আনুগত্য করল। আর কেউ (রাসূলের আনুগত্য) বিমুখ হলে (মনে রাখবে) তাদের রক্ষক হিসেবে তোমাকে পাঠানো হয়নি। (আল্লাহর আযাব থেকে তুমি তাদের বাঁচাতে পারবে না এবং এটা তোমার দায়িত্বও নয়।) (৪ নিসাঃ ৮০)

কর্তাব্যক্তির আনুগত্যঃ কর্তা ব্যক্তি নেতা হোক বা শাসক, আলীম-উলামা, পীর বা ইমাম, অফিসার বা নিয়োগ দাতা, পিতা, স্বামী, বড় ভাই, উস্তাদ বা অন্য কেউ।

উনাদের আনুগত্য হবে আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া মূলনীতির আওতাধীন থেকে। আল্লাহর বিধান ও রাসূল সাঃর আদর্শের বাইরে গিয়ে অন্যকারো আনুগত্য বৈধ নয়। বর্ণিত হচ্ছে..

عن عليّ رضي الله عنه **أن النبي** صلى الله عليه وسلم **بعث جيشاً وأمَّر عليهم رجلًا فأوقد ناراً وقال ادخلوها فأرادوا أن يدخلوها وقال آخرون إنما فررنا منها فذكروا للنبي** صلى الله عليه وسلم **فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف** (رواه البخاري.)

আলী রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ একদা এক ব্যক্তিকে আমীর নিযুক্ত করে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। (ইসলামে আমীরের আনুগত্য করা আবশ্যক এবং সামরিক বাহিনীর নিয়ম মত আমীরের আনুগত্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাসূল সাঃর সাহাবাদের মাঝে এ নিয়ম খুব-ই মানা হত। অভিযানের এক পর্যায়ে) আমীর (সাহেব) আগুন জ্বালালেন এবং লোকজনকে বললেনঃ আগুনে ঝাপ দাও। (আমীরের আনুগত্য আবশ্যক ভেবে) কেউ কেউ আগুনে ঝাপ দিতে মনস্থ করলেন। তবে অনেকেই বললেনঃ (ইসলাম গ্রহণ করে) "আমরা আগুন থেকে পালিয়েছি" (এখন আমীরের কথা মেনে আগুনে ঝাপ দেব না। তাদের কথা শোনে অন্যরাও বিরত হলেন। মদীনায় ফিরে এসে) উনারা রাসূল সাঃকে ঘটনা খুলে বললেন। (আমীরের আনুগত্য করে) যারা আগুনে ঝাপ দিতে চেয়ে ছিলেন; তাদের লক্ষ্য করে রাসূল সাঃ বললেনঃ "এরা ঝাপ দিলে কিয়ামত পর্যন্ত আর বের হতে পারত না"। তারপর বললেনঃ "পাপ কাজে আনুগত্য নেই, আনুগত্য হবে শুধু নেক কাজে" (অন্য বর্ণনা মতে তিনি বলেছেনঃ "সৃষ্টি কর্তার অবাধ্য হয়ে কারো আনুগত্য করা যাবে না"।) (শব্দগত সামান্য পরিবর্তনসহ বুখারীসহ অনেক কিতাবে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।)

পর্যালোচনাঃ একটি সুন্দর সমাজের মূল ভিত্তি সামাজিক শৃংখলা। আর সামাজিক শৃংখলার মূলশক্তি ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ পূর্ণ আইন এবং আইনের শাসন। আর আইনের শাসনের মূলে রয়েছে আনুগত্য।

ইসলাম মানুষকে সমাজবদ্ধ থাকার আদেশ দিয়েছে এবং ন্যায় সাম্য ও ইনসাফপূর্ণ আইন দিয়েছে। যে আইনের মূল প্রবক্তা স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বু-ল-আ'লামীন। যে আইন বাস্তবায়নের জন্য যুগে যুগে পাঠানো হয়েছে কত নবী ও রাসূল। ইসলামের সামাজিক বিধান মতে মানব সমাজের সার্বিক নেতা হলেন নবী রাসূলগণ। তাই তো সকল নবীই মানুষকে আনুগত্যের আহ্বান জানিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে..

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (106) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (107) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (108)

নূহের জাতি রাসূলদের (আনুগত্য মেনে নিতে) অস্বীকার করল। যখন তাদের ভাই নূহ বললঃ তোমরা কি তাকওয়া অর্জন করবে না? আমি তোমাদের বিশ্বস্থ রাসূল। আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর এবং আমার আনুগত্য কর। (২৬ শুয়া'রাঃ ১০৫-১০৮) *(আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক থেকে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলে)*

এভাবে সূরাহ শুয়া'রার ১১০ এ নূহ আঃ, ১২৬ ও ১৩১ এ হূদ আঃ, ১৪৪ ও ১৫০ এ স্বালিহ আঃ, ১৬৩ এ লূত্ব আঃ এবং ১৭৯ শুয়া'ইব আঃ নিজ নিজ জাতিকে আনুগত্যের আহ্বান জানিয়েছেন।

অনুকরণের বিধানঃ "কোনো কাজ করতে গিয়ে কারো বাতানো বা শিখানো পদ্ধতি হুবহু মেনে নেয়ার বা মেনে চলার নাম অনুকরণ"। মহান আল্লাহ্ আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদাতের জন্য। আর ইবাদাতের পদ্ধতি শিখাতে দিয়েছেন কিতাব, পাঠিয়েছেন রাসূল। আল্লাহর কিতাবে যে পথ বাতানো হয়েছে এবং রাসূল সাঃ যে পথে চলেছেন; আমাদেরকে সে পথেই চলতে হবে। আল্লাহর কিতাবে ইবাদাতের যে পদ্ধতি বাতানো হয়েছে এবং রাসূল সাঃ যে পদ্ধতিতে ইবাদাত করেছেন আমাদেরকেও সে পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। এটা-ই অনুকরণ। এমন অনুকরণ করতে পারলে-ই আমরা সফল হতে পারব, ইন শা-আল্লাহ। নতুবা বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যাবে।

মানুষ সাধারণত ৪টি বিষয়ের অনুকরণ করে থাকে। যথা..

- ❖ আদর্শের অনুকরণ,
- ❖ কিতাব বা বিধানের অনুকরণ,
- ❖ ব্যক্তির অনুকরণ,
- ❖ সমাজের অনুকরণ।

সকল অনুকরণের ক্ষেত্রেই আমাদেরকে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ..

- ➢ আল্লাহ্ যে আদর্শের অনুকরণ করতে বলবেন আমরা শুধুই এর অনুকরণ করব।
- ➢ মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে যে কিতাব বা বিধানের অনুকরণ করতে বলবেন আমরা শুধুই এর অনুকরণ করব
- ➢ আল্লাহ্ যে ব্যক্তির অনুকরণের কথা বলবেন আমরা শুধু তারই অনুকরণ করব,
- ➢ আল্লাহ্ যে সমাজের অনুকরণ করতে বলবেন আমরা শুধু তারই অনুকরণ করব।

আসুন! এবার জেনে নেই; আল্লাহ্ কোন বিষয়ে কিসের অনুকরণ করতে বলেছেন।

আদর্শের অনুকরণঃ আমাদের অনুকরণীয় আদর্শ হচ্ছে ইসলাম যার মূল ভিত্তি তাওহীদ তথা একত্ববাদী আদর্শ, শিরকমুক্ত আদর্শ। যে আদর্শ বিশ্ব ইতিহাসে ইবরাহিমী আদর্শ হিসেবে খ্যাত। যে আদ্রশের মূল শিক্ষা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ। জীবন আদর্শ হিসেবে আমরা শুধু-ই ইবরাহিমী আদর্শের অনুকরণ করব। কারণঃ মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে শুধুই এ আদর্শের অনুকরণ করতে বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে..

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125)

ওই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম দ্বীনদার (আদর্শবান) আর কে হতে পারবে? যে ব্যক্তি..

- ➢ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করল,
- ➢ ইহসান করল (তথা নিজের ঈমান, ইসলাম, ইবাদাত, স্বভাবচরিত্র ও কথাবার্তাকে সুন্দর করল)
- ➢ আর হানীফ পদ্ধতিতে ইবরাহীমী আদর্শের অনুকরণ করল? (কারণ ইবরাহীম আঃ ছিলেন উত্তম আদর্শের অধিকারী। তাই) আল্লাহ ইবরাহীমকে খালীল বানিয়েছেন। (৪ নিসাঃ ১২৫)

হানীফ পদ্ধতিঃ আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য সকল আদর্শ মতবাদ ও নীতিমালাকে বিসর্জন দিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে একমাত্র আদর্শ হিসেবে ইসলাম মেনে চলার নাম হানীফ পদ্ধতিতে ইসলাম মেনে চলা। ইরশাদ হচ্ছে..

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123)

(হে নবী!) অতঃপর আমি তোমার কাছে ওহী পাঠিয়েছি (এবং এ ওহীর মাধ্যমে তোমাকে আদেশ দিচ্ছি) তুমিও "হানীফ" পদ্ধতিতে ইবরাহীমের আদর্শ অনুকরণ করবে আর (শোনো!) সে মুশরিকদের দলভুক্ত ছিল না। (১৬ নাহ'লঃ ১২৩)

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67)

ইবরাহীম ইয়াহুদ ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না। সে ছিল হানীফ মুসলিম। সে মুশরিকদের দলভুক্ত ছিল না। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৬৭)

পর্যালোচনাঃ সকল প্রকার কুফর, শিরক বর্জন করে তাওহীদের উপর অবিচল থাকা-ই ইবরাহীম আঃর আদর্শ। আর এ আদর্শের নামই ইসলাম। ইসলাম মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য এবং মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন আদর্শ। আদর্শগত ভাবে আমরা শুধু এ আদর্শের-ই অনুকরণ করব। কারণঃ এ আদর্শ-ই সঠিক আদর্শ। হানীফ পদ্ধতিতে এ আদর্শ মেনে চলতে হবে তথা অন্য সকল আদর্শ ও মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে একনিষ্ট ভাবে ইসলাম মেনে চলতে হবে, এটা-ই নবী রাসূলগণের নীতি ও আদর্শ। সকল নবী ও রাসূল (আঃ) এক-ই আদর্শ মেনে চলেছেন। শেষ নবী মুহাম্মাদ সাঃও এ আদর্শের আনুসারী ছিলেন। তিনি এক-ই আদর্শের দাওয়াত দিয়েছেন এবং এ আদর্শকেই বৈশ্বিক আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। ইবরাহিমী আদর্শের অনুসারী হিসেবে আমাদেরকেও রাসূল সাঃর অনুকরণ করতে হবে। এমন হতে পারলে-ই আমরা আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করতে সক্ষম হব, মহান আল্লাহ্ আমাদের ভালোবাসবেন। ইরশাদ হচ্ছে..

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (31)

বলঃ তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাইলে আমার (মুহাম্মাদ সাঃর) অনুকরণ কর; আল্লাহ্ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৩১)

হুঁশিয়ারিঃ একত্ববাদী আদর্শের নাম ইসলাম। আমাদেরকে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে জীবন আদর্শ হিসেবে শুধু-ই ইসলাম মেনে চলতে হবে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো আদর্শের অনুকরণ করা যাবে না। কারণঃ ইসলামের বিপরীতে যত নীতি, আদর্শ, দর্শন ও মতবাদ রয়েছে এ সবই মানব রচিত ও মনগড়া। এসবের মূলভিত্তি কুফর ও শিরক। এসব আদর্শের অনুকরণ করলে জীবনের লক্ষ্য অর্জনে আমরা ব্যর্থ হয়ে যাব, প্রকালের অনন্ত জীবনে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে...

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)

যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীনের (দর্শন, আদর্শ, নীতিমালা, বিধান, মতবাদের) সন্ধান করল তার (ইবাদাত বন্দেগী) কিছু-ই কবুল করা হবে না। আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৩ আল ই'মরানঃ ৮৫)

কিতাব ও বিধানের অনুকরণঃ আমাদের অনুকরণীয় কিতাব হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ব কিতাব আল-কুরআন। বিধান সম্বলিত এ কিতাব ওহীর মাধ্যমে রাসূল সাঃর কাছে পাঠানো হয়েছে। এবং মহান আল্লাহ্ তায়া'লা আমাদের আদেশ দিয়েছেনঃ আমরা যেন বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে এ কিতাব এবং এর বিধান মেনে চলি। সুতরাং অনুকরণীয় কিতাব হিসেবে আমরা আল-কুরআনেকে এবং অনুকরণীয় বিধান হিসেবে এ কিতাবের বিধানকেই মেনে চলব। অন্য যে কোনো কিতাব বা বিধান আল-কুরআনে বর্ণিত নীতিমালার বাইরে গেলে এসব প্রত্যাখ্যাত হবে।

আল-কুরআনের বাস্তব নমুনা হচ্ছেন রাসূল সাঃ। তাই জীবনে সফল হতে হলে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল সাঃর সুন্নাহ অনুকরণের কোনো বিকল্প নেই। ইরশাদ হচ্ছে..

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (2)

তুমি শুধুই তোমার প্রভু থেকে আগত ওহীর অনুকরণ করবে। (মনে রেখো!) তোমরা যেসব কাজ কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ এ সম্পর্কে অবগত। (৩৩ আহযাবঃ ২)

হুঁশিয়ারিঃ আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে অন্য কোনো কিতাবের অনুকরণ করা যাবে না। আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কোনো বিধানের অনুকরণ করা যাবে না। করলে বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

وَأَنِ احْكُم بَّيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49)

বিচার ও শাসন কর আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব ও বিধান মতে। তাদের আহওয়া (মনগড়া নীতিমালা, বিধিবিধান, তরিকাসহ কোনোকিছুর) অনুকরণ কর না। (যারা এসব বানায় এবং যারা মেনে নেয়) তাদের বর্জন কর। যেন আল্লাহর বিধান থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। তারা (আল্লাহর বিধান থেকে) বিরত হলে জেনে রাখবে! পাপের কারণে আল্লাহ তাদের সাজা দিতে চাচ্ছেন (আর মনে রাখবে) অধিকাংশ মানুষই পাপিষ্ঠ। (৫ মাইদাহঃ ৪৯)

জ্ঞাতব্যঃ উক্ত আয়াত থেকে যা বুঝলাম..

- বিচার ও শাসন করতে হবে আল্লাহ্ নাযিল কৃত বিধান মেনে
- কারো মনগড়া কোনো বিধান মানা যাবে না
- যারা মনগড়া আইন বা বিধান বানায় তাদের বর্জন করতে হবে
- তাদের বর্জন না করলে তারা আল্লাহর বিধান থেকে আমাদের বিচ্যুত করে ফেলবে
- যারা আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আল্লাহ্ তাদের সাজা দেন
- অধিকাংশ মানুষই পাপিষ্ঠ।

ব্যক্তির অনুকরণঃ কোনো ব্যক্তির বাতানো পথে চলা বা তার বাতানো পদ্ধতিতে কাজ করার নাম ওই ব্যক্তির অনুকরণ। আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া অন্য কারো অনুকরণ করা যাবে না। জীবনের আদর্শ হিসেবে আমরা শুধু ওই ব্যক্তির অনুকরণ করব যার অনুকরণ করতে মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে আদেশ করবেন।

আমাদের জীবনের আদর্শ হিসেবে এবং আল্লাহর ইবাদাতের বাস্তব পদ্ধতি শিখানোর জন্য পাঠানো হয়েছে রাসূল। সুতরাং জীবন আদর্শ হিসেবে আমরা শুধুই রাসূল সাঃর অনুকরণ করব। ইরশাদ হচ্ছে..

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (31)

(হে নবী! মানুষকে) বলে দাওঃ তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তবে আমার অনুকরণ কর, (এমন করলে) আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন, তোমাদের পাপসমূহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (আল ই'মরানঃ ৩১)

হুঁশিয়ারিঃ যে যুগে যে রাসূলকে পাঠানো হয় সেই যুগের মানুষের জন্য তিনি-ই হন আল্লাহর মনোনীত একমাত্র আদর্শ। রাসূলের বিপরীতে অন্য কারো অনুকরণ করা বৈধ হয় না। এমন করলে বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26)

হে দাউদ! আমি যমীনে তোমাকে খালীফাহ বানিয়েছি। সুতরাং মানুষের মাঝে বিচার ও শাসন কর সঠিক বিধান মেনে। আর (শোন!) মানব রচিত মনগড়া কোনো কিছুর অনুকরণ কর না। এতে তুমি আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। আর যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তাদের তরে কঠিন আযাব। কারণঃ তারা বিচার দিন ভূলে থাকে। (৩৮ স্বোয়াদঃ ২৬)

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49)

(হে মুহাম্মাদ!) তুমি (এবং তোমার উম্মত) মানুষের মাঝে "হুকম" (বিচার, শাসন, আদেশ ও আইন তৈরি) করবে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মেনে। মানুষের আহওয়া (মনগড়া) কোনোকিছুর অনুকরণ করবে না। বরং (যারা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মনগড়া আইন, বিধান, নীতিমালা, মতবাদ, তরিকা, মসলক, মিনহাজ, ইত্যাদি বানায় এবং যারা মেনে নেয়) তাদেরকে বর্জন করবে, যেন আল্লাহর নাযিলকৃত কোনো বিধান থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। আর জেনে রাখো! (কেবল তারা-ই আল্লাহর বিধান থেকে বিরত থাকে) যাদেরকে সাজা দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন তাদের-ই কৃত পাপের কারণে। (আর মনে রাখবে) অধিকাংশ মানুষই পাপিষ্ঠ। (প্রতি হাজারে মাত্র একজন মানুষ জান্নাতী হবে আর ৯৯৯জন হবে জাহান্নামী। বুখারীঃ তাফসীর অধ্যায়)

হুকম পরিচিতিঃ হুকম (حكم) শব্দটি সাধারণত চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা..

- হুকম অর্থ আদেশ করা বা অধ্যাদেশ জারি করা। (যেমন বলা হয় এটা-ই আল্লাহর হুকম অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ বা অধ্যাদেশ)
- হুকম অর্থ আইন ও বিধান। (যেমন বলা হয় আহকামুদ্বীন বা আহকামু-শ-শারীয়া'হ অর্থাৎ দ্বীনি বিধান বা শারীয়া'হ আইন)
- হুকম অর্থ বিচার করা। (যেমন বলা হয় বিচারককে বলা হয় হাকিম, বিচারালয়কে বলা হয় মাহকামাহ)
- হুকম অর্থ শাসন। (যেমন বলা হয় ইসলামী হুকুমত অর্থাৎ ইসলামী শাসনব্যবস্থা)

সমাজের অনুকরণ = ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ। ইসলাম আমাদেরকে সুন্দর একটি সমাজ ব্যবস্থা বা সমাজনীতি দিয়েছে। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ নিজ হাতে গড়ে তুলে ছিলেন একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ। যে সমাজের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত সদস্য ছিলেন রাসূলের সঙ্গীগণ তথা সাহাবাগণ। সুতরাং সমাজ পরিচালনায় এবং সামাজিক বিষয়াদিতে রাসূল সাঃর সাহাবাগণও আমাদের অনুকরণীয়। সমাজ পরিচালনায় আমরা তাদের অনুকরণ করব।

এমনকি রাসূল সাঃর কাজের বা কথার কোনো ব্যাখ্যা যদি সাহাবাদের থেকে পাওয়া যায় তবে এ ব্যাখ্যাকে আমরা অন্যসব ব্যাখ্যা থেকে বেশী গুরুত্ব দেব। আল্লাহ্ তায়া'লা বলেছেন..

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(137)

(হে রাসূলের সাহাবাগণ) তোমরা যে ভাবে ঈমান এনেছ, তারাও যদি সে ভাবে ঈমান আণে তবে তারা হিদায়াত পেয়ে যাবে। আর কেউ (তোমাদের অনুকরণ) বিমুখ হলে (মনে করবে) তারা (দ্বীনের) বিরোধিতায় রত। তবে (এজন্য ভেব না) তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রুতা, মহাজ্ঞানী। (২ বাক্বারাহঃ ১৩৭)

জ্ঞাতব্যঃ রাসূল সাঃর যুগ ছিল ইসলামের স্বর্নযুগ। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকলের জন্য এটা ছিল আদর্শ যুগ। এ যুগের মুসলিমগণ তথা রাসূল সাঃর সাহাবাগণ হচ্ছেন ঈমানের বাস্তব নমুনা। তারা যে ভাবে ঈমান এনেছিলেন, যেভাবে ইসলাম মেনে চলেছিলেন এবং উনাদের বাস্তব জীবনে যে ভাবে ইসলামী বিধান মেনে চলেছেন; আমাদেরকে ঠিক এভাবে-ই মানতে হবে। এটা-ই হেদায়াতের একমাত্র পথ। উক্ত আয়াতে একথাই বলা হয়েছে। এক হাদীছে রাসূল সাঃ বলেছেন..

روى البخاري (2652) ومسلم (2533) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ সর্ব উৎকৃষ্ট মানুষ হচ্ছে আমার যুগের (মানুষ।) তারপর যারা তাদের সঙ্গ পাবে, তারপর যারা তাদের সঙ্গ পাবে। তারপরে এমন লোকদের আবির্ভাব ঘটবে যারা সাক্ষ্যের আগে শপথ করবে, শপথের আগে সাক্ষ্য দেবে। (অর্থাৎ তারপরে মানুষের নৈতিক ও আদর্শিক বিচ্যুতি ঘটবে। তাদের সাক্ষি ও শপথের যথাযথ মূল্য থাকবে না। তারা অধিক পরিমাণে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে এবং মিথ্যা শপথ করবে) (বুখারীঃ ২৬৫২, মুসলিমঃ ২৫৩৩)

কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল আমাদের অনেক মানুষ দল, মসলক ও মিনহাজের নামে নতুন নতুন আক্বীদাহ তৈরি করে সাহাবাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছেন। আমাদের সমাজে যারা স্বঘোষিতভাবে ইসলামের ঠিকাদার বনে বসে আছেন উনাদের কাজ কর্মের অনেক কিছু-ই সাহাবাদের সাথে মিলে না। তারপরও উনারা নিজেদেরকে হক্কানী, ওলি আউলিয়ার পথ, সহীহ আকিদাহ, ইত্যাদি বলে অপপ্রচার করে থাকেন। যেমন..

১. সাহাবাদের জীবন কেটেছে যুদ্ধের ময়দানে কিন্তু ওই দলবাজরা যুদ্ধ পছন্দই করে না
২. সাহাবাগণ মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে দেশ ও জাতি গঠন করেছেন কিন্তু এরা মানে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ
৩. সাহাবাগণ খিলাফাহ কেন্দ্রিক রাজনীতি করেছেন আর এরা করে গণতান্ত্রিক রাজনীতি আর অনেকেতো রাজনীতি পছন্দই করে না
৪. সাহাবাদের মাঝে ভিন্নমত ছিল তবে দলাদলি ছিল না আর এদের মূল কাজই দলাদলি
৫. সাহাবাদের মাঝে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্য বজায় ছিল।
৬. মিলাদ, খতম, শিন্নি, ফরজ সালাতের পর সম্মিলিত দোয়া, ইত্যাদি কোনোকিছুই সাহাবাদের সমাজে ছিল না আর এদের মূল পুঁজিই এগুলো, ইত্যাদি।

সারকথাঃ

- কারো আদেশ নিষেধ মেনে চলার নাম আনুগত্য।
- আনুগত্যের মূল অধিকারী হলেন আল্লাহ্ তায়া'লা।

- আল্লাহর আনুগত্যের মূল বিষয় দাসত্ব। এ আনুগত্যের কোনো শর্ত নেই, সীমা নেই।
- আল্লাহর পরে আনুগত্য হবে রাসূলের।
- রাসূল আল্লাহ্ দূত। তাই রাসূলের আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্য হিসেবেই দেখা হবে। রাসূলের আনুগত্য হবে আল্লাহর অনুমোদন সাপেক্ষে।
- আল্লাহ্ ও রাসূল ছাড়া অন্যদের আনুগত্য হবে সীমিত পরিসরে শর্ত সাপেক্ষে।
- আল্লাহর বিধান ও রাসূলের আদর্শের বিপরীতে অন্য কারো আনুগত্য করা যাবে না।
- মানুষ সাধারণত ৪টি বিষয়ের অনুকরণ করে থাকে। যথাঃ দর্শন বা আদর্শের অনুকরণ। ব্যক্তির অনুকরণ, আইন বিধান বা গ্রন্থের অনুকরণ, সমাজের অনুকরণ।
- দর্শন বা আদর্শ হিসেবে আমাদের অনুকরণীয় একমাত্র আদর্শ হলো ইসলাম, যার মূলভিত্তি তাওহীদ, যা ইবরাহিমী আদর্শ হিসেবে খ্যাত।
- ব্যক্তি হিসেবে আমাদের অনুকরণীয় একমাত্র ব্যক্তি হলেন মুহাম্মাদ সাঃ
- আইন, বিধান বা গ্রন্থ হিসেবে আমাদের অনুকরণীয় একমাত্র গ্রন্থ হল আল-কুরআন
- সমাজ হিসেবে আমাদের অনুকরণীয় সমাজ হচ্ছে সাহাবাদের সমাজ।

৭ম সেমিষ্টার **২০তম দিন**

ইদ্দত

ইদ্দত অর্থ গণনা করা, সংখ্যা পূর্ণ করা, নির্ধারিত সংখা পুরন করার জন্য অপেক্ষা করা। তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ অন্যত্র বিয়ে করার আগে একটি নির্ধারিত সময় অপেক্ষা করতে হয়। এ অপেক্ষাকালকে বলা হয় তালাকের "ইদ্দত"।
স্বামী মারা যাবার পরও অন্যত্র বিয়ে হবার আগে স্ত্রীকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। একে বলা হয় স্বামী মারার যাবার পরবর্তী ইদ্দত। তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত বা অপেক্ষাকাল তিন ক্বরু। উল্লেখ্য আরবী ক্বরু শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১ম পাঠঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত

তালাকপ্রাপ্তা মুসলিম নারীদের জন্য আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হলো স্বামী তালাক দিলে অথবা আদালত কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে ইদ্দত পালন করা। যেমনসূরাহ বাক্বারাহর ২২৮তম আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে..

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন ক্বরু (পর্যন্ত) নিজেকে (অন্য বিয়ে থেকে) বিরত রাখবে (এটাই তালাকের ইদ্দত)	وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

তালাকের ইদ্দতঃ তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত বা অপেক্ষাকাল তিন ক্বরু। উল্লেখ্য আরবী ক্বরু শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথাঃ (১) ঋতু স্রাব (২) দুই স্রাবের মধ্যবর্তী কাল।
তালাক প্রাপ্তা নারীর ইদ্দতের মেয়াদ বর্ণনায় আল-কুরআনে শব্দ ব্যব্বহৃত হয়েছে "ক্বরু"। ক্বরু শব্দের যেহেতু দুটি অর্থ আছে তাই তালাক প্রাপ্তা নারীর ইদ্দত নিয়েও দু'টি মত পাওয়া যায়। যথা..
১. তালাক প্রাপ্তা নারী তিন স্রাব অপেক্ষা করবে, এটা-ই তার ইদ্দত। হানাফী আলিমগণ এ মতটি গ্রহণ করেছেন।
২. তালাকপ্রাপ্তা নারী (দুই স্রাবের মধ্যবর্তী) তিন পবিত্রতা অপেক্ষা করবে, এটা হল তালাকের ইদ্দত। শাফিয়ী' আলিমগণ এ মতটি গ্রহণ করেছেন।
আর তাকাল প্রাপ্তা নারীর যদি ঋতুস্রাব না হয় তবে তার ইদ্দত হবে ৩ মাস আর তালাক প্রাপ্তা নারী যদি গর্ভবতী হয় তবে তার ইদ্দত হবে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। মহান আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেন..

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)

আর যে সব নারীর ঋতুস্রাব (বন্ধ হয়ে গিয়েছে আর স্রাব) হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তাদের ইদ্দতের ব্যাপারে তোমরা যাতে সংশয়ে না পড় (এ জন্য আল্লাহ অন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন) তারা ইদ্দত পালন করবে ৩ মাস। আর যাদের এখনো ঋতুস্রাব হয়নি তারাও (ইদ্দত পালন করবে ৩ মাস।) আর গর্ভবতী নারীরা ইদ্দত পালন করবে তাদের সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করে আল্লাহ তার কাজকে সহজ করে দেন। (৬৫ সূরাহ তালাকঃ ৪)

২য় পাঠঃ স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর ইদ্দত

যে সব স্ত্রীর স্বামী মারা যাবে বা শহীদ হয়ে যাবে তাদের জন্য আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হলো স্বামী মারা যাবার পর বা শহীদ হওয়ার পর ইদ্দত পালন করা তথা নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত অন্য বিয়ে থেকে বিরত থাকা। এ বিষয়ে বিধান দিয়ে ইরশাদ হচ্ছে..

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)

(হে মুসলিমগণ!) তোমাদের কেও স্ত্রী রেখে মারা গেলে স্ত্রীগণ ৪মাস ১০দিন নিজেকে (অন্য বিয়ে থেকে) বিরত রাখবে, (এটা হল বিধবার ইদ্দত) মেয়াদ পূর্ণ হবার পর স্ত্রীগণ তাদের নিজেদের ব্যাপারে আইনগত (বিয়ে করার বা না করার) সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, এতে তোমাদের কোনো পাপ হবে না। আল্লাহ খবর রাখেন তোমাদের সকল কাজের। (বাক্বারাহঃ ২৩৪)

আইন ও বিধানঃ

- স্বামী মারা গেলে স্ত্রী ৪মাস ১০দিন অন্য বিবাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। এটাকে বলা হয় বিধবার ইদ্দত।
- স্বামী মারা গেলে ইদ্দত পালন করা তথা ৪ মাস ১০ দিন অন্য বিয়ে থেকে বিরত থাকা স্ত্রীর উপর ফরজ।
- স্ত্রীর উচিত ইদ্দতকালীন সময়ে ৪ মাস ১০ দিন স্বামীর ঘরে অবস্থান করা। এটা ফরজ নয়। তাই স্ত্রী ইচ্ছা করলে বাইরে যেতে পারবে। তবে অসুবিধা না হলে অন্য কোথাও অবস্থান না করাই উত্তম।
- ইদ্দতকালীন সময়ে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ঝুঁকি বা অন্য কারণে স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্যত্র অবস্থান করলে পাপ হয় না
- ইদ্দতকালীন সময়ে মেহেদী লাগানো, মেইকআপ করাসহ উগ্র সাজসজ্জা করা উচিত নয়। তবে নিয়মিত গোসল করা, শরীরের যত্ন হিসেবে স্বাভাবিক তেল সাবান ব্যবহার করা দোষের নয়।
- ইদ্দত পূর্ণ করার পর ওই নারী নিজের (অন্য বিয়ে করার বা না করার) ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

ফিতরাহ

আমাদের ফিতরাহ বিষয়ক প্রবন্ধটি এখানে যুক্ত হবে